অমিয় হালদার

পরিবেশক

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট

বহুকাল পুর্বে প্রায় বছর পাঁচেক ধরে শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা 'বাঁশরীর' ঘনিষ্ট সংস্পর্শে ছিলাম, কিন্তু লেখার নেশা কোনো দিনও আমায় পেয়ে বসেনি। চেষ্টাও করিনি।

লেখক আমি নই। লেখবার কথাও আমার নয়। কিন্তু কয়েকজনের উৎসাহে মেতে এটা হয়ে গেলো। ঠিক 'মিলিটারী-ম্যানের' মত এই দুঃসাহসের কাজটা করে ফেললাম। ত্রুটি নিশ্চয় আছে। তবে বিশ্বাস করি পাঠক সে ত্রুটি মার্জনা করবেন।

বাঙালী ভীরু, কুঁড়ে, ঘরের কোনে বসে থাকে, যুদ্ধ করবার অযোগ্য, এ অপবাদ দুর করবার জন্যে এক সময় বাঙলার তরুণের দল প্রথম যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলো, তারাও পারে সব রকম কষ্ট সহ্য করে হাতিয়ার ধরতে।

তারা দিনের পর দিন মরুভূমির বুকে হাসি-মস্করার ভেতর দিয়ে কি রকম কঠিন পরিশ্রম করেছিলো, সে সব কাহিনী বেশ জমে উঠতো পদ্মনাথ লেনের মজলিসে। লেখার কথাও সেখান থেকেই হয় সুরু।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ বোর্ডের কর্মী শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহ ও অনুরোধেই লিখতে সুরু করি 'পল্টন ছাউনির' কথা। তিনি সাহায্যও করেছেন আমায় অনেক। ধন্যবাদ জানাই তাঁকে।

'পল্টন ছাউনি' বেরোবার আগে শ্রীসত্যেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'গল্প-ভারতীতে' 'পল্টন নম্বর ৩৪৩' নামে ধারাবাহিক ভাবে বার করেছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধন্যবাদ জানাই 'গল্প-ভারতী' সম্পাদক শ্রীকালিদাস নাগ, সহকারী সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়, সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ও রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে।

বহু সাহায্য ও উপদেশ পেয়েছি যাঁদের কাছে : লেখক শ্রীমানবেন্দ্র পাল, সিটি কলেজ স্কুলের ভুতপুর্ব শিক্ষক অপর্ণা ভট্টাচার্য, শ্রীঅনিমেষ দাশগুপ্ত, শ্রীসুবিমল রায়, ভেটারান সোলজার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুবেদার শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার, সভ্যবৃন্দ ভেটারান সোলজার্স ক্লাব, শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীলাবণ্যকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণীয়া শ্রীমতি মাধবী রায় প্রভৃতিকে ধন্যবাদ জানাই।

অগ্রণী সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় মহাশয় 'পল্টন-ছাউনির' সহায়তা করে যে পরিশ্রম করেছেন সেজন্যে আমি তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

সব শেষে অত্যন্ত বেদনার সংগে মনে পড়ছে ভূতপূর্ব 'গল্প-ভারতী'র সম্পাদক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে—যাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ছায়ায় প্রতি পদক্ষেপে উপদেশ উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে আজ কোনো প্রকারেই 'পল্টন ছাউনি' ও 'পল্টন নম্বর ৩৪৩' প্রকাশিত করা সম্ভব হত না। তাঁকে শ্রদ্ধার সংগে বারবার স্মরণ করছি।

লেখক

বিচিত্রার প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গত শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে অর্পিত হইল

লেফট-রাইট লেফট-রাইট লেফট-রাইট—'আরে এই। এই মুর্দা, (মড়া) এই সুস্তি (কুঁড়ে) ছাতি সিধা করকে চলনা। লেফট-রাইট লেফট-রাইট —হল্ট।'

আরে, এই। হিল্‌তা কাহে? এই পিছে ওয়ালা রংরুট,—হিলোমাৎ। একদম খেয়াল রাখো,—যব্ বিচ্ছুমে কাটেগা তব্‌ভি নেহি হিলেগা।' কুইক-মার্চ, লেফট-রাইট লেফট-রাইট......

'আরে এই!—এই ললিত,—কেইসা আদমি তুম? লিখা-পড়াভি শিখা, ইংরেজী বুলি-ভি জানতা, লেকিন তুমরা পাঁও কাহে নেহি মিলতা? ঠিকসে পাঁও মিলানা।' লেফট-রাইট লেফট রাইট...

উনিশশো সতেরো সাল। বছর আরম্ভ। কাঁধে লেডিস-কমিটির দেওয়া টুকি-টাকি জিনিস ভরতি থলে। বগলে দুটো সুতোর কম্বল, গায়ে পশমের সোয়েটার। রেলে কাটালাম চার রাত, ঘুরপাক খেলাম পাঞ্জাব-রাজপুতানা, কাবার ক'রলাম ১৮২০ মাইল পথ। এসে হাজির, —সিন্ধুদেশে। বাঙালী পল্টনের ছাউনি করাচিতে। এসেছি বারোজন। সংগে কেল্লা থেকে অন্য পল্টনের একজন হাবিলদার।

সবেমাত্র সুরু হয়েছে ওদের প্যারেড। ব্যারাক প্রায় ফাঁকা। পিছনেই প্যারেড গ্রাউণ্ড। ধুধু করছে খোলা মাঠ, তার পরেই ছোট ছোট টিলা।

সমানে চিৎকার করছেন গাড়োয়াল হুদেদাররা। একমনে শুনছি তাঁদের কথা। দূরের গাছতলা থেকে শব্দ আসছে বিউগিলের। দেখছি রাজপুত পল্টনের মধ্যে আছে বাঙালীর দল। দেখছি এদিক ওদিক আরও কত কি।

নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন ভাষা। কৌতূহল, আনন্দ, আতঙ্ক সব মিলিয়ে হকচকিয়ে দেখছি ওদের প্যারেড, থলে-কম্বল পাশে রেখে। ঘুমে

চোখ ঢুলে আসছে, ক্ষিধেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। তবু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি ওদেরই দিকে।

এ'কদিন খাকি প্যান্ট-সার্ট, মাথায় ফেটীগ্-ক্যাপ চড়িয়ে মনে করে ছিলাম আমরা বুঝি খুবই চটপটে। পুরোদস্তুর হয়ে গেছি সেপাই। এখন এখানকার হাব-ভাব, চটকদারী দেখে রীতিমত ভড়কে গিয়ে যেন ক্যাবলা বনে গেছি।

প্যারেড ভাঙলো। চেনা জানা কয়েক জনের সংগে দেখাও হল। শোনালেন পল্টনের আইন-কানুন, নিয়মানুবর্তিতা। ছাড়লেন মাতব্বরের মত উপদেশবাণী,—অনেক কিছু। চুপ করে হজম করলাম সবই।

ডাক পড়ল অফিসে, সেই দিনই দুপুরে। দাঁড়ালাম লেপটেন্যান্ট সাহেবের সামনে। চমৎকার অমায়িক। ভরসা পেলাম খুবই। পেলাম নতুন পোষাক। সৈনিকের সাজ সরঞ্জাম সবই পেলাম। আরও পেলাম দু'চারটে ব্যাটেলিয়ান ছারপোকা ভরতি একটা চারপায়। সেই সংগে থাকবার আস্তানা।

আবার তলব, সন্ধ্যার সময়। গেলাম জমাদার শৈলেন বোস সাহেবের কাছে। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ। খেলাধূলায় ঝোঁক আছে খুবই। এক সময় মাতব্বর ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের। সম্পর্কও ছিল নাকি আই. এফ. এর সংগে। দখল আছে বক্সিংএ; বুঝলাম খুবই ক্রীড়ানুরাগী।

পরিচয় নিলেন একের পর এক। জিগ্যেস করলেন, খেলাধুলার অভ্যাস আছে কিনা। বললাম সবই খুলে। 'হাতে খড়ি কোলকাতার পান্তির মাঠে। মার্কাস স্কোয়ারে পাত্তা না পেয়ে আসর জমিয়ে ছিলাম মানিকতলা খালপারে। মল্লিকদের বাগানে। সাঁতার, ফুটবল, দুই-ই চলতো সেখানে। হকির ওপর দখল না থাকলেও, ঝোঁক আছে। ক'দিন মক্‌শো করলে হয়ে যাবে ওটা। দখলে আসেনি শুধু লাঠির অভাবে। এতদিন চালিয়েছি ছাতার বাঁটে।

হুকুম দিলেন,—চিটাগাঙের নগেন সেনের কাছ থেকে হকি ষ্টিক নিয়ে কাল মাঠে যেতে। এই নগেন বাবুই আছেন ওগুলোর চার্জে।

বুঝলাম, পড়াশোনার কদর আছে কিনা জানি না; খেলার আদর যথেষ্ট। বাড়ী থাকতে জেনেছিলাম খেলাধুলা করলে নষ্ট হয় কৌলীন্য, হয় পতিত। এখানে দেখছি তার উল্টো। চটপট জাতে ওঠা যায় ওটার জ্ঞান থাকলে।

আমরা রংরুট। পাকা সেপাই হতে নাকি অনেক দেরী। অনেক কিছু শিখতে হবে। চাঁদমারিতে গিয়ে ছুঁড়তে হবে গুলি। দাগতে হবে টারগেট। পাশ করলে, তবে হব পাকা সেপাই। যতক্ষণ না হচ্ছি, ততক্ষণ হেয়, অবজ্ঞার পাত্র।

নতুন রংরুট আসছে নিয়মিত, প্রায় প্রতি সপ্তাহে। এসে হাজির হলেন ঢাকার নবাব সাহেব। হকির দলও পুষ্ট হল তাঁকে পেয়ে। এসেছেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ান,—ভবানীপুরের অনিল মিত্তির। ঢাকার তরুণ খেলোয়াড়, তেজেশ সোম, (বাঘা) আরও কত জানা অজানা—'বেঙ্গল এ্যাম্বুল্যান্স কোরের' দলের।

একটু একটু করে ভরে যাচ্ছে খালি ব্যারাক। গুলজার হয়েছে বাঙলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের লোক এসে। শুনছি বাঙলা ভাষার কত রকম টান। মেলামেশার সুযোগ হয়েছে একাধারে সব জেলার লোকের সংগে। ঢাকার মিছির মিঞার কথাগুলো সত্যি খুবই মিষ্টি। দেখা হলেই কেমন বলে—আইচেন ছ্যার, (স্যার) একটু বয়চেন—চ্যা (চা) পানি খাইবেন ছ্যার?—তবে একটু ছোটা (সোডা) পানি খান ছ্যার।

এখানে মিলেছেন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান। হয়েছে সর্ব ধর্মের সমন্বয়। নেই ধর্মের গোঁড়ামি। বালাই নেই জাত বিচারের, ছোঁয়াছুঁয়ির। মিলেছেন উকিল, মোকতার, ডাক্তার, মাষ্টার, কবি, জমিদার। আছে কামার, কুমোর, ময়রা,—গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, অভিনেতা,—আছে যাদুকর। আছে রাজভক্ত-রাজদ্রোহী, দেশভক্ত-দেশদ্রোহী। অভাব নেই টিকটিকির। এককথায় চমৎকার সমাবেশ এই নরমেধ যজ্ঞের।

বসে গানের আসর। জমে থিয়েটারের রিহার্সেল। উৎসাহের সংগে আসর জাঁকিয়ে রাখে আমাদেরই পান্তির মাঠের ভুমেন রায়। পাশা নিয়ে মেতে থাকেন বিডন ষ্ট্রিটের জিতেন পাঁড়ে।

মাঝে মাঝে দেখি নতুন রংরুটদের মধ্যে কোন কোন রংরুট বসে থাকে চুপচাপ। থাকে মনমরা হয়ে। হয়তো ভাবে বাড়ীর কথা। তাদের মন তাজা করবার জন্যে লোকও আছে যথেষ্ট। উৎসাহ দেন অভয় দিয়ে।

'গুরুদেব', তাঁদেরই একজন। সর্বদাই রঙতামাসার মধ্যে পল্টনকে

রাখেন মাতিয়ে। সামান্য বিষয়কে হাসি ঠাট্টার মধ্যে নিয়ে গিয়ে সরগরম করে তোলেন আসর। নিজেও খুবই আমুদে। আবার মাঝে মাঝে কারও কারও দিয়ে দেন নতুন নাম।

সেদিন রবিবার। সাধারণত ঐদিন বিশেষ কোনও কাজ থাকে না। বন্ধ থাকে প্যারেড। চলে ব্যারাক পরিষ্কার। ধোয়া-ধুয়ি; কাচাকুচি। বাজার যাওয়া, ফিটন চড়া, বায়স্কোপ দেখা।

সকালে আসতে দেখেছিলাম একটা নতুন দল। ঐ দিনই বিকেলে দেখলাম, ভিড় জমেছে ব্যারাকের পাশে। দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে। দেখলাম কাঁদছে নতুন রংরুট। বাড়ছে ভিড়ের সংগে কান্নার মাত্রা। জিগ্যেস করলে, বলে,—'বাড়ী যাব'। জবাব দেয় না আর কোন কথার।

হঠাৎ হাজির হলেন গুরুদেব। জিগ্যেস করলেন তাকে,—'আরে সন্ন্যেসী,—কাঁদছো কেন? কি হয়েছে, খুলে বল।'

লোকটির দৃষ্টি নেই অন্য কোন দিকে। কেবল কাঁদে। থেকে থেকে বলে,—'বাড়ী যাব।' গুরুদেব সান্ত্বনা দেন তাকে। বলেন,—'এ আর বড় কথাক্কি। বেশতো, যাবে বৈকি। বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। ভাবনার কিছু নেই,—কবে যাবে?'

ব্যস্ত হয়ে বলে সে,—'কবে যাব!—কেমন করে হবে? এরাতো যেতে দেবে না। গেলেই যে ধরে এনে হাজতে পুরে...।'

গুরুদেব বাধা দিয়ে বলেন,—'না-না, অমন চোরের মতন যাবে কেন তুমি। দস্তুর মত বাড়ী যাবে বুক ফুলিয়ে, হাসি মুখে।'

সন্ন্যাসী ভেবেই পায় না কেমন করে তা সম্ভব হবে। কাঁদে আর বলে,—'আমিতো ফিরে যাবার কোনও উপায়ই দেখি না। দোহাই আপনার, যদি দয়া করে কোন পথ করে দেন।'

হ্যাঁ, নিশ্চয় দেবো। আছে বৈকি, অনেক পথ আছে।—কোনও রকমে পড়তে হবে তোমায়, অফিসারের নজরে। দেখবে পথ হয়ে যাবে আপনা হতেই।

কিন্তু কেমন করে নজরে পড়বো?

কেন! এটাতো সোজা কাজ। শোন তবে,—তোমাকে এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে অফিসার চিনে ফেলেন তোমায় এক ঝলকে, অত সৈনিকের মধ্যে।

কিন্তু কি ক'রে তা করতে হবে, যদি একটু বুঝিয়ে দেন। আমি

সব করবো,— যা বলবেন। গুরুদেব তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বল্লেন,—মন্ত্র পড়ার মতন।

পরদিন সকালে দাঁড়িয়েছি প্যারেডে—যথারীতি সার দিয়ে। ভুলে গেছি সন্ন্যাসীর কথা। তোড়জোড় হচ্ছে প্যারেড সুরু হবার। দেখি এগিয়ে আসছেন মেজর সাহেব। আসছেন একজন রংরুটের কাছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই। মুড়িয়ে ফেলা তার মুখ ও মাথা,—এমন কি ভুরু। জিগ্যেস করেন মেজর, তার ওপরওয়ালা হাবিলদারকে। বলেন,—'এ-কে'?

জবাব দেন হাবিলদার,—'নতুন রংরুট'। অফিসার জিগ্যেস করেন অনেক কথা, নতুন রংরুটকে। রংরুট নিশ্চল, নিস্তব্ধ, দেয় না কোন জবাব। নিজের মনেই বিড় বিড় করে—অনর্গল।

তাকে পাঠানো হল হাসপাতাল, হল পরীক্ষা। সাব্যস্ত হল পাগল।

সন্ন্যাসীতো খুবই খুশি। চলে গেল বাড়ী, পুলিশের পাহারায়, গেলো, গুরুদেবের বুটের ধুলো নিয়ে।

ঘিরে ধরলাম গুরুদেবকে। জিগ্যেস করলাম,—'আপনি কি ওকে আগে থাকতে চিনতেন? ভুরু কুঁচকে জবাব দেন,—'মোটেই না, ওর সংগে পরিচয় হবার সৌভাগ্য কোনদিনও হয়নি আমার।' অবাক হয়ে আবার বলি,—'তবে ওকে সন্ন্যাসী বলে জানলেন কেমন করে?'

হেসে জবাব দেন,—'কেন! পরিচয় তো ওর হাতেই ছিল।'

মাথাটা চুলকে বল্লাম—'হাতে।'

হ্যাঁ, হাতে। দেখলে না লোকটির হাতে ছিল একটা ছোট কলকে—যেটার ওপর ওর যত্ন ছিল খুবই! যাক—গেছে ভালই হয়েছে, দরকার নেই ওসব লোকের।'

এবার সব খোলসা হয়ে গেল। বল্লাম,—ওঃ বুঝেছি। তবে নিশ্চয় পাগল সাজার মন্ত্রটা আপনারই দেওয়া।

গুরুদেবের আর কোনও জবাব নেই। চুপ-চাপ সরে পড়লেন সেখান থেকে,—যেন কথাটা তাঁর কানেই যায়নি।

দুই

মাঝে মাঝে দেখি বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে এক ধরনের লোক খুবই কাতর হয়ে পড়ে। সর্বদাই ফিকির খোঁজে বাড়ী যাবার।

আমাদেরই এক সৈনিক সাথীর কানে লাগান ছিল ছোট ছোট দুটো রিং। হঠাৎ ডাক পড়ল তাঁর অফিসে। হুকুম হলো রিং দুটো খুলে ফেলবার। জবাব দিলেন,—'খুলতে আমি পারবো না।' চেষ্টা করলেন তাঁরা অনেক। দেখালেন শাস্তির ভয়। তাঁর কিন্তু সেই একই কথা,—'না,আমি খুলবোনা। এটা আমার মায়ের দেওয়া,—ঠাকুরের মানত।'

অনেক চেষ্টা করেও যখন তিনি খুললেন না, হতাশ হলেন অফিসার। হুকুম হল তাঁকে বাড়ী পাঠাবার। ডিসচার্জ করে। হকচকিয়ে গেলাম ব্যাপার দেখে। কিছুই বুঝলাম না, বাড়ী পাঠাবার কারণ।

দেখলাম, বাড়ী চলে গেলেন রিং পরা সাথী। আর যায় কোথায়। হদিশ পেল ফিকির খোঁজা নতুন রংরুট সাথীরা। দেখলাম, তারা বাজারে গিয়ে সন্ত কান বিঁধিয়ে রিং লাগিয়ে এসে হাজির। তাদেরও নাকি ঠাকুরের মানত। তাদের ভাগ্যে বাড়ী যাওয়া সম্ভব না হলেও, অসম্ভব হয়নি শাস্তি পাওয়া।

হঠাৎ কালা হয়ে যাওয়া, রাত কাণা, মৃগীর ব্যারাম কিংবা রাতারাতি হাতের আঙুলগুলোও অসাড় হয়ে যেতেও দেখি। উদ্দেশ্য তাদের একই—'বাড়ী যাওয়া'। একদল লোক যেমন অধীর হয় বাড়ী ফেরার জন্যে, তেমনই ব্যতিক্রমও আছে।

একটা পুরো রেজিমেন্টের যে সব বিষয় শিক্ষা করা দরকার, সেগুলো আয়ত্ত করতে সুরু করেছি পুরোমাত্রায়। সমস্ত কাজ চলছে বিউগিলের শব্দে। ঘুম থেকে ওঠা, প্যারেড যাওয়া, খাওয়া, শোয়া, সবই পরের পর চলছে কল-কব্জার মতন। দেখলে মনে হয় সকলকে যেন এক ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হচ্ছে এক ছাঁদে। এসব দেখে শুনে আমাদেরই সাথী, 'প্যাগলা ললিত'—ওরফে ঠাকুরদা, নিজের মনেই থেকে থেকে চিৎকার

করে বলে—'কি কল বানিয়েছ কোম্পানি, কলেতে ময়দা দিলে হয় চিনি।'

ট্রেনিং চলছে পুরোমাত্রায়। হচ্ছে—সকাল, দুপুর, বিকেলে। মাঝে মাঝে রাত্রে হয় নকল যুদ্ধের মহড়া,—হয় মাঠে ময়দানে বা টিলার ওপর। শনিবার ভোরে সুরু হয় রুটমার্চ। যাওয়া হয় সমুদ্রের ধারে,—ক্লিপটনে। চলে সাগরে স্নান। চা-জলখাবারের পর্ব শেষ করে ফিরে আসি ব্যারাকে—মার্চ ক'রে। চলি শহরের বুকের ওপর দিয়ে, বেলুচি পল্টনের বাজনার তালে পা মিলিয়ে।

সৈনিকদের জন্যে বাঁধা আছে অনেক রকম নিয়ম। বেয়াড়া নিয়ম,—'আউট অফ বাউণ্ডস্।' আমাদের ঘোরা-ফেরা করতে হয় এই বেঁধে দেওয়া গণ্ডিটুকুর মধ্যে। অমান্য করলে মিলিটারী পুলিশের অধিকার আছে হাজতে ভরে দেবার। মনে করতাম সৈনিকরা যাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় সেজন্যে এই নিয়ম। কিন্তু এটা ছাড়াও যে সরকারের বড় উদ্দেশ্য আছে তা' বুঝলাম সেদিন,—যেদিন এখানে এলেন একজন দেশ নেতা। বক্তৃতা দিলেন টাউনহলে। সে' কটা দিন সীমানার বাইরে যাওয়াতো দূরের কথা,—ভারতীয় সৈনিকদের বন্ধ হয়েছিল তিন দিনের জন্যে ছাউনি থেকে বাইরে যাওয়া। বন্ধ হয়েছিল খবরের কাগজ।

প্যারেড করা ছাড়া, বড় কাজ আরও দুটো।—'গার্ড-ডিউটি, ফেটিগ্-ডিউটি।' অর্থাৎ পাহারা দেওয়া, আর হরেক রকম কাজ করা—নিজেদেরই। লাংগারখানা বা রান্নাঘর,—ওরফে কিচেনের আনাজকাটা, রুটিবেলা, পরিবেশন করা ছাড়াও যেতে হয় এদিক সেদিক। খাবার পৌঁছে দিতে হয় সেন্ট্রিপোস্টে। শহরে গিয়ে আনতে হয় পল্টনের রসদ কিয়ামারির সাপ্লাই ডাম্প থেকে। করতে হয় আরও কত কি! কাজগুলো কষ্টকর হলেও,—ফাঁকিরও আছে।

কেমন করে প্যারেড ফাঁকি দিতে হয়, বোকার মতন যাতে বাজে পরিশ্রম না করতে হয়, সেগুলো একটু একটু করে শিখতে সুরু করেছি যোগীনদার কাছে। অভিজ্ঞ, বয়সে বড় যোগীনদার তালিম শুনি রোজই,—সব সময়।

অল্পদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে খুব ওস্তাদ না হলেও, কাজ মতন শিখেছি কিছুটা। এখন প্রাণভরে সাকরেদি করি এই ওস্তাদের,—আমি আর বোকেন।

প্যারেডটা বড়ই একঘেয়ে মনে হয়। ঠিক করেছি মাঝে মাঝে প্যারেডে না গিয়ে, যাব এখানে সেখানে,—ফেটিগ-ডিউটিতে। জানালাম মনের কথা আমার এই মুরুব্বিকে।

সব ঠিক হয়ে গেল। কাল ভোরেই যেতে হবে ওদের সংগে। আনতে হবে রসদ,—কিয়ামারি থেকে।

বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকার থাকতেই।—ঠিকমতন নিয়েও এলাম রসদ, শহরের বড় রাস্তা দিয়ে। এতদিন পর দেখবার সুযোগ হল 'আউট অফ বাউণ্ডসের' অনেক জায়গা। দেখলাম আগাগোড়া শহরের বড় সড়ক— 'বান্দার রোড।' কিনলাম শহরের সেরা বাজার 'বণ্টুন-মার্কেট' থেকে তরমুজ। রসদ বোঝাই উটের গাড়ীর ওপর বসে, ফাটালাম তরমুজ। উদরসাৎ করবার সংগে সংগে চারিদিক দেখতে দেখতে ফিরলাম যখন, তখন বেলা দুটো। অত বেলা হলেও লাগলো ভাল। হল কিছুটা রকমফের।

জলের বোতল ছাড়া এক গ্যালন জল ধরে একরকম ক্যানভাসের মশক ব্যবহারের চল্ আছে ফিল্ডের সৈনিকদের জন্যে,—নাম 'স্যাগল্।' এই স্যাগল্ ছাড়া দশ বারো গ্যালন জলের একটা বাক্স আমরা ব্যবহার করি, এখানে সেখানে যেতে হলে, সেগুলোকে বলে,—'পাখাল্।' গুরুদেব সংক্ষেপে নাম দিয়েছেন,—'ছাগল-পাগল।'

রসদ আনার পালা সপ্তাহে মাত্র একদিন। তারও আবার মক্কেল অনেক। এবার আর সুবিধে হল না রসদ আনা। ধরলাম অন্য পথ। এখন চলেছি জল হালুয়া পৌছে দিতে, চাঁদমারিতে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে, টার্গেটে গুলি দেগে। চলেছি বোকেন আর আমি,—আছে আমাদের মুরুব্বি যোগীনদা।

জলের পাখালটাকে বিছানা বাঁধার লগ্‌লাইন দিয়ে ভাল করে বেঁধে, ওপরের দিকে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে নিয়ে চলেছি কাঁধে করে। চলেছি পাল্কি বেহারার মতন। সামনে বোকেন, পিছনে আমি।

উদরপরায়ণ—ছিপছিপে, সর্বাঙ্গে উল্কি ফোটানো, ছোট বড় বহুরকম ধূমপানে ওস্তাদ, রঙিন জলপানেও অভ্যস্ত যোগীনদা,—সাইজে লম্বা। জলের বাক্স কাঁধে নিলে ব্যালান্স ঠিক থাকে না, বেজায় নড়ে। সেজন্যে সে নিয়েছে একটা কানাউঁচু এ্যালুমিনিয়ম থালাতে বাইশটা হালুয়ার

গোলা। বোকেন ছেলেমানুষ, বয়েস মাত্র সাড়ে পনের। বয়েস ভাঁড়িয়ে নাম লিখিয়েছে পল্টনে। খুব আমুদে হলেও, কষ্টও কিছু হচ্ছে।

কিছুদুর চলার পর বোকেন বলে উঠলো,—'যোগীনদা, কাঁধটা যে খুব টনটন করছে, তুমি একটু কাঁধ লাগাওতো।' যোগীনদার অভিজ্ঞতা আছে পাখাল কাঁধে নেওয়ার কষ্ট। গম্ভীর ভাবে জবাব দিলো,—'টুপিটা কাঁধের ওপর ভাঁজ করে দিয়ে নে, দেখবি টনটনানি কমে যাবে,—বুঝলি।'

বিরক্ত হয়ে বোকেন জবাব দিলো,—বুঝলাম।

গুর্খা পল্টনের টুপির মত, কাপড়ের স্ম্যাশার হ্যাট। অগত্যা দু'জনেই টুপি ভাঁজ করে দিলাম যে যার নিজের কাঁধে।

মাইল দু'য়েক চলে এসেছি, টিলার আঁকাবাঁকা পথ ধরে, বাকি এখনও এক মাইল। পাখালটাও হেলছে দুলছে বেশ। দুটো কাঁধের অবস্থাও শোচনীয়। কোন রকমে বাকি পথটুকু কাবার করতে পারলেই হবে এবেলার মতন খতম। চলেছি উৎসাহের সংগে,—মানিকপীরের গান গাইতে গাইতে।

'মানিকপীর, ভবনদীর পারে যাইবার না,
বদর বদর বলরে ভাই, নবী কর সার,
মাজা দুলাইয়া চইলা যামু ভব নদীর পার,
—মানিকপীর।

এই এঁই এঁই এঁই,—এঁই এঁই এঁই এঁই—হো';

চলেছি গাইতে গাইতে, ফাঁকা রাস্তার ওপর জোর গলায়। রোদের সংগে বেড়েছে গানের তেজ। এঁই এঁই বার আষ্টেক বলে, হোর ওপর তেহাই মেরেছি যেই, অমনি হুকুম হল যোগীনদার,—'এই, এখানে বসে পড়'। আমিতো কিছুতেই বসবো না। বোকেনেরও সেই মত। যোগীনদাও ছাড়বে না। ধমক দিয়ে বলে উঠলো,—তবে কাল থেকে তোদের আর আনবো না,—দেখি কি করিস।

ভড়কে গেলাম। বাধ্য হয়ে বসলাম একটা বড় পাথরের ওপর, নেহাত ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এবার নয়া হুকুম হল তার,—'এই নে, হালুয়ার গোলাগুলো ছোট করে ডেলা পাকা। করবি বাইশের জায়গায় পঁচিশ। এই ছাখ, এমনি করে পাকাবি। সবগুলো যেন এক মাপের হয়। খবরদার ছোট-বড় করিসনি,—ভাল করে দেখে পাকাবি'।

আমি জিগ্যেস করে ফেলেছি, একেবারে আচমকা,—'কেন কি হবে, আবার ছোট করবে কেন'? হেসে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে,—আগে তৈরি করতো, কি হবে তা দেখতেই পাবি। নে-নে, দেরী করিসনি, —তাড়াতাড়ি পাকা'।

চটপট তিন হাতে হল গোলার থেকে গুলি। বাড়তি তিনটার একটা নিজে নিয়ে বাকি দুটো তুলে দিলো আমাদের হাতে। আমি যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করছি। বল্লাম,—এগুলো যে ছোট করলে,—ওরা যদি ধরে ফেলে? খাঁক করে জবাব দিলো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরা সব বসে আছে, কলকাঠি নিয়ে, আমরা গেলেই সুরু করবে মাপতে। তুই বাপু বড্ডো হ্যাকা।

ছোটবেলায় শুনেছিলাম নীতি বিদ্যালয়ের নীতি কথা। নীতি জ্ঞান বর্ষণ করা যত সহজ, দেখছি মেনে চলা ততই কঠিন। এইতো আমাদের ৩২৬, ধূমপানের বিরুদ্ধে রচনা লিখে ইস্কুলে পেয়েছিল ইনাম। গুরুজনদের কাছেও পেয়েছিল সুনাম। হাওড়া স্টেশনে গাড়ীতে চড়েই সাবাড় করেছে সে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট, মাত্র দু'দিনেই। বল্লাম ভয়ে ভয়ে,—যোগীনদা, এভাবে পরের হালুয়া খাওয়া কি......

কথা শেষ আর হল না, এই মারে তো সেই মারে। ওস্তাদজি ছাড়লো মস্ত এক বক্তৃতা। বুঝলাম, ফিল্ডে যাবার আগেই শিক্ষা করতে হবে ছোট বড় বিষয়গুলো। এই ডিপোর থেকেই। ত্যাগ করতে হবে, 'লজ্জা, নীতি, ঘৃণা, ভয়'। কেবল মানতে হবে আইন। অতএব সময় থাকতে তাকে শিক্ষাগুরু করে যদি না এগিয়ে চলি, তবে ভবিষ্যতে আছে নাকি অনেক দুঃখ। আরও জানলাম, ৩২৬ নম্বর নাকি এগিয়ে গেছে অনেক। আমি নাকি যেমনই মুখচোরা, তেমনই ভীতু। আমার ওপর দোষারোপ করে জানতে চাইলো, 'কেন আমি সেদিন সেই সদর বাজারে ফ্লোরার রেষ্টুরেণ্টের মধ্যে না ঢুকেই পালিয়ে গিয়ে বম্বে রেষ্টুরেণ্টে বসে চা খেয়েছিলাম? ফ্লোরার রেষ্টুরেণ্টকে এত ভয়!—কেন'? ছাড়তে লাগলো কথার তুবড়ি একটানা না থেমে।

কথা-বার্তায়, বক্তৃতায়, সময়ের সংগে হাতের হালুয়াও প্রায় শেষ হয়ে গেছে; বললাম, এইবার ওঠতো, তোমার অনেক উপদেশ তো শুনলাম, ওদিকে রোদের তেজও বাড়ছে, আর দেরী করে লাভ কি?

ব্যস, ঠিক মতন পৌঁছে দিলাম ওদের জল হালুয়া। মোটেই খেয়াল

করে নি তারা, গোলা গুলো ছোট না বড়। নিশ্চিন্ত মনে ফিরলাম ব্যারাকে খালি পাখাল কাঁধে করে। আনন্দে কাটিয়ে দিলাম আরও চারদিন জল-হালুয়া ফেটিগের পর্ব। অবশ্য কামাই যায় নি, মাঝপথে হালুয়া খাওয়া।

এবার ধরিয়ে দিলো আর এক পথ। বেশ কায়েমী ব্যবস্থা করে আবার এসেছি এই স্যুটিং রেঞ্জে। আমাদেরই মুরুব্বীদের সংগে। এবারে জল-হালুয়া পৌঁছে দিতে নয়। এসেছি স্যুটিং রেঞ্জের বাট্-ফেটিগ ডিউটিতে। সংগ নিয়েছি ধীরুদা, যোগীনদার। তা' ছাড়াও আছে ললিত ঠাকুরদা, নবাব সাহেব আর বোকেন।

কাজটা মন্দ না। চলবেও প্রায় দশদিন। একেবারে নীরসও নয়। পরিশ্রমও কম। বসে, দাঁড়িয়ে। তবে কষ্ট যেটুকু,—অন্ধকার থাকতে বিছানা ত্যাগ করা। তা হোক।

ছ' নম্বর বাটে অর্থাৎ একেবারে শেষের টার্গেটে ট্রেঞ্চের মধ্যে এক পাশে আছি আমি আর বোকেন। আমার পাশেই পাঁচ ও চার নম্বরে যথাক্রমে আছে ওরা।

কাঠের ফ্রেমে চটের ওপর কাগজ আঁটা মজবুত লোহার ফ্রেমের ওপর বসান এই টার্গেট। ওঠানামা করে চাকার সাহায্যে।

আমাদের মোটামুটি কাজ হচ্ছে, বুলেট দাগা হয়ে গেলেই টার্গেট নামিয়ে যেখানে গুলি লেগেছে সেটা দেখেই তখনই স্কোরারকে জানানো। সেই সংগে ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে লাঠির ডগায় আঁটা বিভিন্ন রঙের গোল চাকতি অর্থাৎ স্কোরের চিহ্নগুলো উঁচু করে তুলে, দুরের রেঞ্জের লোকদের দেখানো। সংগে সংগে, বুলেটের ফুটোটা কাগজের তাপপি মেরে বন্ধ করে আবার সেই টার্গেটটাকে নতুন ফায়ারিংএর জন্যে তুলে ধরা। সব কাজগুলো করতে হবে খুবই চটপট।

ফণীদা স্যুটিং করবেন তৃতীয় দফায়, আমাদেরই এই ছ' নম্বর টার্গেটে। বোকেনের সংগে নাকি কথা হয়ে গেছে, পাশ করিয়ে দেবার। এই টার্গেট স্যুটিং এর মধ্যে নাকি এটার চলন আছে, কারও কারও কাছে এবিষয় শুনলেও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আজও হয়নি, জানিও না।

এক এক করে দু'দফা শেষ হল। এবার সুরু হবে ফণীদার স্যুটিং। বোকেন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার নড়ে বসল। উৎসাহ তার খুবই।

স্যুটিং লাইন থেকে বিউগিলে 'ওপন ফায়ার' শব্দ শোনা মাত্র যে যার

টার্গেট ওপরে তুলে দিয়ে অপেক্ষায় আছি গুলির শব্দের। সুরু হল স্যুটিং। শুনলাম গুলি দাগার শব্দ—দুম-দাম, গুড়ুম-গাড়াম, ফট-ফাট, কখনও বা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে শব্দ হয় খ্যাং। ব্যস, সব চুপ। বাজলো বিউগিল, সিজ্-ফায়ার। বন্ধ হল গুলি দাগা।

হুটোপাটি করে নামালাম টার্গেট। দেখলাম ফাঁকা, একেবারে ফাঁকা। গুলির ছেঁদা খুঁজে না পেয়ে দেখাবার মতলব করছি, লাল ঝাণ্ডা। হাতড়ে বেড়ালাম 'আউটারের' চারপাশ থেকে একেবারে 'বুলের' ভেতর পর্যন্ত। চোখে পড়ে কেবল আষ্টে-পিষ্টে তাপ্পি মারা গুলির ছেঁদা। কোথাও নেই বুলেটের ফুটো।

অবাক করে দিল বোকেন। দেখিয়ে দিল ম্যাজিক। খুঁজে পেয়েছে ফণীদার দাগা বুলেটের ছেঁদা। লেগেছে নাকি একেবারে বুলে। মনে মনে সন্দেহ হলেও, কোন কথা না বলে, ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে তুলে দেখালাম লাঠির ডগায় আঁটা 'বুলের' চিহ্ন,—সাদা চাকতি। বোকেন জানিয়ে দিল স্কোরারকে,—বাট সিক্স, ওয়ান বুল'।

তাড়াতাড়ি তাপ্পি লাগিয়ে ফুটো বন্ধ করে আবার টার্গেটটাকে ঠেলে দিলাম ওপরে। অপেক্ষায় রইলাম দ্বিতীয়গুলির। একের পর এক এল আরও তিনটে বুলেট। কিন্তু হতাশ করেন প্রতিবারেই। বড় জোর আউটার। নম্বর ওঠে মাত্র এক।

মোট হল মাত্র সাত। এখন বাকি এই শেষ বুলেট। এটার উপরেই নির্ভর করছে তাঁর পাশ ফেলের নম্বর। কোনও রকমে দশ পেলেই কাজ হাসিল।

হাঁ করে তাকিয়ে আছি উপরে, পলকহীন দৃষ্টি টার্গেটে। ঘাড় ব্যথা হয়ে গেলেও, ব্যস্ত হয়ে দেখছি দাদার শেষ গুলি কোথায় লাগে। শুনলাম শব্দ,—গুড়ুম। দেখলাম পরিষ্কার। দেখলাম টার্গেটের পিছনের ঢিপির উপর ধুলো উড়তে। বাকি রইল না বুঝতে।

সিজ-ফায়ারের শব্দশুনেই নামালাম টার্গেট। কোথায় দাদার বুলেটের ছেঁদা। এ যে, ধু-ধু করছে অক্ষত টার্গেট। বিরক্ত হয়ে উঠলো বোকেন। চোখের পলকে তাপপি মারা পুরোনো ফুটোর মধ্যে পেন্সিল ঢুকিয়ে দিয়ে তৈরি ক'রল হুবহু গুলির ছেঁদা। জানিয়ে দিল,—'বাট সিক্স, ওয়ান ইনার'। তুলে ধরল চিহ্ন,—লাল চাকতি।

দেখলাম দাঁড়িয়ে, ওর কাণ্ড। বললাম,—হ্যাঁরে, ছেঁদা করে দিলি?

বলে উঠলো—কি ঝামেলা ছাখতো, ছেঁদা না করে উপায় কি। কত আর সামলাবো।

দাদা পাশ করলেন। উতরে গেলেন, একশো গজ দূরে থেকে গুলি দেগে। চলবে পরের পর পাঁচশো পর্য্যন্ত। এইতো সুরু।

বিকেলে দেখা হল ফণীদার সংগে, গুজরাটী শেঠজির ক্যানটিনে,—আমার আর বোকেনের। দেখেই উৎসাহের সংগে বলে উঠলেন,—কিরে কাল আবার তোরা যাচ্ছিস তো? ঘাড় নেড়ে বললাম,—হ্যাঁ যাবো বৈকি। দাদা খুবই খুসি। দিলদরিয়া হয়ে হুকুম করলেন, ক্যানটিনওয়ালাকে। —শেঠজি, বে আনা পুরি, বে আনা পালামতোড়, আউর বে কাপ চা আপ।

যে কটা দিন চলেছিল বাট-ফেটিগের পর্ব, সে কটা দিন বিকেলে আমাদের বরাদ্দ হয়েছিল, শেঠজির ক্যানটিনে দু'কাপ চায়ের সংগে দু' আনার পুরি মিষ্টি। আরও হয়েছিল ভূরিভোজন, যেদিন জেনেছিলাম দাদার পাশের খবর।

বিভিন্ন লোকের রকমারি চরিত্র হলেও আমাদের এই 'ললিত' ওরফে পাগলা ঠাকুরদার চরিত্র একটু বিচিত্র। কারও সংগে মিল নেই তার।

মাঝামাঝি লম্বা, একটু কুঁজো হয়ে চলে। মাথায় টাক। সামনের দিকে উপরের দাঁতগুলো থাকলেও নিচের ক'টা ফাঁকা। সরল, আমুদে, মজলিসি বলা চলে। মাথার সামান্য গোলমালের সংগে জড়ান আছে কিছুটা দুষ্টুমি। লেখাপড়ার চর্চা ছিল। দখলও আছে ইংরেজীর ওপর, কিন্তু মাথার দোষটুকুর জন্যে তালগোল পাকিয়ে যায় মাঝে মাঝে। আপন ভোলা, সদাই থাকে আনন্দে ভরপুর হয়ে। আমাদেরও আনন্দ দেয় প্রচুর। ওর সংগে আমার জমে উঠেছে খুবই। আস্তানা তার একই ব্যারাকে। আমার খাটিয়ার পরে দু'খানা বাদ দিলেই ওর চারপায়। বয়সে বড় হলেও, চলে তুইতোকারি। এতে বাধে না আমার মোটেই। লজ্জা বোধ করি না একটুও। শুধু আমি নই, সকলেই।

কিছুতেই ভেবে পাই না, কেন সে এসেছে পল্টনে। তার স্থান এটা নয়, সেও এটা বোঝে। তবে, কেন এসেছে সেই জানে। এখানকার কোন কাজকেই আপন করতে পারেনি আজও। সবই যেন তার কাছে ছাড়া-ছাড়া ভাব। এসেছে, আছে, এই পর্যন্ত। কামাই দেয় না প্যারেড

যাওয়া। কুচকাওয়াজ মগজে নিলেও, নেয় না শরীরে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে খুবই।

গাড়োয়াল গুরুজি 'শ্যাম সিং', ধমক দেন—ভালও বাসেন। হরদম বলেন, লেফট-রাইট। কোনদিনও গরজ দেখি না তার পা মেলাবার। চলে আপন মনে পরম আনন্দে, উটের মত ভঙ্গিতে। অনেক চেষ্টা করে নিরাশ হয়েছেন গুরুজি। শেষ পর্য্যন্ত পেনসান দিয়েছেন এই প্যারেড মাঠে। গার্ড-ডিউটি, ফেটিগ-ডিউটি যে কোনটাই দেওয়া হোক না কেন, গোল বাধিয়ে ফেলবেই প্রতিটিতে। সব সময় যে দুষ্টুমি ক'রে করে, তা নয়। ওটা যেন হয়ে যায় তার আপনা হতেই। তার এই পাগলামির জন্যে অনেক কিছু দণ্ডভোগ করলেও, সহানুভূতি পেয়েছে আমাদের কাছে। আমি আর রাম ছাড়া, গুরুদেব তার বড় পৃষ্ঠপোষক।

এবার এসে গেছে আমাদের পালা, চাঁদমারী গিয়ে টারগটে দাগবার। দশ বারো দিন গুলি ছুঁড়ে, হলাম পাকা সেপাই। এতদিন পর ঘুচলো আমাদের রংরুট নাম। পাকা সেপাই ঘোষণা করা হল প্রথা মতন,—আনুষ্ঠানিকভাবে। কায়দা কানুন আছে যথেষ্ট।

প্যারেড মাঠে ইউনিয়ন জ্যাককে মাঝখানে রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম সেটাকে ছুঁয়ে,—'আমি রাজার নামে শপথ করছি, সর্বদাই অনুগত থাকবো আমাদের সরকার বাহাদুরের। জলে স্থলে শূন্যে যেখানে যাবার হুকুম হবে, পালন করব প্রতিটি আদেশ বিনা প্রতিবাদে। অগ্রাহ্য করব না কোনদিনও'। ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আউড়ে শেষ করলাম পাকা সেপাই অনুষ্ঠান পর্ব। ইনাম পেলাম, 'বেঙ্গলীস্' লেখা কাঁধের ব্যাজ। জামার ওপর লাগিয়ে ফিরে এলাম ব্যারাকে, এলাম বেশ চালের ওপর, —রংরুটদের ওপর নাক সিঁটকে।

নতুন নতুন গুজব ঘুরপাক খাচ্ছে আজ ক'দিন, আমাদেরই ব্যারাকে, বা এদিক ওদিক। ছড়াচ্ছে কানাঘুসো ভাবে, কখনও বা প্রকাশ্যে। আমাদের পল্টনকে ঢাকায় নিয়ে যাবার গুজবটা কোথা থেকে সুরু হয়েছে জানিনা। সে'রকম আগ্রহ না থাকলেও, ব্যস্ত হয়ে পড়েছি গুজবটুকু শুনেই।

শুয়ে আছি ব্যারাকে। নিভে গেল বাতিগুলো, লাইটস্-আউটের

বিউগিলের শব্দে। অনেকক্ষণ ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছি, ঘুমের সংগে। বুঝছি আশা কম,—দায়ী ছারপোকা। তবু পড়ে আছি চোখ বুজে। মাঝে মাঝে লড়াই দিচ্ছি ওদের ওপর। সাজ সরঞ্জাম নিয়ে চড়াও হয়েছিলাম রবিবার,—ছুটির দিনে। খাটিয়ার পায়া খুলে হতাহত করেছিলাম কয়েক ডিভিসন, কিন্তু তারিফ করি ওদের জি-ও-সিকে। এসে গেছে রিয়েনফোর্সমেণ্ট দ্বিগুণ জোরে।

ঠাকুরদার অবস্থা একই। আমাকে পাশ ফিরতে দেখে জিগ্যেস করল,—কি-রে ঘুমোলি ? বললাম,—কেন কিছু বলবি ?

বলে বসল,—ঢাকা যেতে রাজী আছিস ? জবাব দিলাম, হুকুম হলেই যেতে হবে, তবে আমার ইচ্ছে নেই মোটেই, ঘরমুখো হবার।

আচ্ছা, যদি ফিল্ডে যাওয়া হয় ?—বুঝলাম না এরকম প্রশ্নের কারণ। আনন্দে বলে ফেললাম, তোর হয়ে দেবো ফেটিগ-ডিউটি খেটে,—যদি সত্যি হয়।

ঠাকুরদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সুরু করল,—হ্যাঁরে বোস সাহেব ছুটি নিয়ে বাড়ী যাবার মুখে সিমলে পাহাড় নাকি ঘুরে যাচ্ছেন ? বললাম—হঠাৎ একথা বলছিস কেন ? এবার সে খোলাখুলি ভাবে বলে বসল,—শুনলাম জেনারেল বিংলে সাহেবের সংগে দেখা করে ফিল্ডে যাবার জন্যে নাকি অনুরোধ করবেন। এসব বিষয় কিছু জানিস ? খবর রাখিস কিছু ?

শুনলাম নতুন গুজব। দেখবো কালই এটা ঘুরপাক খাচ্ছে এ ব্যারাক থেকে সে ব্যারাকে।

ঠাকুরদাকে জিগ্যেস করলাম,—হ্যাঁরে ললিত, তোর বাড়ীতে কে আছেরে ? বিয়ে করেছিস ? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, হুঙ্কার দিয়ে উঠলো ব্যারাক-সেন্টি,—এই ফাইভ-সিক্স প্লেটুন, কথা বলছো কেন ? ঘুমিয়ে পড়। কারও ঘুমের ব্যাঘাত করো না।

গুজবের আদর নতুনের। পুরোনো গুজবের ঠাঁই নেই নতুনের কাছে। পাত্তা পায়না রংরুটদের মত, তাই চাপা পড়ে গেছে ঢাকার গুজব। এখন ছড়িয়ে পড়েছে নতুন খবর। গুজব নয়, একেবারে সত্যি। ওপর থেকে হুকুম এসেছে ফিল্ডে যাবার। যেখানেই যাচ্ছি, শুনছি মেসোপোটেমিয়ার কথা। যাবার আর দেরী নেই, খুব শিগ্‌গির। যেতে হবে জাহাজে ক'রে, একেবারে পুবের বদলে পশ্চিমে।

দেখছি তোড়জোড়ের নতুন রূপ। হাজির হয়েছেন কয়েকজন ধুরন্ধর ইংরেজ অফিসার, খাস স্থায়ী পল্টন থেকে। তাঁরাও যাবেন আমাদের সংগে, অফিসার হয়ে।

উঠতে বসতে শুনছি বিউগিল,—বাজছে, ফলিন। হচ্ছে কিট ইন্সপেকসন। কখনও বা রকমারি দেহ পরীক্ষা, চলে শ্লীলতা ভঙ্গ ক'রে। আছি সবটিতেই, বেজার হলেও, নিষ্কৃতি নেই। ঝুলিয়েছি গলায় নাম ধাম লেখা আইডেন্‌টিটি ডিস্ক, করবে সনাক্ত মৃত্যু হলে। পেয়েছি নতুন নতুন পোশাক নানারকম কিট্।

যাচ্ছি দু'দিন অন্তর ইণ্ডিয়ান ট্রুপ্‌স্ হাসপাতাল। সেখানে অপেক্ষায় থাকেন ডাক্তারের দল, হাতে নিয়ে ইঞ্চি সাতেক মরণঞ্জয়ী পিচকারি। ফুঁড়বেন এক এক ক'রে। দেবেন মিলিটারী ডোস, প্লেগ, টাইফয়েড, কলেরা।

আর কটা দিন মাত্র বাকি। হচ্ছে চূড়ান্ত প্যারেড। কামানের গোলা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দাঁড়াচ্ছি আরটিলারী বা এচিলন্ ফরমেসনে। কখনও বা বুলেটকে এড়াতে এক্সটেনসন্ অর্ডারে। শিখছি একাধারে আত্মরক্ষার সংগে নৃশংসভাবে হত্যা করতে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে। শেষ খাওয়া খেয়ে নিচ্ছি হোটেল রেষ্টুরেণ্টে। দেখে নিচ্ছি শেষ দেখা বায়স্কোপগুলোকে। সুরাপায়ীরা গোপনে মত্ত আছে সুরাপানে। নেশাখোরের মত অর্থব্যয় করছে টাটু (উল্‌কি) ফোটাবার দল,—ফোটাচ্ছে কত রংবেরঙের ছবি বুকে পিঠে হাতে, দেহ ক্ষয় ক'রে।

বোকেন চলে গেল চোখের জল মুছতে মুছতে। তার জন্যে মনটা খারাপ। পাগলা ঠাকুরদাকেও দেখলাম চোখের জল ফেলতে। বয়েস কম, সেজন্যে তার বাড়ী থেকে লেখালেখি করেছিলেন উপরওয়ালার কাছে। হুকুম এসেছে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার। ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল সে কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে। উপায় নেই, তাকে যেতেই হবে। উপরওয়ালার হুকুম।

বোকেনের চোখের জল ফেলার কারণ আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, আমি কিন্তু খুবই অনুভব করছি ওর দুঃখটা। আমারও মন ভরে উঠেছে সমব্যথায়। পল্টনে এসে খাপ খাইয়ে নেওয়া অনেকের কাছে শক্ত হলেও আমাদের গোড়াপত্তন হয়েছে ভালই। ঘুচে গেছে আলস্য, সইতে শিখেছি কষ্ট, বেড়েছে ক্ষিপ্রতা। ভুলে গেছি স্বার্থপরতা, নীচতা।

মোট কথা চট করে সড়গড় করে নিয়েছি এখানকার নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে।

সত্যি বলতে কি, বাড়ীর শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমাদের পক্ষে যেন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানকার কড়া শাসনের কবল থেকে কিছুটা যে রেহাই পেয়েছি এতে আমরা দুজনেই একমত।

তিন

২৪শে জুলাই, ১৯১৭ সাল। রাত প্রায় শেষ হলেও অন্ধকার এখনও যথেষ্ট আছে। এখনও সাগরের লাইট হাউসের বাতি ঘুরপাক খেয়ে ছড়াচ্ছে তার রোশনাই। জ্বলছে রাস্তার প্রতিটি আলো, বেরোয়নি ঝাড়ুদারের দল, চলেনি দুধের গাড়ি। সদর বাজারের সামনে এখনও ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে একের পর এক নাকে দড়ি বাঁধা সারবন্দী উট। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু শব্দ হচ্ছে বুটের খড়াক খড়াক খড়াক। চলেছি করাচির বন্দর কিয়ামারির দিকে, যাবো মেসোপোটেমিয়া। আছি মোট চারশো সৈনিক, বাকি দল যাবে পনের দিন পর।

সদর বাজারকে ডাইনে রেখে চলেছি বান্দার রোড ধরে। কারও সাড়াশব্দ নেই আজ, যেন মূক। মনটাও খুবই ভার। ফিল্ডে যাচ্ছি বলে দুঃখ নেই, জীবন বিসর্জন দিচ্ছি বলেও নয়। কষ্ট শুধু পরিচিতদের ছেড়ে যেতে।

পার হলাম নোরা-ডোরাদের বাঙলো,—সদর বাজার। ফ্লোরার রেষ্টুরেণ্ট পার হয়েছি অনেকক্ষণ। পাশ কাটালাম বম্বে রেষ্টুরেণ্টের। এবার ডাইনে বাঁয়ের ষ্টার কোহিনুর বায়স্কোপের বাড়ীগুলোকে ছাড়িয়ে, বোণ্টুন মার্কেটকে পিছনে ফেলে, লেফট-রাইট করতে করতে এসে হাজির জাহাজ ঘাটে। এখনও আছে আঁধার, একটুও ছড়ায়নি সূর্যের আভা।

শেষ হল জাহাজী ডাক্তারী। পূর্বেই শেষ করেছি ইনজেকসনের পর্ব। দেখছি সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জাহাজ, নাম তার ব্যাণ্ডরা। শেষ করেছি সব কাজ, এখন শুধু অপেক্ষায় আছি উঠবার হুকুমের।

এক কাঁধে বিছানা, আর এক কাঁধে বন্দুক। এর ওপর আছে বেয়নেট, র‍্যাসানটিন, গ্রেট-কোট, বরসাতি, বেল্ট-ব্যাণ্ডোলিয়ার, ট্রেঞ্চ

খুঁড়বার কোদাল গাঁতি, জলের বোতল, স্যাগল, হ্যাভারস্যাক আর আছে একশো কুড়িটা গুলি, যার প্রতিটি ওজন এক আউন্স।

বোঝা নিয়ে উঠছি জাহাজে, মাঝপথে পেলাম লাইফ-বেল্ট। যদি জাহাজ ডোবে, তখন এটাই হবে একমাত্র ভরসা প্রাণটাকে বাঁচাবার। এখন আমার বড় সমস্যা কাঁধ দুটো বাঁচানো। যে টুকু চিন্তা—কখন বোঝাগুলো নামাবো।

জাহাজের খোলের মধ্যে দখল করলাম যে যার জায়গা, নামালাম ঝাপ্পা ঝোপ্পা। সবে মাত্র নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি, দরি-কম্বল পেতে। বাঁশি বাজলো। হুকুম 'ফলিনের'। দৌড়ে এলাম ; সার দিয়ে দাঁড়ালাম ওপরের ডেকে।

হাজির আছেন জাহাজী ক্যাপটেন, আছেন পল্টনের ছোট বড় অফিসারের দল। চললো নতুন পরীক্ষা। দেখা হচ্ছে জলের বোতলে জল আছে কিনা। যদি জাহাজ ডোবে আর কোনও রকমে যদি ডাঙায় ঠেকি, তখন এই মিষ্টি জলই নাকি প্রাণটুকু বাঁচাবে।

মুশকিলে পড়েছি এই জলের পর্বের বেলায়। পাছে জলটা বইতে হয়, তাই বোঝা কমাবার জন্যে আগে থেকেই ছেঁদা করে রেখেছিলাম জলের বোতলটা। দরকারের সময় চালিয়ে যাচ্ছি অপর সাথীদের ওপর দিয়েই ; শুধু আজ নয় বরাবরই।

অফিসারের দল চলতে চলতে নাড়া দিয়ে পরীক্ষা করছেন, জলের বোতল। ভরতি না খালি। যাদের বোতলে জল নেই, লিখে নেওয়া হচ্ছে তাদের নাম নম্বর। কোন উপায় নেই বাঁচবার, শাস্তি অনিবার্য। বুঝছি জাহাজ ডুববার আগেই আমি ডুবেছি।

যাক—ভাগ্য ভাল, বোতলে নাড়া আর পড়লো না। রয়ে গেলাম ফাঁকের মধ্যে। দেখতে লাগলেন শেষের দিকে, তিন চার জন অন্তর একজনের বোতল।

জলের বোতল পরীক্ষার পরই ভাগ হলাম এক একটি ছোট দলে। সেই দলের কারও জুটলো ভেলা, কারও বা নৌকো। সবই জমা রইল ভবিষ্যতের জন্যে।

খাবার যোগাড় করা সৈনিকদের নাকি একটা বিশেষ কায়দা। কাউকে শেখাতে হয়না ওটার ফিকির। আপনা হতেই শেখে সে। যোগাড় করে শুধু তার নিজের জন্যে নয়, অপরেও ভাগ পায়। বিপদও

আছে যথেষ্ট। তুচ্ছ মনে করে তার জীবন। আমরা নতুন, এ বিষয় নেহাত কাঁচা হলেও চেষ্টার ত্রুটি নেই কারও।

জাহাজে উঠেই গোপনে পরামর্শ করেছি বাটলারদের সংগে। ব্যবস্থা করেছি ভোজ্যের। আমরা সাধারণ সৈনিক, ভোজনের ব্যবস্থাও পৃথক। জাহাজেই আছে লাংগারখানা, রসদও আছে মজুত। কুকের সাহায্যে নিজেদেরই করে নিতে হবে রান্নার ব্যবস্থা। জাহাজের বাটলারদের খাওয়াবার দায়িত্ব কেবল অফিসারদের, ভারতীয় বা ইংরেজ। জাহাজীদের কাছ থেকে খাবার যোগাড় করা নিয়মের বাইরে, ধরা পড়লেই বিপদ। এটাই হচ্ছে পল্টনের নিয়ম।

সাতদিন থাকবো। দিতে হবে রোজ পিছু দু টাকা। চা ইত্যাদিতে যুগিয়ে যাবে চারবার। আগাম মেটাতে হবে পুরো টাকাটা। অতএব, মোট চৌদ্দ টাকা জমা দিয়ে হলাম সাত দিনের মত নিশ্চিন্ত।

জাহাজের সামনে খোলের মধ্যে আছি আমরা। পিছনের খোলে আছে গুর্খা পল্টনের দল। কেউ কাউকে দেখতে না পেলেও, জেনেছি ওরা আছে।

জলের পরীক্ষা পর্বের পর বুঝলাম আর কোনও পালা নেই। এবার ভালভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি উপরের ডেকে, একেবারে সামনে, নোঙরের কাছে। দেখলাম নোঙর তোলা—দড়ি খোলা। দেখছি দূরে সরে যাচ্ছে জাহাজখানা—আস্তে আস্তে জেটির থেকে। আমাদের মধ্যে একদল চেঁচিয়ে বলে উঠলো,—বন্দেমাতরম। সংগে সংগে পিছনের গুর্খা পল্টনের চিৎকার শুনছি,—কালী মাইকি জয়।

ঘোলাপানির ওপর দিয়ে চলেছি, ডাইনে ম্যানোরা-ফোর্টকে রেখে। এখনও ঘুরছে লাইট হাউসের জ্যোতিহীন বাতি। বাঁয়ে এখনও দেখা যায় ক্লিপটনের ঘর বাড়ী, কখনও বা পুরো শহর। ক্রমশ চোখের আড়াল হল একের পর এক। অদৃশ্য হল ভারতের ভূমি। রইল চারদিকে জল, উপরে আকাশ।

নাড়া দেয় মন। মনে পড়ে বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন, কোলকাতা, ভারতভূমি। শ্রদ্ধা জানাই গুরুজনদের। আপনা হতেই মাথা নিচু হয়ে আসে ভারতের কাছে, হে ভারত, বিদায়।

হুজুক আছে। আছে উল্লাস, হৈ হল্লা, আনন্দ। এটাই সৈনিক জীবনের বৈচিত্র্য। কয়েক জনে গান ধরেছি, ‘যেদিন সুনীল জলধি

হইতে',—তারপর ? তারপর 'উঠিল বিশ্বে' বলার সংগে সংগে শুনলাম খালাসীদের চিৎকার,—কালাপানি কালাপানি। অর্থাৎ আমরা সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে এইমাত্র পড়লাম নাকি গভীর সমুদ্রে।

'উঠিল বিশ্বে', বলার পর আর কি বলেছি জানিনা, মাত্র বুঝেছি জাহাজখানা বিশতলা ওপর থেকে নীচে নেমে গেল সড়সড় করে। সংগে সংগে গুলিয়ে গেল শরীর। পাকিয়ে গেল তালগোল। মনে হল বুঝি খুলে গেল উদরের বাঁধন। মুহূর্তের মধ্যে সুরু হল হড় হড় করে বমি।

ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে। হতভম্ব হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছি মাত্র, আবার চললো পূর্ণগতিতে। ফাঁক নেই একটুও, দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাই। সোজা কথায়, জাহাজখানা করতে লাগল তাণ্ডব নৃত্য।

এগোতে লাগলাম কোনওরকমে—বসে, দাঁড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা কাত হয়ে। হাতড়াতে-হাতড়াতে কসরতের পর কসরত করে সিঁড়ির রেলিং ধরে চেষ্টা করছি নীচে নামতে। বেসামাল হয়ে বমি করে দিলাম সামনের সাথীর মাথায়। সংগে সংগে ওপর থেকে কে যেন বমি করে দিল আমার মাথায়। শক্ত করে ধরে আছি দু'পাশের দু' রেলিং। বুঝছি গড়িয়ে পড়ছে মাথার বমি, দুপাশের দুগাল বেয়ে। উপায় নেই কিছুই করবার হাত ছাড়লেই বিপদ, পড়বো গিয়ে সামনের সাথীর ঘাড়ে। তারও অবস্থা আমারই মতন, সেও বমি করছে তার সামনের সাথীর মাথায়। দেখছি সিঁড়ির ওপর এভাবে চলেছে বমির রিলে রেস, বা বাঁধছে গাঁটছড়া। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজের কোলাহল, হট্টগোল সবই হল নিস্তব্ধ। শুধু কানে আসছে জাহাজ চলার শব্দের সংগে বমির শব্দ ওয়াক-ওয়াক, হড়-হড়, হড়-হড়।

কটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে জানি না। জেনেছি কেবল বমি করতে, বমির ওপর ফুটবলের মত গড়াগড়ি দিতে। এখনও বমি করছি, আশে-পাশের সাথীরাও চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। দূর থেকে শব্দ পেলাম পাগলা ঠাকুরদার। ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল,—নামিয়ে দাওগো হেঁটে যাব, যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব।

জাহাজের নোনা জল, পাঁউরুটি, আচার, পাকা আম, নতুন বরসাতি আর বমির গন্ধে নীচের ডেকটা মশগুল। এ গন্ধটা সয়ে এসেছে এ কদিনেই। এ ছাড়া যে আর কোনও গন্ধ আছে তা প্রায় ভুলে গেছি।

এটা যে একেবারে অসহ্য, বুঝলাম জাহাজের উপরের ডেকে এসে—চারদিনের দিন সকালে।

শরীর অবসন্ন। নিঝুম হয়ে বসে আছি। আকাশের দিকে তাকাতে ভয় হয়। একবার হঠাৎ তাকিয়েছিলাম, দেখেছিলাম আকাশের বদলে ঢেউ-এর তোলপাড়। কখনও বা উপরে, আবার সংগে সংগে নীচে। তবে শুভলক্ষণ, বমির ভাবটা কমছে একটু একটু করে।

কে যেন এসে মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গেল কিছুটা খিচুড়ি। অবশ্য সে আমাদেরই একজন। অবাক হয়ে গেলাম খিচুড়ির স্বাদ পেয়ে। মনে মনে সাথীর তারিফ না করে পারলাম না। ভাবলাম, নিশ্চয় সে সৈনিক হবার আগে কাজ করেছে—জাহাজীর, নইলে এই দুর্দান্ত জাহাজ দোলার মধ্যে রাঁধল কেমন করে!

একটু একটু করে শান্ত হচ্ছে ঢেউ। শরীরও হয়েছে চাঙ্গা। এখন আমরা 'ওমান উপসাগর' পার হয়ে চলেছি 'অরমোজ প্রণালীর' দিকে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে দুপাশের আবছা পাহাড়, আর দেখছি পাখীর ঝাঁক।

এ কদিনে স্মৃতিশক্তি যেন লোপ পেয়েছিল। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, চৌদ্দ টাকার কথা। হাজির হলাম বাটলারের কাছে। দাবী করলাম খাবার। আমার মত আর যারা ছিল, তারাও এসে হাজির। দাবীও করেছে আমারই মতন।

খাবার তাদের কাছে পেলাম। ঠিকমতন দিনে চারবার করেই পাচ্ছি। মোটেই বেইমানি করেনি তারা। তবে পাবো মাত্র সাড়ে তিন দিনের। যে কদিন খাইনি, দাবী করলাম সে' কদিনের টাকা।

জবাব পেলাম, ফেরত পেলাম না টাকা। বলে, রেওয়াজ নেই টাকা ফেরত দেবার, এটাই নাকি জাহাজী কায়দা।

অগত্যা খরচের খাতায় সাতটাকা লিখে, জমার জায়গায় লিখে রাখলাম, 'জাহাজী কায়দা'।

এবার ডেকের ওপর খাটানো হল ক্যানভাসের ট্যাঙ্ক। পাম্প করে জল তোলা হল উপসাগরের। দিব্যি আরাম করে নোনা জলে স্নান সেরে, তুলে ফেললাম বমির কোটিং।

এখন লাগছে ভাল, সাগরও শান্ত। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট ছোট উড়ন্ত মাছ। হঠাৎ উঠে আসে আট দশ ফুট ওপরে, আবার ঝপ ক'রে ঢুকে পড়ে জলে। জলের বড় মাছ ওদেরকে ধরতে এলে উড়ে পড়ে

আকাশে। সেখানেও নিস্তার নেই। উড়ছে সমুদ্রের পাখি—সী-গাল। বিপদ ওদের দুদিকেই।

কদিন দেখছি খালি জল আর জল। আজ অরমোজ প্রণালীর দুপাশের পাহাড়গুলো দেখে আভাস পেলাম নতুনের। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড নেড়া পাহাড়। ঘরবাড়ী গাছপালা মোটেই নেই। খুব দূরে নয়, মনে হয় মাত্র এক মাইল। দেখছি ডান দিকে আর একটা ছোট পাহাড়ের দ্বীপ। চূড়োয় দিনরাত চক্কর দিচ্ছে লাইট হাউসের বাতি। জ্বলছে আপনা হতেই। লোকজন আছে বলে মনে হয় না। এটা দেখায় যেন আরো কাছে।

পার হলাম অরমোজ প্রণালী, পড়লাম পারস্য উপসাগরে। এখানে আর এক উপসর্গ। অসহ্য গরম। নীচে ওপরে একই ভাব, বাদ নেই কোথাও। জিগ্যেস করলাম বাটলার-সাহেবকে—টেমপারেচার কত? জানালো, একশো চব্বিশ।

ডেকের ওপর খোলা জায়গায় দাঁড়ালে, লাগে আগুনের মত গরম হাওয়া। নীচে খোলের মধ্যে ভেপসানি গরম। নলের ভেতর দিয়ে খোলের মধ্যে বাতাস আসবার ব্যবস্থা থাকলেও, আনচান করছি গরমে। দেখলাম জাহাজের খোলের একেবারে নিচু থেকে উঠে এলো একজন জাহাজী। ইঞ্জিনের কাছে থেকে লড়াই করছিল এতক্ষণ আগুনের সংগে। কয়লা ঠেলছিল বয়লারে।

দিনে প্রচণ্ড গরম হলেও রাতটা আরামের। বেশ ঠাণ্ডা। গভীর রাত, আরামে ঘুমোচ্ছি সকলে, একেবারে উপরের ডেকে। শুনলাম বিউগিলের শব্দ। বাজাচ্ছে, 'ডেন্‌জার-সিগনাল'। উঠে পড়লাম ধড়মড় করে। কথাবার্তা না বলে, আধা ঘুমো চোখে বুকের ওপর জড়িয়ে ফেললাম লাইফ-বেল্টটা। জলের বোতলটা কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে, দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম নিমেষের মধ্যে।

সাবমেরিনে নাকি ফুটো করে দিয়েছে আমাদের জাহাজ, তাই এত দৌড়াদৌড়ি। ঠাকুরদাও দাঁড়িয়েছে মাস্তুল ঘেঁসে। একমাত্র ওটাই নাকি ওর শেষ ভরসা। জাহাজ ডুবলে সেও নাকি ঠেলে উঠবে মাস্তুলের ডগায়।

বুঝছি বিপদ, নিরুপায় আমরা। ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকলেও দেখা দেয়নি বিশৃঙ্খলা, হা-হুতাশ। সকলেই তৎপর।

জাহাজী ক্যাপটেন থেকে সুরু করে হাজির আমাদের ছোটবড় সব অফিসার। চুপচাপ দাঁড়িয়েছি ভাগ করা যে যার নৌকো ভেলার সামনে। ওদিকে খালাসীরাও আছে দাঁড় হাতে করে। সবই প্রস্তুত হল চকিতের মধ্যে। এবারে চড়ে বসে দড়ি আলগা দিয়ে নৌকোগুলো জলে নামালেই হল।

এ্যাডজুটেণ্ট কাছে এসে সকলকে দেখলেন এক এক করে। দেখার পর্ব শেষ হল। শুনলাম, কম্যাণ্ড—ডিস্‌মিস্।

বুঝলাম মহড়া। পাগলা ঠাকুরদাও সংগে সংগে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলো; অফিসারদের উদ্দেশ করে। কি বললো সেই জানে।

জিজ্ঞেস করলাম—কি বল্‌লিরে?

জবাব দিলো—বিকাশ।

রাত্রে দৌরাত্ম্য অফিসারদের। ভোরের উপদ্রব খালাসীদের। জাহাজ ধোবার জন্যে অন্ধকার থাকতেই হোসপাইপ দিয়ে ডেকের উপর জল ছেড়ে দেওয়া, এর ওপর, জাহাজ দোলার সময় ছিল তাদের ছোট বড় হাত সাফায়ের কায়দা। সব রকম জাহাজী কায়দায় জড়িয়ে আমরা যেন পড়ে গেছি বেকায়দায়। এখন কোন রকমে নামতে পারলে বাঁচি। যখন আমরা ওমান উপসাগরে, তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম একজন জাহাজীকে, এখন আমরা কোথায়? জবাব পেয়েছিলাম,—পানির ওপর।

ঠাকুরদা কিন্তু জবাব দিয়েছিল, সংগে সংগে, বলেছিলো নাগো সাহেব, বল,—কবরে।

পারস্য উপসাগরে সময়টা চট করে কেটে যাচ্ছে জলে হাজার হাজার হাঙরের খেলা দেখে। মাইলের পর মাইল দৌড়োচ্ছে হাঙরের দল জাহাজের পাশ ঘেঁসে। হয়তো আশায় আছে জাহাজ ডোবার। দেখছি জাহাজের পেছনে উড়ে চলেছে সী-গালের ঝাঁক, চলেছে জাহাজের চাকায় লাগা মরা মাছ খেতে খেতে।

পারস্য উপসাগর দেখতে সমুদ্রের মত হলেও অনেক জায়গায় জল খুবই কম। মাঝে মাঝে ডাঙায় ঠেকে গুলিয়ে উঠছে কাদাগোলা জল। চলেছি শুনতে শুনতে খালাসীদের সুর করে জল মাপা—'এক বাঁ মিলে নাই, দু বাঁ মিলে নাই'।

ছ' দিনের দিন বিকেলে জাহাজ নোঙর করল সেট্-এল্-আরবের

মোহনায়। এতদিন বাদে দেখলাম আর একটা জাহাজ। দাঁড়িয়ে আছে নোঙর করে, একই জায়গায়। বড় বড় অক্ষরে লেখা তার গায়ে—'পাইলট'।

ধ্বজা উড়িয়ে হতে লাগলো ওদের সংগে খবরাখবর। বুঝলাম আজ রাতটা কাটাতে হবে এখানেই। অতএব, সময় নষ্ট না করে আমাদেরও অনেকে লেগে পড়ে গেল ডেকের ওপর—'ব্ল্যাঙ্কেট-টসিং' খেলতে। কেউ বা দেখছে খালাসীদের হাত সুতো দিয়ে মাছ ধরা।

ক'দিনের পর আজ আনন্দে নেচে উঠেছে মন, ডাঙা দেখে। দেখছি দূরে অস্পষ্ট রেখার মত বাঁয়ে আরবের কিনারা, ডাইনে পারস্যের। আবার জাঁকিয়ে বসেছি জাহাজের সামনে। একেবারে উপরে, সেই নোঙরের কাছে। আসর জমিয়েছে পাগলা ঠাকুরদা। আছে আরও দু'চার জন। এইখানেই বসে প্রথমদিন গান ধরেছিলাম। চলেছিল মাত্র দু'লাইন। শেষ করতে দেয়নি—জাহাজদোলা। আজ সে বিষয় নিশ্চিন্ত। এখন সাগর শান্ত, ধীর, স্থির—যেন সুপ্ত। মনেই আসে না তার দুর্দান্ত রূপ।

রোজই ওঠানামা করে দিবাকর। ঝোঁক নেই মোটেই তার সৌন্দর্য দর্শনে। কেবল লক্ষ্য রাখি বাটলার সাহেবের কেবিন ঘরে। নজর রাখি তার আসা যাওয়া; মধুর লাগে খাবারের ডিসের শব্দ। অপেক্ষায় থাকি কখন চুপি চুপি বাড়িয়ে দেবে খাবারের থালা। তবু আপনা হতেই চোখ পড়ে গেল পশ্চিমাকাশে। দেখলাম একটু একটু করে ডুবে গেল রবি উপসাগরের বুকে।

জাগলো ফিলিংস।

মণি মুখুজ্যের গলাটা ভাল। আমার সুরবোধ না থাকলেও জোড়া তালি দিতে পারি কিছুটা। তবে গাইতে হয়নি কোনদিনও দু' লাইনের বেশী। এটাই পণ্টনীয়ার দস্তুর। প্রতিবারেই ঘটে কোন না কোন ব্যাঘাত, কিংবা বাজে ফলিনের ভেপু। উপরন্তু আছে ধৈর্যের অভাব। মণি গান ধরল,—

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া,
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।

দুটি লাইন বার কয়েক ঘুরে ফিরে চল্‌ছে কোরাস্‌। ঠাকুরদাও চেঁচাচ্ছে সুরে বেসুরে। সুন্দর জমে উঠেছে গান। ভরপুর হয়ে আছি

নতুনের আনন্দে। এবার রসভঙ্গ করল পাগলা ঠাকুরদা। গানের মাঝে বেতালায় হঠাৎ কি যেন বলে চীৎকার করে উঠলো, তার নিজস্ব ভাব ভঙ্গিতে। একটানা বলেই চলেছে, পাক দেওয়া দড়ির মতন কতকগুলো অস্পষ্ট জড়ান কথা। ভাষা খুঁজে না পেলেও, আছে ভাবের রেশ। মাত্র শেষ কথাটা কানে গেল, ধরেছেরে—ধরেছে।

গান থেমে গেল। পণ্ড করে দিল আমাদের ফিলিংস্। সকলে মিলে চেপে ধরলো ওকে; নিয়ে চলে তাকে চ্যাংদোলা করে। বলে, নির্ঘাত ফেলে দেবে সাগরের জলে।

রাগ-রাগিণী বন্ধ হলেও ত্রাহিস্বরে চীৎকার করে ঠাকুরদা—গর্দভ রাগিণীতে। বলে অনেক কিছু,—ওরে ছেড়ে দে—না, ওরে ও ডোম ডোক্‌লার দল, ওরে ও বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানোর দল,—ভাল চাসতো ছেড়েদে বোলছি।

কে কার কথা শোনে, চলে ঠাকুরদাকে দিয়ে টানাটানি। মুক্ত করলাম ওদের কবল থেকে,—দিলাম টাকের উপর গুণে তিন চাঁটি। হল ঠাকুরদা অগ্নিমূর্তি। বলে—গায়ে হাত দিস না বলছি। আর যা করিস আপত্তি নেই তাতে, শুধু ভাল লাগে না তোদের প্র্যাকটিক্যাল্ জোক্।

জিজ্ঞেস করলাম, ওরকম চীৎকার করলি কেন? ছাখতো সব নষ্ট করে দিলি তুই। জবাব দেয় ধীরভাবে, 'ফিলিংস্ কি আমারও কিছু কম?—নষ্ট করে দিলতো ওরা। ঐ ছাখনা, মিথ্যে বলছি।

তাকালাম খালাসির দিকে। সত্যিই তো। দেখলাম হাতসুতো দিয়ে গেঁথে তুলেছে হাতখানেক লম্বা একটা মাছ। দৌড়োলাম খালাসির কাছে। মাছ কি হবে তা জানি না, তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—বেচেগা?

উত্তর দিল মিনিট কয়েক ধরে। বললো ওদের ঘরোয়া বর্ণমালায়। বুঝলাম না এক বর্ণও। জানলাম একই বাঙলার লোক হলেও ওর ভাষা দুর্বোধ্য।

পণ্টনের নিয়মকানুন বড়ই কড়া। চলতে হয় সর্বদাই নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করে। রক্ষে নেই একটু এদিক ওদিক হলে। কখন যে কোনদিক দিয়ে গলদটা আসবে তারও ঠিক নেই। একটু বড় রকমের গলদ হলেই,

কোর্টমার্শাল। পল্টনে আসবার আগে কোর্টমার্শাল বলতে বুঝতাম, গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া। এখানে এসে সে ভুল ভেঙেছে। সামরিক কোর্টের বিচার,—কোর্টমার্শাল। সে বিচারে দোষী হলে দিতে পারে মৃত্যুদণ্ড, নইলে দৈহিক শাস্তি। আবার বেকসুর খালাস পাওয়া বিচিত্র নয়।

ডেকের ওপরে থেকে দেখতে লাগলাম দু'জন আরবকে। নৌকো করে আসছেন পাইলট জাহাজ থেকে, আমাদেরই জাহাজে। শুনলাম এবার এঁরাই নাকি হবেন কর্ণধার। নিয়ে যাবেন নদীর পথ দেখিয়ে।

অন্ধকার থাকতেই শব্দ পেলাম জাহাজ চলার। হোস পাইপের জল ছাড়ার সংগে সংগে উঠে পড়লাম কম্বলের মায়া ত্যাগ করে। স্পর্শ পেলাম ভোরের আলোর। উপরের ডেকে এসেই উঁকি দিলাম সেলুনের জানালা দিয়ে, বাটলার সাহেবের আশায়। মিলন হল চার চোখের, পেলাম ভোরের চা।

মগ ভরতি চা হাতে করে এসে দাঁড়ালাম রেলিংএর ধারে। দেখি চলেছি নদীর কোল ঘেঁসে। কখনও পারস্যের পাড়ে, কখনও বা মেসোপোটেমিয়ার।

পারস্য উপসাগর থেকে মেসোপোটেমিয়ার বসরা শহর প্রায় পঁচাত্তর মাইল। কুর্ণা শহর বসরা থেকে আরও কুড়ি মাইল উত্তরে। কুর্ণা থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এই নদীর নাম, সেট-এল-আরব। চওড়ায় আমাদের কোলকাতার গঙ্গারই মত।

প্রায় কুড়ি মাইল চলে এসেছি, দুপাশের ছোট ছোট গ্রাম, খেজুর বাগান আর আঙুরের ক্ষেত দেখতে দেখতে। দেখছি আরব মেয়েদের কলসী কাঁধে। জল নিতে এসেছে নদীর ধারে।

এদেশের কলসীটা একটু ভিন্ন ধরনের। নীচের দিকটা কুলপি বরফের খোলের মত লম্বা প্রায় ফুট খানেক। রং সাদা। হাতল আছে, এক বা উভয় পাশেই। দেখতে খুবই সুন্দর, সম্পূর্ণ নতুন লাগে চোখে।

আরও দুমাইল চলে আসার পর দেখছি যুদ্ধের নিদর্শন। দেখছি আড়া-আড়িভাবে ডুবে আছে দুখানা জাহাজ। দেখা যাচ্ছে কেবল মাস্তুলের ডগা।

নদীর পথ বন্ধ করবার জন্যে তুর্কিরা নাকি ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দিয়েছে

নিজেদেরই জাহাজ। কাজের হয়নি জাহাজ ডুবিয়ে। থেকে গেছে একখানা জাহাজ চলার মত সঙ্কীর্ণ পথ।

পাশ দিয়ে চলে এলাম ডাইনে মাহাম্মারা নামে পারস্য সীমানার ছোট শহরটাকে ফেলে রেখে। খুব ছোট শহর হলেও গুরুত্ব আছে যথেষ্ট। দেখলাম নোঙর করা অনেক জাহাজ। শুনলাম, ওখান থেকে বোঝাই হয় পারস্যের তেল। রপ্তানি চলে বাইরে।

দেখছি কেবল মরুভূমি, গ্রাম, খেজুর বাগান। এছাড়া বিশেষ কিছু নজড়ে পড়ে না। সেট-এল-আরবের দুপাশ দেখতে দেখতে এসে হাজির বসরা শহরে। বেলা তিনটে হলেও জোটেনি আজ সকালের উদরান্ন, সরকারি রসদ খিচুড়ি। তবে সহায় সম্বল বাটলার সাহেব, কিন্তু আজ যেন একটু ছাড়া-ছাড়া, ভাবটা যেন কী রকম।

জেটিতে জাহাজ না ভিড়িয়ে নোঙর করল মাঝ নদীতে। মুহূর্তের মধ্যে নানান বেশাতি নিয়ে এসে হাজির আরব ইহুদি স্ত্রীলোকের দল। ভিড়িয়ে দিল তাদের বাল্লামগুলো (পানসি নৌকো) আমাদেরই জাহাজের গায়ে।

প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম ওদের চিৎকার,—আঙুর, নারিঙ্গী, আনার, খেজুর আরও কত কি ওদের ভাষায়। শুনছি 'রফিগ' কথাটা খুবই। বুঝলাম রফিগের অর্থ,—বন্ধু।

কাছে এসেই তাগ করে ছুঁড়ে দিল একটা শক্ত সরু দড়ি। খপ্ করে ধরে ফেললাম ক্রিকেট বলের ক্যাচ ধরার মত। দড়ির নীচে আছে একটা ছোট্ট ঝুড়ি বা চুপড়ি। ঝুড়িতে পয়সা দিয়ে নামা-ওঠা করতে লাগলো সিগারেট, বিস্কুট, নারিঙ্গী, আনার। স্বচ্ছন্দে সওদা করছে সৈনিক-রফিগের দল। দাঁড়িয়ে দেখছি ওদের কেনা বেচা।

ধীরে ধীরে জাহাজ ভিড়লো,—আসার-পিয়ারে, সন্ধ্যার কিছু আগে। নামালাম মালপত্তর। ঝাপ্‌পা-ঝোপ্‌পা চাপিয়ে, বন্দুক কাঁধে নিয়ে সুরু হল মার্চ। রাত বেশী না হলেও মনে হয় খুবই গভীর। সবই নিস্তব্ধ। কোথা দিয়ে চলেছি, কোথায় যাব, কিছুই জানি না। হুকুম হয়েছে চলার, তাই চলছি।

শহর ছাড়িয়ে চলেছি শহরতলী দিয়ে। অন্ধকার কাঁচা রাস্তা হলেও স্বচ্ছন্দে চলতে পারে মোটর বা লরী। চলেছি খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে। দেখছি দুপাশে কেবল পল্টনের ছাউনি। কোথাও ক্যাভালরী,

কোথাও বা লান্‌সার। দেখছি আরটিলারীর দল। অন্ধকারে ভাল রকম ঠাওর করতে না পারলেও স্পষ্ট শুনছি বুটের শব্দ। কখনও বা ঘোড়ার শিকলের। দেখছি সেন্ট্রির চক্‌মক্‌ করা বেয়নেট। থেকে থেকে কানে আসছে পাহারাদারের চ্যালেঞ্জ—হল্ট, হু-কাম্‌স-দেয়ার ?

মাইল চারেক চলার পর হাজির হলাম আস্তানায়। খোলা মাঠ, তাঁবুর নাম মাত্র নেই। তাঁবু খাটানোর পর্ব হবে কাল। আমরাই করব। সম্পূর্ণ খোলা মাঠ হলেও ব্যবস্থা আছে জল-পায়খানার।

হুকুম পেলাম ডিসমিসের। সংগে সংগেই নামালাম সাজসরঞ্জাম। বুঝছি এবেলাও অন্ন নেই। অতএব, বন্দুক কোলে নিয়ে গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে। রাতটা কাটাবো এই খোলা মাঠে, এই ভাবেই। বিছানার সংগে সম্বন্ধ নেই। ওটা আছে জাহাজ ঘাটে। কাল পাবো।

ভোর হচ্ছে। বুঝতে পারছি সূর্যদেবের আগমন। মনে হচ্ছে যেন এগিয়ে আসছে আগুনের গোলা। ন'টার পর অসম্ভব হবে চলাফেরা। তা হলেও চলতে হবে আমাদের। করতে হবে সব কাজ। দিতে হবে পাহারা,—আমরা যে সৈনিক।

শেষ খাওয়া খেয়েছি কাল বেলা একটায়। বিকেলে জুটেছিল আঙুর, নারিঙ্গী, বিস্কুট। কিনেছিলাম ইহুদি-রফিগ্‌নীর কাছে। এখন ক্ষিধেও পেয়েছে খুবই। আর কিছুই আশা করি না,—চাই শুধু এক মগ চা। এখানকার হালচালে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চোখে পড়ে চারিদিকে কেবল তাঁবু আর তাঁবু,—যতদুর দৃষ্টি যায়। দেখছি এখনও অনেক সাথীর কোলে বন্দুক, মাথায় হ্যাভার-স্যাক, জলের বোতল। রাত কাবার করছে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে।

আশ্চর্য লাগে স্বামীজিকে দেখে। টিপির ওপর বসে মৌজ করে চা সেবা করছেন, তাঁর একসেরি মগটা হাতে করে। স্বামীজি নাম গুরুদেবেরই দেওয়া।

একপা দু'পা এগিয়ে চলি তাঁর দিকে, আবার থমকে দাঁড়াই। ভাবি, যাবো কি যাবো না, চাইব কি চাইবো না। কারণ আছে কিছু।

পল্টনের একজন বিশিষ্ট অফিসারের নজরে আছি আমি। কাটাচ্ছিও তাঁর সংগে সর্বদাই। ব্যক্তিত্ব তাঁর যথেষ্ট, সম্ভ্রম করেন অনেকেই। এমন কি ইংরেজ অফিসারের দল।

আমার এই হিতাকাঙ্ক্ষী অফিসার শুনিয়েছেন হুঁশিয়ার বাণী। দুরে

থাকি যেন স্বামীজির সংসর্গ থেকে। জানিয়েছেন, গলদ আছে নাকি এর অনেক কিছু। স্বামীজিও জানেন সেটা, জানে তাঁর ভক্তরা। তাই, ভাবছি কি করি।

স্মরণে এল যোগীনদার বাণী, ত্যাগ করতে হবে লজ্জা, নীতি, ঘৃণা, ভয়।

মগটা নিয়ে হাজির হলাম স্বামীজির কাছে। দৃষ্টি আমার, চায়ের মগে। তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে—নিশ্চল, পলকহীন।

বলেছি মাত্র,—স্বামীজি।

হাসিমুখে জবাব দেন,—কি ভক্ত, বাসনা আছে?

আনন্দে আমি আত্মহারা। নাক কান বুজে বলে ফেললাম,—স্বামীজি মরে গেলাম, কাল থেকে কিছুই খাইনি। একটু যদি দয়া করেন, আর কিছুই না, শুধু একমগ চা।

এই সামান্য কথা? তাতে আর কি হয়েছে—নিশ্চয় দেব। এটাই তো সৈনিকের ধর্ম। সৈনিকের কাজ কি শুধু যুদ্ধ করা? সৈনিক আত্মত্যাগী, পরপোকারী। যে সেটা মনে ঠাঁই দেয় না, সে সৈনিকের উপযুক্ত কি?

জিজ্ঞেস করলেন,—চা দুধ চিনি আছে?

হ্যাঁ আছে, পাতা চায়ের সংগে আছে মিল্ক ট্যাবলেট, আর আছে স্যাকারিন।

তবে আর ভাবনা কি। আমি জানি, অভাব গরম জলের। চা দুধ বহন করা যায়,—যায় না গরম জল। চল আমি গরম জল দিচ্ছি।

দৌড়ে গিয়ে হ্যাভারস্যাক থেকে চা দুধ স্যাকারিন মগের মধ্যে ভরে, চলতে লাগলাম স্বামীজির সংগে। গরম জলের আশায়।

কতদুর যাব জানি না, চলেছি স্বামীজীর সঙ্গে। তিনিও বলে চলেছেন, এ জায়গার নাম মাকিনা ক্যাম্প, পল্টনের একটা বড় ছাউনি। আছেও প্রায় বিশ হাজার সৈনিক। কাছে পিঠে দোকান নেই। যেটুকু সম্বল, তাঁবুর মধ্যে মিলিটারী ক্যানটিন। সামান্য কিছু পাওয়া যায়,—তাও টিনে ভরা। খুলবে নাকি আটটায়, তারও মেয়াদ, মাত্র এক ঘণ্টা।

দেখছি চারিদিক, শুনছি কথা। একটুখানি থেমেই আবার সুরু করলেন,—তবে সব চেয়ে কষ্ট স্নানের। ঐ যে খালটা দেখছো, চ'লে এসেছে খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে, স্নানের পর্ব চলে ঐটুকু খালে এই

বিশ হাজার সৈনিকদের। আর ঐ যে ডাইনে গোল তাঁবুগুলো দেখছো—ফরসা ফরসা লোক, ওরা কিন্তু ইংরেজ নয়। ওরা ইজিপসিয়ান। ঠিক ওদেরই সামনে আছে পাঞ্জাবী পল্টন, তার পাশেই গুর্খা। গুর্খাপল্টনের পরেই ফাঁকা মাঠ, তার পাশেই জাঠ-পল্টন। আমরা যাব ঐ জাঠ-পল্টনের কিচেন ম্যানেজারের কাছে।

চলেছি শুনতে শুনতে স্বামীজির কথা, পুঁজি হচ্ছে অভিজ্ঞতা, কিন্তু মন পড়ে আছে গরম জলের দিকে।

জাঠ পল্টনের লাংগারখানায় হাজির হয়ে, স্বামীজি তাঁর নতুন ভক্তকে বললেন,—সাথী, আউর থোড়া পানি মাংতা।

হাবিলদার সাহেব একটু যেন বিচলিত। জবাব দিলো,—সাথী আভিতো ডাল ছোড় দিয়া।

মাস কড়ায়ের ডাল। গরম জলের মধ্যে পড়ে খোসাগুলো ভেসে উঠেছে ইঞ্চি দু'য়েক পুরু হয়ে।

স্বামীজি মৃদু হেসে খুবই বিনয়ের সংগে আবার বললেন—কুছ পরোয়া নেহি সাথী, উপারসে মাস হাটাইকে বিচমেসে থোড়া পানি দিজিয়ে, উস্‌মেই হামারা কাম চলেগা।

খুব খাতিরের সংগে জল ভরে দিল, আমার এই আধসেরি মগে। দস্তুর মতন আনন্দের সংগে দু'পাটি দাঁত চিপে চা পান করলাম, জাঠ পল্টনের লাংগারখানায় বসে। এই দু'পাটি দাঁতই করে আমাদের চা ছাঁকনির কাজ।

জিজ্ঞাসা করলাম ফেরবার পথে—আপনি কি পুর্বে কখনও এই বসরায় এসেছিলেন? জবাব দিলেন,—না, আমার এই প্রথম আসা, তোমাদেরই সংগে। তুমি হয়তো ভাবছো এত আমি জানলাম কেমন করে। দেখ সবই নির্ভর করে আগ্রহের ওপর, আমি বুঝেছি পল্টনের মার-প্যাঁচ। ফিল্ডে কাটাতে হলে সময় অসময়ে জোগাড় করতে হবে রসদ। আমার একার জন্যে নয়, জোগাড় করতে হবে আমার ভক্তদের জন্যেও, অবশ্য এসব জোগাড় করবার জন্যে আমার কাছেও আছে এক অব্যর্থ দাওয়াই। কী, অবাক হচ্ছো? অবাক হবার কিছুই নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—ভক্ত খুঁজছিলাম খুব ভোরে উঠেই। ঠিক মতন জুটেও গেল ঐ লাংগারখানার নতুন ভক্ত। হয়ে গেল যোগাযোগ, খুশি মনে দিলাম দাওয়াই। হল দোস্তি—পেলাম চা। অবশ্য আশা রাখি আরও অনেক।

এটা নতুন কিছুই নয়—পণ্টনের দস্তুরই এই, চলেও হামেশাই। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার পক্ষে বোঝা শক্ত। তবে দরকার হলে আসবে আশ্রমে, (তাঁবুতে) সাধ্য হলে দেবো প্রসাদ। কিন্তু স্মরণ রেখো আশ্রমের নিয়ম, তুমিও পেলে দেবে ভক্তদের।

হেঁয়ালির মধ্যে রয়ে গেল সব। সবই শুনলাম, বুঝলাম না কিছুই। তা যাই হোক, মন তাঁর ছোঁয়া পেলো, লাগলো ভাল। আমি যেন আজ থেকে হলাম তাঁর এক নতুন ভক্ত। কিন্তু খুব সাবধানে, অতি গোপনে, যতদুর সম্ভব দুরে থেকে, ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে।

দিন সাতেক কাটলো এই গরমে। চলাফেরা করা দায়, তবু ছুতো খুঁজছিলাম কদিন ধরে। জুটেও গেল আজ। ঘুরে এলাম বসরা শহর। দেখে এলাম আমার অফিসারের ব্যাঙ্কের ফরমাশ নিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার—বসরা গেলাম অথচ দেখলাম না বসরা শহর। আমরা যাকে বসরা বলি, আদবেই সেটা বসরা নয়। নাম তার—আসার। খাস বসরা শহর, আসার থেকে আরও প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে। শহরের শেষ প্রান্তে। খুব ছোট শহর। সৈনিকদের অধিকার নেই ঐ শহরে যাবার; যাকে বলে—আউট অফ বাউণ্ডস। সরকারি অফিস, কাজ কারবার, ব্যাঙ্ক, ফেরি-ষ্টিমার ঘাটা, হাট-বাজার সবই এই আসার শহরের বুকে। যান-বাহন খুবই কম; দেখলাম খানকয়েক মাত্র আরবানা (ঘোড়ার গাড়ী) মোটর ট্যাক্সি মোটেই নেই। আছে সুন্দর গদি তাকিয়া দেওয়া বাল্লাম নৌকো। তাতেই চলে যাওয়া আসা। যায় শহর বা শহরতলীর খান্দা ক্রীক, খোরা ক্রীক, আসার ক্রীক নামে খালগুলো দিয়ে।

চার

দেখতে দেখতে কাটলো প্রায় এক মাস এই মাকিনা ক্যাম্পে। দশ বারো বর্গমাইল জায়গা জুড়ে কেবল তাঁবু আর তাঁবু। একে এই অসহ্য গরম, তার ওপর জলের কষ্ট, এ'কদিনেই অবস্থা আমাদের সঙ্গিন। মাত্র এক বোতল জল সমস্ত দিনের রসদ, তাতেই সব কাজ। ছাউনির পুব দিকে মাইল খানেক দুরে খেজুর বাগানের মধ্যে দিয়ে এসেছে একটা

আবাদি খাল। হাঁটু ভরতি কাদা গোলা ঐ খালের জলে মোষের মত পড়ে থাকে এই সাদা কালো বিশ হাজার সৈনিক।

বলবার মতন তেমন কিছু থাকুক না থাকুক, গর্ব করতে পারি এই প্রচণ্ড গরমের। তবে এই গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ব্যবস্থা করাও হয়েছে অনেক। সিকি মাইল অন্তর তৈরী করা হয়েছে হিট-ষ্ট্রোক ষ্টেশন। চোখে, ঘাড়ে, পিঠে, রোদ লাগা নাকি ক্ষতিকর, তাই চোখে লাগাতে হয় ঠুলি, পিঠে আঁটতে হয় কাপড়ের প্যাড, ঘাড় ঢাকবার জন্যে টুপির ওপর লাগাচ্ছি প্রকাণ্ড একটা ঘেরাটোপ। অতএব এই গরমে এক পা চলতে হলেই সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে—গগল্‌স্‌, স্পাইন প্রটেক্‌টর আর সানসেড।

এগুলো এঁটে ঘাড় পিঠ না হয় রক্ষে হল, কিন্তু পা? বুটের তলার লোহাগুলো তেতে ওঠার কষ্ট কিছু কম নয়। গার্ড ডিউটিতে মোতায়েন হলে জুতো খুলবার উপায় নেই; তাও সময়টা বেশ—একটানা চব্বিশ ঘণ্টা।

আরবদের মাথার ওপর আঁটতে দেখছি ঘাড় ঢাকা একটা বড় রুমাল বা ঝাড়ন। মাথার ওপর খাপে খাপে বসিয়ে দিয়েছে চুলের একটা বিঁড়ে মতন দিয়ে। মনে হয় রোদের তাপ থেকে বাঁচবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। তাদের কালো আলখাল্লাটাও রোদের তাপের পক্ষে নাকি অনেক কাজের। ওটা কিন্তু সুতোর নয়, বলে ওরা—উটের চুলের।

আজ পর্যন্ত ভোজনের ব্যবস্থা একই রকম। নতুনত্ব মোটেই নেই। মটর বা মাসকলাইয়ের ডালের খিচুড়ির সংগে চালাচ্ছি রোজই পিঁয়াজের তরকারী। হ্যাঁ, সেরেফ পিঁয়াজ ছাড়া অন্য কোনও আনাজ আজও পাইনি। তাহোক, স্বচ্ছন্দে চালাচ্ছি ওটা এই একশো আটাশ ডিগ্রি গরমে। তবে রাতটা ভাল। একদিকে যেমন একটু ঠাণ্ডা, অপর দিকে চাপাটির সঙ্গে মাংসের ঝোল।

করাচি থাকতে সরকারি রসদে যেটুকু পেতাম না কেন, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে কোম্পানির কিচেন থেকে হত মেনুর রকম ফের। চলতো আরব-সাগরের ক্যাঁসা মাছ ভাজা, সঙ্গে থাকতো আলুপোস্ত। করাচি ত্যাগ করার পর ওসব নজরে পড়া তো দূরের কথা, মনের মধ্যে থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে ওগুলোর নাম। এরই মধ্যে অর্থাৎ এই মাকিনা ক্যাম্পে, মুখরোচক যদি কিছু জোটে

অন্যায় হবে না অলৌকিক বললে। তবে আজ পর্যন্ত খুবই সজাগ আছি অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে। অবশ্য জাহাজে যে মাংসগুলো খেয়েছিলাম সেগুলোর খবর তখন রাখিনি, শক্তিও ছিল না।

গাধা, ঘোড়া বা উটের মাংস ভিন্ন নাকি গতি নেই এ রকম কথা অনেক শুনেছিলাম এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসবার আগে। আজও তার একটাও রসদ হিসেবে পাইনি বা চোখেও দেখিনি। জানি না ভবিষ্যতে জুটবে কিনা।

মাত্র ক'দিনের রোদে আমরা আমচুর বনে গেলেও,—ভোজন, স্নান পরিশ্রম ইত্যাদি সব বিষয়ে ছাপিয়ে গেছে আমাদের ট্রান্সপোর্ট কোর। একদল মিউলকে সংগের সাথী ক'রে করাচি থেকে জাহাজে চড়েছিল আমাদের আগেই। শুনছি তারাও এসে হাজির হয়েছে আজ ক'দিন। ছাউনি পড়েছে নদীর ধারে—মাগিলের কাছে। আমাদের ছাউনি থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে।

এই দারুণ গরমে আমরা কিছুটা কাবু হলেও ওদের পরিশ্রম কিন্তু অনেক। প্রত্যেকের হেপাজতে আছে তিন তিনটে অশ্বতর। আমরা অস্থির নিজেকে নিয়ে; ওরা সামলাচ্ছে নিজেকে ছাড়াও অতগুলো পশুকে।

নিজের সাজসরঞ্জাম ঘষা-মাজা করেও তদারক করতে হয় মিউলগুলোর। ডলাই-মলাই, মল-ময়লা পরিষ্কার করা ছাড়াও সময় মত যোগাতে হয় দানা পানি। শুধু কি তাই, শিকল ছিঁড়ে দৌড় দিলে সংগে সংগে ধাওয়া করতে হয় তাদের পিছন পিছন। মোট কথা ঝঞ্ঝাট বইতে হয় ওদের অনেক।

নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের, মাগিল জাহাজ ঘাটে। সে এক মস্ত ফ্যাঁসাদ। নতুন পল্টন, তাই করাচিতে দিয়েছিল কতকগুলো শান্ত মিউল,—কিন্তু সইলো না। জাহাজ থেকে নামবার মুখে মাঝরাতে চুপি চুপি পালটে নিয়েছে মিউলগুলো, পাকা পল্টনের দল। বদলে রেখে গেছে বেয়াড়া—বদমেজাজী।

কিন্তু তাক লাগিয়ে দিয়েছে এই সগ্য নতুন মিউল কোরের সাথীরা। এক মাসেই শিখে গেছে ওরা মিউল বশ করার কায়দা, আয়ত্তে এনেছে ওদের মাত্র সাত দিনেই।

আবার কানাঘুষো; গুজব এবার, মাকিনা ছাড়ার পালা। যাবো

নাকি বাগদাদ শহরে। ব্যবস্থা হচ্ছে ষ্টীমারের। মিউল কোরের দলও নাকি যাবে, তবে ষ্টীমারে নয়। যাবে হাঁটা পথে, মার্চ ক'রে। সংগে থাকবে অশ্বতর। হাঁটতে হবে দিনের পর দিন, পাকাতে হবে যে যার নিজের চাপাটি। পথটুকুও কম নয়—তা পাকা সাড়ে পাঁচ শো মাইল।

এতদিন খুবই শক্ত ছিলাম অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে। কিন্তু এক নিমেষে ভেস্তে গেল সবই। দায়ী কিন্তু আমি নই—আমার অফিসার। হ্যাঁ সম্পূর্ণ দায়ী আমার এই হিতাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় অফিসার।

ঘটে গেল কাল রাত্রে—তাঁরই তাঁবুতে। দেখলাম খুবই যত্নের সঙ্গে খুললেন একটা টিনের কৌটো। বার করলেন ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা দুটো কাটলেট। হুকুম হল ভাজবার।

আমার এই অফিসারের তদারক করাও আমার একটা কাজ। সর্বদাই নজর রাখি তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্য।

অতএব চটপট ফ্রাইং প্যানে চাপিয়ে ভাজলাম দুটোকে খুবই মনের মতন করে। খাবার ইচ্ছে যথেষ্ট থাকলেও সামলে নিলাম। কিছুমাত্র ভাব প্রকাশ না করে ধরে দিলাম সবটাই। সংগে দিলাম একটু রাই, তার পাশেই পেঁয়াজ কুচি।

তিনিও হাসিমুখে নিলেন একটা, বাকিটা দিলেন আমায়।

নিজের মনেই ভাজাভুজির তারিফ করতে করতে স্পর্শ করলাম কাটলেটটা। করাচি ত্যাগ করার পর এসব যে ফিল্ডে জুটবে আশাও করিনি। মনের কোণে উঁকি দিতে লাগলো কত পুরোনো স্মৃতি। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফ্লোরার রেষ্টুরেণ্ট,—এক আনায় মাংসের কোপ্তা! দেখতে লাগলাম সদর বাজারের জমাদার সাহেবের হোটেল। মাত্র ছ'আনায় প্লেট ভরতি শিক-কাবাব! স্বপ্ন।

ভোরের বিউগিল বাজলো। ধড়মড়িয়ে কম্বল ত্যাগ করেছি রিভেলি বাজতে শুনে। হঠাৎ নজরে পড়লো কাটলেটের খালি টিন। দেখছি বড় বড় অক্ষরে লেখা তার গায়ে—ফ্রেস অক্স টাঙ।

আমার চোখ হয়ে গেল বড়। মুহূর্তের মধ্যে শরীর হয়ে এলো অবশ, করতে লাগলো মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম, জাহাজ দোলার মত বমি বমি ভাব।

চুপচাপ তুলে নিয়ে অফিসারকে দেখালাম টিনটা। বললাম, স্যার, কাল রাত্রে এই অখাদ্যটা......

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—কে বললে এটা অখাদ্য?

খালি কৌটোর লেখা দেখিয়ে আবার বলি—স্যার এটা যে সম্পূর্ণ কুখাদ্য—ষাঁড়ের জিব।—আপনি কি সেটা জানতেন না?

আবার সেই মৃদু হাসি। ধীরভাবে জ্ঞান দিলেন আমায়। জানালেন খাদ্য—অখাদ্য। শোনালেন উনিশশো পনেরো সালের সেই ইজিপ্টের যুদ্ধক্ষেত্রের তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী। বোঝালেন—যেটা খেলে দেহের ক্ষতি হয় সেটা অখাদ্য, যেটাতে ক্ষতি নেই—সেটা খাদ্য। আরও জ্ঞানলাভ করলাম, খাওয়াটা নির্ভর করে নাকি অভ্যাসের ওপর, এবং এই ফিল্ডে কাটাতে হলে এ ভিন্ন নাকি গতি নেই।

অতএব আমি যেটাকে আজ অখাদ্য বা কুখাদ্য মনে করছি সেটা সম্পূর্ণ খাদ্য বলে চালু হয়ে গেল আমার এই অফিসারের কৃপায়—এই মাকিনা ক্যাম্পেই। এখন সেগুলো যথেচ্ছা উদরস্থ করলেও ক্ষতি নেই জেনে নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষায় রইলাম—ঘোড়া, উট, গাধার।

আবার খটাখট হাতুড়ি ঠোকা, তাঁবু তোলা, বাঁধা-ছাঁদা। সবই শেষ করেছি একদিনে। মাকিনার পালা শেষ করে রওনা হয়েছি মার্গিল থেকে। হুকুম এসেছে বাগদাদ শহরে যাবার। উপস্থিত যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে। শহর থেকে মাত্র সাত মাইল তফাতে।

তেরোদিন কাটাতে হবে নাকি এই টাইগ্রীসে। পথটাও অনেক, নদী পথেও সাড়ে পাঁচশো মাইল। হাতে টাকা পয়সা মোটেই নেই—প্রায় কপর্দকহীন। মাইনের টাকার আয়ু তো মাত্র চার দিন। যে কটা টাকা পেয়েছিলাম ব্যয় করেছি মোবাইল-ক্যান্টিনের কৌটোয় ভরা আনারস খেয়ে। তবে মস্ত ভরসা ষ্টীমারেও আছে সরকারি লাংগারখানা। ব্যবস্থা আছে দিনের পর দিন খিচুড়ির। সবচেয়ে বড় সম্বল আমার অফিসার। তা প্রসাদ কি কিছু জুটবে না? কিন্তু—বেজায় তিনি টিনভক্ত। তাঁর কাছ থেকে খাদ্য অখাদ্যের জ্ঞানলাভ করলেও বরদাস্ত করতে পারিনি আজও। কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে।

দুপাশ দেখতে দেখতে চলেছি সেট্-এল্-আরবের। এসে গেল গুরমাতালি। বসরা থেকে মাত্র ন' মাইল। এক পাশ জুড়ে সরকারি চুণের ভাঁটি; অপর পাশে আঙুরের মাচা, খেজুর গাছে ভরা ছোট গ্রাম, মাঠে চরছে দুম্বার দল।

ষ্টীমারেও দিচ্ছি গার্ড-ডিউটী, খাটছি ফেটিগ্-ডিউটী। বসছে মজলিস,

দেখছি নতুন দেশ। লাগছে ভাল, আরও ভাল, বালাই নেই প্যারেডের, —আর নেই জাহাজ দোলার আতঙ্ক। জাহাজে চড়ে দেখেছিলাম কেবল জল আর জল। এখন দেখছি ধু-ধু করছে দু'পাশে ফাঁকা মরুভূমি, যতদুর চোখ যায়।

ছাড়িয়ে এলাম কুর্ণা। শহর বলা চলে না, বড় গ্রাম ছাড়া আর কিছুই না। তবে গাছপালা যথেষ্ট আছে। এখানেই মিলেছে টাইগ্রীসের সংগে ইউফ্রেটীস। ঐ-তো বাঁ দিকে ইউফ্রেটিস। আসছে ভূমধ্য সাগরের কাছ থেকে; সিরিয়ার ভেতর দিয়ে, কারবালা-ব্যাবিলনকে দুপাশে রেখে।

ত্যাগ করলাম সেট-এল-আরবকে—এই কুর্ণাতে। এখন চলেছি সাপের মত আঁকা-বাঁকা নদী টাইগ্রীসের ওপর দিয়ে। কেটে গেল পাঁচ দিন; এবার এসে হাজির 'আমারা' শহরে। কিনারায় নামবার হুকুম নেই; রেলিং ধরেই দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম আমারার শোভা। বিরাট বললে ভুল হবে, আসারের চেয়ে অনেক ছোট। তবে একই ধাঁচ। বাল্লাম, মাহেল্লায় (বড় নৌকো) ভরা নদীর ধার।

নদীই একমাত্র সম্বল। সেজন্যে শহর বা গ্রাম বেশীর ভাগই নদীর ওপর। শহর ছাড়ালেই আবার মরুভূমি-মরীচিকা। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে কালো কালো বেদুইনের ছাউনি। অনেকটা আমাদের চাঁদোয়া খাটানোর মত। রোদ আটকালেও জল সামলানো মুশকিল। ওদেরও আছে উট, গাধা, দুম্বা। দিনে করে চাষ আবাদ; রাতে চলে গান বাজনা।

নদীর একপাশ খুবই গভীর, অপর পাশ চ্যাটালো। মাছও আছে যথেষ্ট। ষ্টীমারের ঢেউ নদীর চ্যাটালো পাড়ের ওপর উঠে গিয়ে আবার নেমে আসছে সংগে সংগে। প্রতিবারেই দেখছি টাইগ্রীসের মাছ স্যামন আর হেরিং। ঢেউএর সংগে ওপরে উঠে গিয়ে থেকে যাচ্ছে ডাঙায়।

ওরকম বড় বড় মাছগুলোকে ডাঙায় লাফাতে দেখে রেলিংএর হাতল ধরে হা হুতাশ করা ভিন্ন গতি নেই,—করছিও তাই। অপেক্ষায় আছি যদি কোন আরব-বেদুইনের নজরে আসে, তাতেও কিছুটা স্বস্তি।

চমৎকার! মজা মন্দ না, ওখানে মাছ আছে মানুষ নেই, এখানে মানুষ আছে মাছ নেই। পাশ দিয়ে চলেছি ছোট একটা গ্রামের। মাত্র কয়েকটা খেজুর গাছ, গোটা কুড়ি কাঁচা বাড়ী, মসজিদ, গাধা উট আর খান কয়েক বাল্লাম নৌকো নিয়েই এই গ্রাম। এসে গেল আরব ছেলের

দল। দোড়োচ্ছে নদীর পাড় দিয়ে—ষ্টীমারের সংগে। শুধু পয়সার আশায়।

কাছে এসে বলে—হে সাহেব, বকসিস্, কুল্লে-ওয়াহেদ আনা। (মাত্র এক আনা)

দেখছি থেকে থেকে চার আঙুলে শব্দ করে—খটাস।

কেরামতি আরও অনেক। দেখাচ্ছে জলের খেলা। আনি-দু'আনি জলে ফেলা মাত্র ডুব দিয়ে কুড়িয়ে আনে চট করে, আনে নদীর তল থেকে।

এবার এসে হাজির দু'চার জন আরব। সাঁতার দিয়ে কাছে এসে চলতি ষ্টীমার ধরে বেচে গেল মাছ। নেবার মক্কেল অনেক থাকলেও বাগিয়েছি একটা—সুস্রুপিতে (আট আনায়)। এখন টাকার অভাব আর ততটা নেই। বেশ কিছু আছে—আমারই অফিসারের। হুকুম পেয়েছি উদর পুরণের জন্যে খুশিমত ব্যয় করতে। অতএব, আট আনা দিয়ে মাছটা কিনতে দ্বিধা করিনি একটুও।

মন যোগালাম লাংগারখানার প্রভুর, হুমকি পাড়লাম আমার অফিসারের। বুঝছি কিচেনে ঠাঁই পাওয়া শক্ত। শেষ পর্যন্ত নজরানা দিলাম কিছুটা মাছ, ব্যবস্থাও হয়ে গেল রন্ধনের।

খুবই তাজ্জব বানিয়ে বাহাদুরি নিলাম আমার অফিসারের কাছে। খুশি হয়ে ব্যক্ত করলেন—আমাকেও তিনি অবাক করে দেবেন নতুন কিছু খাইয়ে।—তবে কৌটোয় ভরা।

বিস্মিত না হলেও—হলাম চিন্তিত। বাইরে সৌজন্য প্রকাশ করলেও, ভেতর গেল শুকিয়ে। সত্যিই, পড়লাম মুশকিলে।

ভাবছি, নতুন খাবারটা না হলেই বা কি? অক্টাঙের পর এক এক ক'রে টিনে ভরা খানা নিত্য নতুনতো চলে গেল অনেক। সার্ডিন্-স্যামন্, হেরিংস ছাড়া, চলে গেল লব্‌স্টার-ক্র্যাব। ওগুলো সহজে বরদাস্ত করতে পারলেও যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেছিলাম সজারু-খরগোসের বেলায়। শুধু চালিয়েছি ক্ষিধের জ্বালায়। এখন ভাবছি আর কী হতে পারে।—"বুলি?" নিশ্চয় নয়। আগেই বুঝেছি মোটেই ভক্ত নন ওটার—নইলে চলতো ওটাও।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এটাও নিশ্চিত; যদি ভেকের ব্যবস্থা হয়, তবে এড়িয়ে যাবার জন্যে একমাত্র উপায়—এই টাইগ্রাসে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু ভাববার আছে,—বেজায় আণ্ডার কারেণ্ট।

এক এক ক'রে ছেড়ে এলাম—আলি-আশ-সরগি, ফিলাই-ফিল্লা, আলি-এল্-গরবি, সেক-সায়াদ, কুত-এল্-আমারা।

মাঝে মাঝে ষ্টীমার চলে না, নোঙর করে সন্ধ্যার আগে। ভিড়িয়ে দেয় নদীর ধারে, শুধু রাতটুকুর জন্যে।

হুকুম হয়েছে নেমে বেড়াবার। বেড়াচ্ছিও মরু-মাঠে। দেখছি যুদ্ধের তাণ্ডব লীলা, বীভৎস ব্যাপার।

মরুভূমির ওপর বালির বস্তা সাজিয়ে খাড়া করা হয়েছে—অবজ্ঞার ভেসন্ টাওয়ার। ছড়িয়ে আছে স্তূপাকার কার্টিজের খোল, কামানের গোলা, ভাঙা এরোপ্লেন্, সৈনিকের ছেঁড়া পোশাক, কাঁটাতারের বেড়া। আর ছড়িয়ে আছে প্রচুর কঙ্কাল। দেখছি একটি কঙ্কালের পায়ে এখনও রয়েছে এক পাটি বুট জুতো। কানে এল আবার বিউগিলের শব্দ। বাজাচ্ছে ফলিন। বিরক্ত হয়ে দাঁড়ালাম সার দিয়ে, নদীর চরে।

হাজির হলেন, কম্যাণ্ডিং অফিসার—কর্ণেল।

শুনলাম বক্তৃতা—খুব সাবধানে চলা-ফেরা করি যেন মাঠে-ঘাটে। উভয় পক্ষেরই পড়ে আছে তাজা বোমা, গোলা-গুলি। বুটের ঠোক্করে ফেটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তাই সাবধান, বহু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে পূর্বে এই একই কারণে।

রাতের ঠাণ্ডা কাটিয়ে আবার ভোর, আবার রোদ, আবার আগুনের হলকা হাওয়া।

ছাড়িয়ে এলাম আজিজীয়া। শহর বা গ্রামের অস্তিত্ব নেই। বাড়ী ঘর মসজীদ কিছুই নেই। এমন কি একটা খেজুর গাছও। ফাঁকা মাঠ, ভরে আছে শুধু সৈনিকের তাঁবুতে।

তবে হ্যাঁ—দেখবার আছে বৈকি। ঐ যে ডানদিকে, মাইল কুড়ি-পঁচিশ দূরের সেই লম্বা পাহাড়টা? ওটাইতো পারশীয়ান বর্ডার। সকলেই এখন ওটা দেখবার জন্যে ব্যস্ত।

বারোদিন কাটলো এই টাইগ্রীসের ওপর। কাল নাকি ষ্টীমার ভিড়বে বাগদাদের ঘাটে। নজরের বাইরে চলে গেল পারশীয়ান বর্ডার। আবার দেখছি সেই কাঁটাগাছের ফাঁকা মরুভূমি, পুব-পশ্চিমের দু'দিকেই। তারই মাঝে মাঝে রয়েছে বেদুইনের ছাউনি, উট দুম্বার দল, নদীর চরে ভুট্টার ক্ষেত, দু'চারটে ছোট বড় মাহেল্লা।

এসে গেল টেসিফোন। বসরা থেকে নদী পথে প্রায় পাঁচশো

মাইল—এই টেসিফোন। এটাও ফাঁকা মরুভূমি, বাড়ী ঘর মোটেই নেই, আছে কেবল গালভরা নাম। একদিন হয়তো ছিলো বড় শহর বাগ-বাগিচা, হাট-বাজার। পুরোনো স্মৃতি এখনও আছে, শুধু এখানে নয়—আছে মাইল দশেক পুবে এই মরুর বুকে,—কান্‌তারাতে।

দেখছি পুবদিকে মাত্র মাইল খানেক দুরে মরুভূমির ওপর এখনও দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর দুটো মাত্র খিলান। খুবই পুরোনো, ভাঙা। দেখে মনে হয় মাটির বাড়ী—হয়তো তাই।

শুনলাম ইতিহাস। সম্রাট আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এখানে করেছিলেন একটা বড় রকম ঘাটি। সব নির্মূল হয়ে গেছে—আছে শুধু ঐ খিলান দুটো।

টেসিফোন ছাড়িয়েছি কাল দুপুরে। রাত্রে ষ্টীমার না থেমে চলে এসেছে একটানা। ভোরের সংগে সংগেই দেখছি ডানদিকে অসংখ্য তাঁবু। এটাই নাকি হিনাইডি, মাকিনার মতনই বড় রকম ছাউনি।

হাঁটা পথে মাত্র চার মাইল হলেও নদীপথে বাগদাদ বারো মাইল। এখানে নদীটা বড় মজার। অদ্ভুত বাঁকা—সম্পূর্ণ চারকোণা।

শেষ বাঁকের মোড় ঘুরতেই এসে গেল বাগদাদ। মরুভূমির পর মরুভূমি পার হয়ে হঠাৎ এত বড় শহর। অদ্ভুত!!

দেখছি অসংখ্য বাড়ী, বড় বড় মসজিদ। ঠিক যেন কাশী; তফাত মাত্র নদীর ঘাট, মন্দির-মসজিদ।

একটু একটু ক'রে এগিয়ে চলেছি উত্তরে, শহরের শেষ প্রান্তে। দেখছি বাগদাদের শোভা বাড়িয়েছে রঙিন কাঁচ বসানো মসজিদের বিরাট গম্বুজগুলো, আর রাস্তায় খেলায় মত্ত ফুটফুটে শিশুর দল।

বৈশিষ্ট্য আছে—গুপ্‌ফার। অবাক করে দিয়েছে এই গোল নৌকোগুলো। ঠিক যেন হাঁড়ি। ঘুরপাক খেতে খেতে পারাপারি করছে লাট্টুর মত। কষ্ট যতই হোক—ডুববার ভয় নেই।

এখানেও আছে সেই বসরারই মত গদি তাকিয়া পাতা বাল্লাম নৌকো। তবে বসরার চেয়ে অনেক সৌখিন,—পরিচ্ছন্ন। হরেক রকম রঙের পোশাকে সাজগোজ ক'রে স্ত্রী পুরুষের দলকে হাওয়া খেতে দেখছি বাল্লাম নৌকোয় চড়ে।

করাচি থাকতে অনেক সুখ্যাতি শুনেছিলাম বসরার গোলাপের।

একটাও নজরে পড়েনি আজও আসার বা বসরা শহরে। এখানেও নদীর ধারে বাগান দেখলাম; কিন্তু দেখলাম না একটা কাঠ গোলাপও।

জিগ্যেস করলাম আমার মুরুব্বিকে, গোলাপের কথা—আচ্ছা যোগীনদা, তবে কি বাজে কথা—মিথ্যে ?"

সজোরে মাথায় চাঁটি মেরে বুঝিয়ে দিল আমায়—দূর বোকা, একেবারে হাঁদা তুই। দেখছিস না ডালিমের মত মেয়েদের রঙ,—ওরাইতো গোলাপ।

ষ্টীমার ভিড়লো, শহরের একেবারে উত্তরে নদীর পূর্বপারে, সিটাডেল্ গেটের কাছে। আবার মালপত্তর নামিয়ে সুরু হবে মার্চ, কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

সন্ধ্যা নেমে আসার সংগে সংগে দোকান-পাট হয়ে গেল বন্ধ, জনমানব শূন্য হল নদী-রাস্তা; শহর হল নিষ্প্রদীপ। দেখতে দেখতে ভরে গেল রাস্তা-ঘাট সৈনিকের পাহারায়। এখন যুদ্ধ হচ্ছে যে খুব কাছে—বেশী দূরে নয়;—মাত্র সাত মাইল।

পাঁচ

সাবাস বাগদাদ—সাবাস! তোমায় একটা স্যালিউট না ঠুকে থাকতে পারছি না। এতদিনে এইতো চাইছিলাম। ঝিমিয়ে পড়েছিলাম যেন মাকিনা ক্যাম্পে, এখানে এসে, এ ক'দিনেই চাঙ্গা!

যতই পরিশ্রম চাপুক না কেন, রাজী আছি। ট্রেঞ্চের একেবারে সামনে খাড়া হতেও কাতর নই; তার আগে,—একটু আনন্দ, একটু আয়েশ, একটু ভোগ বিলাস—ব্যস্ আর কিছু না।

এখানকার ছাউনিটা চমৎকার। শুধু কি ছাউনি? ভাল এখানকার নদীর ধার, বাজার, দোকানপাট, সেন্ট্রিপোষ্ট; আর ভাল এখানকার লোকজন।

আস্তানাটা শহরের মধ্যে না হলেও, কাছ ঘেঁসে। শহরের উত্তরে সিটাডেল্ গেট থেকে মাত্র এক মাইল আরও উত্তরে,—খেজুর বাগানের মধ্যে। কাছেই টাইগ্রাস্। আশপাশে অন্য পল্টন থাকলেও গ্রামও আছে। সিকি মাইল পশ্চিমে হাইল্যাণ্ডার পল্টন, পাশ ঘেঁসে-মাহারাট্টা।

লম্বা চওড়া শরীর, মাথায় ধুচুনির মত লম্বা কালো ফেজ্, পরনে উর্দি, পায়ে ছোট সাইজের গামবুট, কোমরে ছোরা গোঁজা কিছু রুশ সৈনিকও দেখছি ঐ সাহারাটা ছাউনির মধ্যে। শুনলাম ওরাই নাকি কসাক্! কসাক্ সৈনিকের কথা শুনেছিলাম ইস্কুলে, চাক্ষুষ দর্শন এই প্রথম।

বাগদাদ শহর বড় হলেও, বসরা বা আমারার মত একই টাইপ্। কোন কোন রাস্তার ওপর সেই একই ধরনের টিনের ছাউনি। যেটা পথ, সেটাই বাজার। লোক সংখ্যাও বেশী, তবে সবচেয়ে চোখে পড়ে বিভিন্ন দেশের লোক। আরব-ইহুদীতো আছেই; তা ছাড়া আফ্রিকান্, সিরিয়ান্, আর্মেনিয়ান্, ইরানী, কুর্দি, ইজিপ্সিয়ান্ ইত্যাদি আরও কত রকমের লোক দেখি বাজারে চলাফেরা করতে।

চল্তি ভাষা আরবী। ফরাসী ভাষারও চল্ আছে। এসব ভাষা ছাড়া এই যুদ্ধের মরসুমে গড়ে উঠেছে এক নতুন ভাষা। আরবী, ইরানী, ইংরেজী, হিন্দি মিলিয়ে সুন্দর এক খিচুড়ি ভাষা।

এই ভাষা আমাদের কাছে বেশ জুতসই হলেও—দোভাষী আছে। সরকারি দোভাষীদের জামার হাতার ওপর লেখা—ইণ্ট, অর্থাৎ ইণ্টারপ্রেটার।

এই সরকারি দোভাষী ছাড়া আর একরকম বেসরকারি ক্ষুদে দোভাষীদের দেখা যায়, বাজারে ঘোরাফেরা করতে। সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ক্রাণ বা দুশক্রাণের (দু'চার আনার) বিনিময়ে।

মাত্র তের-চোদ্দ বছর বয়েসের সুন্দর ফুটফুটে ছেলে কাছে এসে গুড ইভিনিং জানিয়ে জিগ্যেস্ করে—স্যার, ইউ ওয়াস্ত ইন্তারপ্রেতার?

ঠিক ওদেরই ভঙ্গীতে বলি—ইউ নো ইংলিশ্?

চটপট জবাব দেয়—'মি দোস্ত নো ইংলিশ—মি নো ফ্রেঞ্চ, ইউ নো ফ্রেঞ্চ স্যার? নো-বলার সংগে সংগে জানিয়ে দেয়—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। চলে গিয়ে চেষ্টা করে অন্যত্র। সুন্দর লাগে ওদের। যেমনি চটপটে, তেমনই কেতাদুরস্ত। আত্মমর্যাদা জ্ঞান যথেষ্ট আছে। নেয় না বক্শিশ্, ফিরিয়ে দেয়। যাবার সময় হাসিমুখে আবার শোনায়—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

এসে পর্যন্ত দেখছি যুদ্ধের কর্মব্যস্ততা। দিনরাত চলাফেরা করছে পল্টন—কামানের গাড়ী। খুব ভোরে যেতে দেখি অসংখ্য মোটর ভ্যান্।

চলে রসদ আর গোলাগুলি নিয়ে। পৌঁছে দেয় ফায়ারিং লাইনে। ফেরবার পথে বোঝাই ক'রে নিয়ে আসে অকেজো সৈনিক।

রোজই শুনছি কামানের শব্দ। দিনে-রাতে আসে এরোপ্লেন, উড়তে থাকে মাথার ওপর, চেষ্টা করে বোমা ফেলতে। অনিলদাও সেদিন সুযোগ বুঝে ছেড়ে দিল দশ রাউণ্ড গুলি, এরোপ্লেন লক্ষ্য ক'রে।

যেখানে যুদ্ধ হয়ে যায়, বা যুদ্ধের আঁচ লাগে, সৈন্যদল চলাফেরা করে, তখনই দেখা যায় সেখানে গজিয়ে ওঠে কতকগুলো ছোটখাটো ব্যবসা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু হয়তো রেখে যাবে ক্ষুদ্র ব্যবসাটার মধ্যে যুদ্ধের স্মৃতিটুকু।

জুতো বুরুশ—যাকে বলে বুট পালিশ, তারই মধ্যে একটা। বসরা বা বাগদাদ ছাড়াও ছোটখাটো শহরে দেখতে পাওয়া যায় এই বুটপালিশের দলকে। গড়ে উঠেছে যুদ্ধের সংগে সংগেই।

হরেক রকম দলকে দেখি বাজারে বসে থাকতে, পালিশের বাক্স সংগে নিয়ে। দু'আনা পালিশওয়ালা ছোট ছেলের দল। এদের প্রথা একটু বেয়াড়া। এরা আগে থেকেই কালি মাখিয়ে রাখে তাদের বুরুশে। সৈনিকদের দেখা মাত্রই দৌড়ে তাদের কাছে এসেই বেমালুম সুরু ক'রে দেয় জুতোয় বুরুশ চালাতে। একপাটি পালিশ হবার পর দাবি করে—দুশক্রাণ। ঐ দু'আনা দিলে তবে সুরু করে আর এক পাটি বুরুশ। দুশক্রাণ দিতে বিরূপ হলে থেকে যায় ঐ ভাবেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে দিতে হয় পালিশের দাম।

এটা নেহাত ছ্যাঁচড়ামি প্রথা হলেও, বনেদী কায়দাও আছে। ক্রাণ বা দুশরুপি (সিকি বা আধুলি) পালিশওয়ালার মধ্যে আছে যেন আভিজাত্যের গর্ব, ওদের মর্যাদাও কিছু বেশী।

হাতা গোটানো সার্টের ওপর আঁটা দামী নেক্‌টাই, পরনে ধোপদোরস্ত ট্রাওজার, পায়ে জুতোমোজা, হাতে গ্লাভস্‌, মাথায় লাল ফেজ্‌।

কার্পেট ঢাকা সুন্দর পালিশ করা একফুট উঁচু কাঠের ডেস্কের ওপর সাজানো নানা রকম পালিশ আর বুরুশ। ডেস্কের একপাশে আছে একটা কলিংবেল। একপাটি পালিশ কিংবা ঘষাঘষির পালা শেষ হলে জানিয়ে দেয় তারা ঘণ্টা বাজিয়ে—কিড়িং-কিড়িং শব্দে।

এদের মক্কেল সাধারণ সৈনিকের দল। মেজাজের ওপর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে করিয়ে নেয় তারা চক্‌চকের ওপর চক্‌চকে। প্রায়

করে না ক্রাণ বা তুশরুপি। সৈনিকদের অর্থের প্রয়োজন যথেষ্ট থাকলেও দরদ নেই একটুও। আট আনা দিয়ে বুটপালিশ করাতে বা ছাউনিতে নাপিত থাকা সত্ত্বেও বাজারের হেয়ার-কাটারে বসে ছু'টাকা চার আনা দিয়ে হাজামত করতে, কিংবা পাঁচ-দশ টাকা খরচ ক'রে রেষ্টুরেণ্টে খানা খেতে তারা কাতর হয় না একটুও। আজ-ই, তার কাছে বড়। চিন্তাও করে না ভবিষ্যৎ, দরকারও মনে করে না কাল কি হবে।

বাজারে ছু'আনা বুট পালিশের দলের উপদ্রব ছাড়া আরও এক উৎপাত —ওয়াহেদ আনা (এক আনা) বক্‌শিশের দলের। সৈনিকদের দেখা মাত্র তারা ছুটে আসে—ঘিরে ধরে।

বলে—রফিগ, ওয়াহেদ আনা বকশিশ। (বন্ধু, এক আনা বকশিশ্)।

যতক্ষণ না এক আনা দেওয়া হচ্ছে, চলবে তারা তার সংগে। হাসি মস্করার সংগে টানবে জামার খুঁট ধরে, হাত চালাবে পকেটের মধ্যে। এরকম উপদ্রবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এক আনা দান করলে সে যাত্রা আর নিষ্কৃতি নেই। ঘিরে ধরবে আরও রফিগের দল।

এদের পরনে সেমিজ ধরনের স্কার্ট, কোমরে সোনার বেল্ট, গলায় লীরার (গিনির) মালা। পায়ে ফুল-মোজার ওপর ইঞ্চি তিনেক হিল্ উঁচু জুতো। কারও বা পায়ে সোনার বালা। চোখে সুর্মা, গালে বা থুতনিতে উল্‌কির তিল।

ভোজনের বিষয় উদার হলেও, অপর কতকগুলো বিষয়ে আমার অফিসার খুবই কড়া বা গোঁড়া। গুরুগম্ভীর প্রকৃতি না হলেও রাশভারী তো বটেই। পছন্দ করেন না মাদক দ্রব্য সেবন। নিজেও করেন না ধূমপান। বরদাস্ত করেন না অশ্লীল ভাষা বা নারী সংক্রান্ত ব্যাপার।

বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছি, যাচ্ছি হিনাইডি-ক্যাম্প। প্রায় চার মাইল পথ। একমাত্র বাল্লাম নৌকো ছাড়া অন্য কোনও যান-বাহন না থাকাতে, অগত্যা চরণ যুগলের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই গট্-মট্ শব্দে চলেছি আমার অফিসারের পেছন পেছন।

চলবার পথে নিয়েছেন তিনি পকেট ভরতি টফি। কখনও নিজের মুখে ভরছেন, আবার মর্জি মতন মাঝে মাঝে পিছনে হাত বাড়িয়ে আমাকেও যোগাচ্ছেন।

বাজারে আসামাত্র ঘিরে ধরলো ওয়াহেদ আনা বকশিশের দল। বিব্রত করে তোলে আমার অফিসারকে। হাসি ঠাট্টার সংগে তাঁর হাত

ধরে টানে,—কাছ ঘেঁষে চলে। আবদার ক'রে বলে—রফিগ্ বকশিশ, কুল্লে (মাত্র) ওয়াহেদ আনা। (এক আনা)

অফিসারের ওপর চড়াও হওয়াতে, রক্ষে পেলাম। চলতে চলতে দেখছি রগড়, লাগছে ভাল।

ঝাপ্‌টা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে ধমক ছাড়েন, বলেন —রো (যাও)। থতমত খেয়ে তাঁকে ছেড়ে, এসে পড়ে আমার ওপর।

এইরে দফা সেরেছে! মুশকিলে পড়লেও—আসে সহানুভূতি।

কৃত্রিম রাগে বলি—ইম্‌সি, (সরে পড়)—মাকু-ফুলুশ্। (টাকা পয়সা নেই)

তারা গ্রাহ্য করে না আমার ইম্‌সি বলা। একইভাবে চলে আমার সংগ নিয়ে,—আমিও চলি আমার অফিসারের সংগে,—আর আমার অফিসারের নিশ্চিন্ত মনে চলছে,—চলার সংগে টফি খাওয়া।

ঠিক আগেরই মত, আবার পিছনে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমায়—টফি।

টফি নিয়ে পকেটে রাখতেই ভুল বুঝলো রফিগ্‌ণীর দল। বুঝলো তারা,—অফিসার বুঝি পয়সা দিলেন, ওদেরকে দেবার জন্যে।

কিছুতেই ছাড়বে না আমার হাত। চলে পকেট নিয়ে টানা-মানি, বুঝছি নাছোড়বান্দা।

বিরক্ত হয়ে দিলাম,—ওয়াহেদ আনা।

খিচুড়ি ভাষায় ধমক ছাড়ি। বলি—আভি-রো। (এখন যাও)।

কিন্তু উল্টো হল, পেয়ে বসলো। বেড়ে গেল উৎসাহ, সুরু হল আরও উৎপাত।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে দেখিয়ে দি আমার অফিসারকে।

বলি, চোখ টিপে, চুপি-চাপি—ভেরি বিগ্-বিম্বাসি। (খুব বড় অফিসার)।

হেসে বলে—হাদা-আফিন্দি? (এই ভদ্রলোক)।

উৎসাহের সংগে বলি—ইঃ। (হ্যাঁ)।

আবার সুরু হল আমার অফিসারের পালা। চট্ ক'রে আমায় ছেড়ে ঘিরে ধরে তাঁকে। হাত ধরে টানে, কাছ ঘেঁসে আবদারের সুরে বলে—রফিগ্-বকশিশ,—ওয়াহেদ ফুলুশ। (একটাকা) আন্তে জেন্, (তুমি ভাল) আন্তে বিগ্-বিম্বাসি (তুমি বড় অফিসার)।

পিছন থেকে দেখি মজা। উপভোগ করি খুবই, হাল্কা হয় চলার কষ্ট।

পরক্ষণেই দেখি, আমার অফিসারের রণমূর্তি। ধমক ছাড়েন, ছড়ি তোলেন। দেখান এম্-পি-র ভয়—হাজতের।

তারা কানেও নেয় না তাঁর হুম্‌কি। আরও বাড়িয়ে দেয় আবদার—উৎপাত।

বুঝছি এবার অফিসার নিতান্ত ক্রুদ্ধ।

মারমুখো হয়ে হুম্‌কি ছাড়েন—রো। (যাও)

আর বলেন—আঃ, তিনশো-তেতাল্লিশ, এ-কী হচ্ছে? এদের তাড়াবার......

দেখছি, ব্যাপার গুরুতর, সুবিধের নয়।

চলতে চলতে উপায় খুঁজি, চেষ্টা করি রুষ্ট অফিসারকে তুষ্ট করতে।

সামনেই দেখি মিলিটারী পুলিশ। এবার আমি ছাতি ফুলিয়ে তাল ঠুকি,—হুই কঠোর। ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে যাই এম্-পির দিকে।

তারাও বোঝে আমার ভাবগতিক। বিকৃত মুখে ভেংচি কাটে—গাল পাড়ে। বলে,—আস্তে মুজেন,—(তুমি খারাপ) থুঃ-বলে থুতু ফেলে। সংগে সংগে সরে পড়ে নিমেষের মধ্যে।

বিশ্বাসি (অফিসার) এবার হাঁপ ছাড়েন, ঘাম মোছেন। নিশ্চিন্ত মনে আবার সুরু করেন টফি খাওয়া, টফি দেওয়া।

আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত নই! এটাতো পার হলাম মাত্র একটা ঘাঁটি, এখনও বাকী আরও দুটো। তবে, কিছুটা সময় দম নি।

আমার অফিসার এ'সব উপদ্রব বরদাস্ত করতে না পারলেও, এ'রকম উৎপাত সহ্য করবার মত আছে কিন্তু অনেক সৈনিক। তারা চলে এদের সঙ্গ নিয়ে, করে মস্করা, চড়ে বাল্লাম। দেয় ওয়াহেদ আনা, দুশক্রাণ, ক্রাণ এমন কি ফুলুশ। (টাকা)।

মাত্র সাত মাইল তফাতে ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে যারা গুলি চালাচ্ছে, আমরা তাদের পিছনের দল। যখনই হুকুম হবে তখনই দল ভারী করবো তাদের। মাংসের দোকানে পাঁঠাকে ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো ক'রে যেমন বিক্রি করে, আর তারই পাশে জ্যান্ত পাঁঠার দল কেমন নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খায়। আমাদের এই পরবর্তী দলের সেই অবস্থা বলা চলে। নিত্যই কত মরছে, জখম হচ্ছে, পাগল হয়ে ফিরে

আসছে। সবই দেখছি চোখের সামনে, কিন্তু মনকে স্পর্শ করে না একটুও। চিন্তাও করি না মৃত্যুর।

যে সব পল্টন পিছনে আছে তাদেরও করতে হয় প্রচুর কাজ, এবং সেগুলোও যুদ্ধের সংগে পরস্পর জড়িত। মৃত্যুর আশঙ্কা ট্রেঞ্চের মধ্যে যেমন আছে বাইরেও কিছু কম নেই। সব দলকেই সজাগ থেকে কষ্ট করতে হয় যথেষ্ট।

গুপ্তচর যাতে ধ্বংসাত্মক কাজ না করতে পারে সেজন্যে রাতের পর রাত জেগে, রসদ, গোলাগুলি যুদ্ধবন্দি ইত্যাদি পাহারা দেওয়াই আমাদের প্রধান কাজ।

রসদচুরি, বন্দিপালানো, বা পেট্রল, গোলাগুলি ইত্যাদির ডাম্পে স্পাইএর দ্বারা আগুন লাগিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। আমাদের ওপর যতদিন এসবের দায়িত্ব ভার পড়েছে, সেগুলো আজও পর্যন্ত খুবই সুনামের সংগে পালন করে চলেছি। এসব ডিউটির ওপর আমরা নাকি অতিমাত্রায় কড়া, এমনও রটেছে কিছু কিছু। তবে এটা ঠিক, কাউকেও আমরা রেহাই দিনা সন্দেহ হলে।

এইতো মাত্র দশ দিনও হয়নি। শহরের উত্তরে সদর রাস্তার উপর সাপ্লাই ডাম্পে পাহারা দিচ্ছিলো আমাদেরই সৈনিক।

জনশূন্য রাস্তা, চারিদিক নিস্তব্ধ, শহর অন্ধকার। রাস্তার প্রতি মোড়ে, অলি-গলিতে পাহারায় ভরে আছে ইংরেজ আর ভারতীয় সৈনিকের দল। দেশীয় পুলিশেরও অধিকার নেই রাত্রে রাস্তায় টহল দেবার। চারিদিকে কেবল শব্দ হচ্ছে সৈনিকের চ্যালেঞ্জ—হল্টের সংগে বন্দুক ওঠা নামা, আর বুটের।

তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে শত্রুর যাতে মৃত্যু না হয়ে জখম হয়ে বেঁচে থাকে সেজন্যে রাত্রে এসব ডিউটিতে ভারী বন্দুকের বদলে ব্যবহার করি হেন্‌রি-মার্টিনের ছররা গুলির সাবেকি বন্দুক। তিনবার হল্ট বলার পর কোনও জবাব না পেলে সেন্‌ট্রির ক্ষমতা আছে তার ওপর গুলি চালাবার।

রাত প্রায় বারোটা। একটা মোটর গাড়ী দেখা মাত্র আমাদের সেন্‌ট্রি চ্যালেঞ্জ করলো—হল্ট। কোন জবাব নেই।

আবার চ্যালেঞ্জ—হল্ট।

নিস্তব্ধ, এবারেও কোন সাড়াশব্দ নেই।

পর পর তিনবার চ্যালেঞ্জ ক'রে কোনও জবাব না পাওয়াতে নিয়ম মাফিক গুলি ছাড়লো, তাদেরই ওপর।

মানুষ জখম না হলেও, ক্ষতি হল গাড়ীখানার।

গাড়ীতে ছিলেন আর্মি হেড্-কোয়ার্টারের কয়েকজন ষ্টাফ-অফিসার। দাম্ভিক অফিসারের দল ভারতীয় সৈনিকদের চ্যালেঞ্জ শুনে অবজ্ঞা করেছিলেন ইচ্ছে করেই। কল্পনাও করেননি এরকম গুলি বর্ষণ হবে।

গুলি ছোড়ায় বিরক্ত হয়ে কাছে আসেন—তলব করেন কৈফিয়ত। দেখান হুমকি—কোর্টমার্শাল।

সিদ্ধান্তর বয়স অল্প হলেও, শিক্ষিত—মার্জিত। মৃদুভাষী হলেও, সাহসী।

জবাব দেয় তেজীয়ান্ হয়ে। আওড়ায় কিংস্-রেগুলেসন্, পাতা—চ্যাপ্টার।

শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিবৃতি পেশ করলেন আমাদের কর্ণেলের কাছে।

কিন্তু ফল হল শুভ। শাস্তির বদলে খুশি হয়ে সেন্ট্রির খুবই প্রশংসা করে উত্তর দিয়েছিলেন আমাদের কর্ণেল,—জেনারেল হেড-কোয়ার্টারে। এইটেই আমাদের কর্ণেলের বিশেষত্ব।

এরকম গুলি ছোড়ার ব্যাপার শুনে প্রতিবেশী মহারাট্টা পল্টন ছাড়াও আশপাশের পল্টনের সাথীরা বলে, আমরা নাকি—লিখ্নে পড়নে ওয়ালা এলেম্দার পল্টন। কম্যাণ্ড করি নাকি বিলিতি ঢঙে। চলাফেরার কায়দাও নাকি আলাদা। এসব নানান কারণে ভারতীয় সৈনিকরা তো সমীহ করেই, এমনকি ইংরেজ পল্টনের গোরার দলও অবাক হয়ে যায় আমাদের চাল চলন দেখে।

মেলামেশা ক'রে মোটেই বুঝতে পারে না আমরা কোথাকার লোক। অর্থাৎ আমাদের দেশ কোথায়।

পোশাক তাদেরই মতন। চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গীও। বাচ-বিচার নেই খাওয়া-দাওয়ার। ইংরেজী অনেকেই বলে, আবার হিন্দি বলে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। কারও সংগে কারও মিল নেই, দেহের রঙে বা গড়নে।

এসব কারণে অনেক সময় খুবই চিন্তার ব্যাপার হয়ে ওঠে গোরা সৈনিকদের। উৎসুক হয় আমাদের মর্যাদা (র‍্যাঙ্ক) কি জানবার জন্যে।

মনে করে আমাদের র‍্যাঙ্ক বুঝি ওদেরই সমান—বৃটিশ র‍্যাঙ্ক। কেও বা আবার বাঁকা চোখে দেখে ভারতীয় র‍্যাঙ্ক হলে।

এসব র‍্যাঙ্ক জানবার আগ্রহের জন্যে মাঝে-মাঝে দু'একটা মজার ঘটনা যে ঘটে না, তা নয়।

হাবিলদার সাঁইত্রিশ বা চক্কোত্তীদা,—বাড়ী মজঃফরপুর। বয়স প্রায় চল্লিশ। রংটা ঈষৎ ময়লা হলেও—মাজাঘষা। মাথার চুলগুলো সুন্দর ভাবে বুরুশ করা, পিছন দিকে ওল্টানো। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। গোঁফের দু'পাশে সর্বদাই কি যেন লাগিয়ে সরু চুঁচোলো করা। জামা-জুতো পরিষ্কার, নজর কেবল প্যাণ্টের ভাঁজে।

মোটের ওপর নিখুঁত-চটক্‌দার, আমুদে, মজলিসি হাবিলদার। এসব দিক দিয়ে কোন রকম ত্রুটি না থাকলেও, গলদ শুধু—ইংরেজী ভাষার ওপর দখল কম। দু'এক কথা মাঝে-মাঝে বুঝতে পারলেও বলতে পারেন না এক বর্ণও। তবে খুবই চটক্‌দার তাই প্রত্যেকটি কাটিয়ে নিয়ে যান সুন্দর নিপুণ ভাবে। সেরেফ-ইয়েস্‌-নোর ওপর দিয়ে।

নদীর ধারে হাসপাতালের বন্দী ওয়ার্ডে ডিউটিতে থাকার সময় লক্ষ্য করেছিল ইংরেজ পল্টনের একজন সার্জেণ্ট্। তারও মনে প্রশ্ন জেগেছিলো, —আমরা কোন দেশের লোক। র‍্যাঙ্কই বা কি!—ভারতীয় না বৃটিশ?

সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক দেরী। সবে মাত্র শেষ হয়েছে আমাদের পাহারা দেওয়ার পালা! নতুন গার্ডের দল এসে বুঝে নিয়েছে তাদের কাজের ভার। খালাস ক'রে দিয়েছে আমাদের। হাবিলদার সাঁইত্রিশও তাঁর দলটিকে নিয়ে নিজেদের ছাউনিতে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত। গার্ডরাও অপেক্ষায় আছে তাঁর হুকুমের—কুইক্ মার্চের।

এমন সময় ঐ ইংরেজ সার্জেণ্ট দুর থেকে হাবিলদার সাহেবকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো—আই সে, সার্জেণ্ট—সার্জেণ্ট?

ইংরেজী না জানার জন্যে কিছুমাত্র দমে না গিয়ে, ঠিক তারই তালে তাল রেখে জবাব দিলেন—ই-য়েস্।

বুঝছি হাবিলদার সাহেবের অবস্থা। বল্লাম—ও চক্কোত্তীদা এবার যে নির্ঘাত ঘায়েল!

পিছন থেকে গম্ভীর ভাবে যোগীনদাও বলে—নাও, এবার তুমি ঠেলা সামলাও।

হাবিলদার সাহেব মুচকি হেসে জবাব দেন—কী! ভাবছো বুঝি

বে-কায়দায় পড়েছি ? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও না,—দেখিয়ে দিচ্ছি সাহেবকে ; এই নয়া পণ্টনের কায়দাটা।

ততক্ষণে সার্জেণ্টও এসে হাজির একেবারে কাছে, হাবিলদার সাহেবের সামনে। জিগ্যেস্ করে তার গিঁট দেওয়া জট পাকানো ইংরেজীতে—আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কেউ লম্বা কেউ বা খাটো, কেউ সাদা, আবার কেউ বা কালো, কারও দাড়ি আছে কারও বা নেই—কাঁধে লেখা কিন্তু বেঙ্গলীস্। ইংরেজীওতো বল পরিষ্কার, তাই ভাবছি তোমরা কোথা থেকে এসেছ। তোমাদের র‍্যাঙ্কই বা কি ? —বৃটিশ র‍্যাঙ্ক না টেরিটোরিয়াল্ ?

চক্কোত্তীদা প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও, সামলে নিলেন চট ক'রে। অত কথার মধ্যে অন্য কথাগুলো না বুঝলেও, কানে গেল পণ্টনের চলতি কথা—বৃটিশ র‍্যাঙ্ক না টেরিটোরিয়াল্।

ব্যস, সংগে সংগে সবই পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর ; ধরে ফেললেন সাহেবের কথা।

আর কথা না বাড়িয়ে ঝট শব্দে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলেন গাড়োয়াল পণ্টনের ভঙ্গিতে।—যাকে বলে—সোল্ডার-আর্ম।

হাবিলদার সাহেবের ভাব-গতিক দেখে সাহেব যেন কি বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাকে আর কিছুমাত্র বলবার সুযোগ না দিয়ে তাঁর ডান পা'টা বার দুয়েক মাটিতে ঠুকে দমক দিয়ে বলে উঠলেন—ড্যাম্ বৃটিশ র‍্যাঙ্ক, ড্যাম্ টেরিটোরিয়াল্ র‍্যাঙ্ক—বেঙ্গলী র‍্যাঙ্ক ; গার্ড,—কুইক্ মার্চ, লেফ্ট্-রাইট্ লেফ্ট্-রাইট্......

মার্চের হুকুম দেওয়া মাত্র আর এদিক ওদিক না তাকিয়ে দাদা গম্ভীর ভাবে তাঁর দলটিকে নিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলতে সুরু করলেন ছাউনির দিকে, সার্জেণ্টের অন্য প্রশ্নের অপেক্ষা আর না করে। থেকে থেকে বিলিতি ঢঙে চিৎকার ছাড়েন, বলেন প্যারেডের বাঁধা বুলি—আই সে, হেড-আপ্, চেষ্ট্-আপ্, লুক্-ফরোয়ার্ড,—বলেন, আরও কতো রকম প্যারেডের কথা।

সার্জেণ্টতো হতভম্ব। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, যতদূর আমাদের দেখা গেল। হয়তো ভাবছে, তাইতো, এরা কারা ? র‍্যাঙ্কই বা কি ?

ছয়

আমাদের কর্ণেল যে একজন পাকা মিলিটারী অফিসার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন রোখা, তেমন কড়া, তেমনই কাজের।

বেঁটে, ছোটখাটো দেহ। মাথার পাতলা চুলগুলো ছোট্ট টাকের ওপর দিয়ে পিছন দিকে ওল্টানো। শুনেছি, আগে কোন এক যুদ্ধে তরোয়ালের খোঁচা লাগা কাটা গাল সযত্নে ঢাকা তাঁর ঐ ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি দিয়ে।

চোখে রিম্‌লেশ চশমা, বাঁধা কালো ফিতেয়। সর্বদাই হাতে রাখেন রুপো বাঁধানো মোটা একটা লাঠি।

সৌখিন, তেজীভাব। কথা বলেন জোরে,—গাঁক্ গাঁক্ ক'রে। অসম্ভব ব্যক্তিত্ব। একগুঁয়ে হলেও যথেষ্ট গুণ আছে। সব চেয়ে বড় গুণ—ছোট বড় সকলকেই দেখেন সমান চোখে। তাঁর কাছে ফরক নেই সাদা-কালোয়। বিচার করেন দোষ গুণের,—রঙের নয়। পছন্দ করেন তেজী ভাবের সৈনিক,—স্থান নেই মিন্‌মিনের। সামান্য ঢিলেমি দেখলেই ধমক ছাড়েন। চিৎকার ক'রে বলেন—ওয়েল্ ওয়েল্ ওয়েল্—ডোণ্ট্ ফরগেট্ ইউ আর এ বয়,—নট্ এ গের্ল (গার্ল)। এরকম বাজখাঁই গলার জন্যে তাঁর বন্ধু মহলের দেওয়া নাম নাকি—বুমার।

তাঁর সুনজরে পড়েছে ডাকাবুকো অনিলদা। নিয়োগ করেছেনও তাকে পল্টনের পুলিশ নায়কের কাজে।

খুশি হয়ে তারিফ করলেন আজ আমাদের পোষ্টাল নায়েকের,—ডাকঘরের গোরা কর্পোর‍্যাল্ ঠ্যাঙানোর ব্যাপারে।

পল্টনের চিঠি নেবার জন্যে বেস্ পোষ্টঅফিসে অবজ্ঞা করেছিল ইংরেজ পল্টনের গোরা কর্পোর‍্যাল্, ভারতীয়দের সংগে একত্রে সার দিয়ে দাঁড়াতে। দেখিয়েছিল মেজাজ, গুটিয়েছিল আস্তিন, লড়তে এসেছিল বক্সিং।

অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিল তাকে, আমাদেরই পোষ্টাল নায়েক,—সুধীর চৌধুরী।

বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম খেয়ে বিচার চেয়েছিল গোরা কর্পোর‍্যাল্

আমাদের কর্ণেলের দরবারে। কিন্তু ফিরে গেল বেচারি শুক্‌নো মুখে—কর্ণেলের ধমক খেয়ে।

সৈনিকের ছাতা মাথায় দেওয়া দেখে, ভুল ক'রে প্যারেড গ্রাউণ্ডেই ডেকে এনেছিলেন সেদিন, এক ইহুদি ইন্‌টারপ্রেটারকে। ছাড়ান দিয়েছিলেন শুধু বেসামরিক দেখে।

ছাতা মাথায় দেওয়া যে সৈনিকের অপরাধ, জানলাম সেদিন কর্ণেলের উগ্রমূর্তি দেখে।

বিভিন্ন অফিসারের (ইংরেজ) রকমারি প্রকৃতি। প্রভুদের মনের সংগে খাপ খাইয়ে চলা শক্ত হলেও ত্রুটী করি না মনোরঞ্জনের। আসল লাভের জন্য নয়। শুধু শাস্তিটাকে এড়িয়ে গিয়ে রোলসীট্‌খানাকে (চরিত্র সম্বন্ধীয় কাগজ) সাদা রাখা।

কৃপণ অফিসারের মন যোগাতে হলে মাইনের টাকা গ্রহণ না ক'রে রাখতে হয় জমিয়ে। করতে হয় ফ্যামিলি এ্যালট্‌মেণ্ট, বন্ধ করতে হয় বাজার যাওয়া, বর্জন করতে হয় ক্যান্‌টীন্‌।

সর্বদাই নীট-ক্লীন্‌ (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) উপদেশ দেওয়া, চুলকানিতে ভরা অফিসারকে খুশি করবার জন্যে হরদম ঝকঝকে রাখতে হয় বুটজোড়া বা চামড়ার সাজ সরঞ্জাম।

কিট্‌-ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ ম্যানিয়াগ্রস্ত মেজরের মন পেতে হলে সাজ পোশাকগুলো দেখাবার জন্যে, নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে রেখে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বেশ কয়েক ঘণ্টা। আসেন তিনি মর্জি মতন। তাতেও কি নিস্তার আছে? সাজানোর ত্রুটী হলে দিয়ে দেন দণ্ড।

পাইওরিয়াভরা অফিসারকে যখন তখন হাঁ করে দেখাতে হবে দাঁত সাফা আছে কি না। সামান্য বে-সাফ্‌ দেখলেই হুকুম—পাইওরিয়া প্যারেড।

সেও গেরো কম না। প্রতিদিন হাসপাতালে হাজির হয়ে চলবে দাঁত মাজার পালা;—তা একটানা এক মাস।

উৎপাত আরও আছে। সতেরো বছর বয়েসের সৈনিক হপ্তাতে তিনদিন হাজামত করেও মন পায় না,—দাড়ি-ম্যানিয়ার। এসেই গালে হাত ঘসে বলেন—হোয়াই নট্‌ সেভড্‌? সামান্য করকরে ঠেকলেই, ভোগান্তি নিশ্চিত।

তাল রাখতে হয় বিবিধ ভক্তের। টুপির চিন্‌ষ্ট্র্যাপ্‌ আঁটা থেকে সুরু

ক'রে, সর্ট-সার্টের বোতাম এবং বুটের ফিতে আটকানো লক্ষ্য করা ভক্ত। এ ছাড়া আছেন খেলা ভক্ত, রুট মার্চ ভক্ত, তাঁবু খাটানো ভক্ত, ঘোড়া ভক্ত, আর আছেন প্যারেড ভক্ত।

সব দেবতার তাল রাখতে পারলেও, সব সময় চিন্তা আমার, আমাদের কোম্পানির ঐ পাগলা ক্যাপটেন। অতএব, ঐ আরাধ্য দেবতাদের মধ্যে এখন তিনিই আমার সব চেয়ে বড় দেবতা।

পল্টনে যতগুলো কায়দা কানুন আছে, আমার মনে হয় সব চেয়ে সেরা কায়দা সেলাম ঠোকা। অনেক কিছুর থেকে রেহাই পাওয়া যায়, ঠিক তালের ওপর ওটা ব্যবহার করলে। অন্যথায় কয়েদ হওয়াও অসম্ভব নয়।

প্যারেড বা অন্য বিষয়গুলো ঠিক ঠাক আয়ত্ত করতে না পারলেও, সরকার বাহাদুরের কৃপায় এটা যে ভালরকম শিখেছি তা আমি গর্ব করতে পারি যথেষ্ট। এরই মধ্যে পরীক্ষা হয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। উতরেও গেছি সাফল্যের সংগে, সেরেফ্ এই স্যালিউটের জোরে।

দাঁড়ানো অবস্থায় অফিসারদের দেখা মাত্র পা দুটো জুড়তে হবে খট্ করে, সেই সংগে হাত উঠে যাবে টুপির কাছে।

আবার চলার অবস্থাতেও বাদ নেই। চলতে হবে স্যালিউট্ ঠুকে অফিসারদের দিকে তাকিয়ে। সবই চলবে কায়দার ওপর—চটক্‌দার ভাবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, খালি মাথায় স্যালিউট ঠোকা চলে না—না, একেবারে না।

যথেষ্ট অসুবিধা ঠেকতো নতুন বেলায়। নড়ে যেত মাথা—শরীরও। এখন আর মুশকিলের কিছু নেই, বেশ সড়-গড় হয়ে গেছে এই মিলিটারী স্যালিউট্।

এখন দেবতাদের দর্শন ঘটলেই ঠিক স্প্রাং-এর মত হাত উঠে গিয়ে স্যালিউট্ ঠোকে আমার সাড়ে-অসাড়ে। মোটের ওপর, আমাকে এ বিষয় আর বেশী নজর রাখতে হয় না। অর্থাৎ পায়ের কাজ যেমন চলা, তেমনই আমাদের হাতের কাজ, অফিসার দেখলেই স্যালিউট ঠোকা।

এটা যে শুধু সাধারণ সৈনিকের কর্তব্য তা নয়। যে যার উঁচুওয়ালা অফিসারকে স্যালিউট ঠুকতে বাধ্য ; নইলে বরাতে অনেক কিছু।

আমার ক্যাপটেন সাহেবের প্রকৃতি যে কিরকম, তা আজও ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও, জেনেছি তাঁর ভাবটা কিছুটা বেয়াড়া।

বয়েস সঠিক না জানলেও—পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। মোটা দেহ চুলকানিতে ভরা। হাতে রাখেন একটা ছোট্ট চামর, কখনও বা মাছি তাড়াবার ফ্লাই-কিলার। সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন, দেহের মাছি তাড়াতে।

নিজে অপরিষ্কার হলেও, অস্থির ক'রে তোলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার তদারকে। সর্বদাই নজর করেন বুটজোড়ার সংগে চামড়ার সাজসরঞ্জাম গুলো ঝক্‌ঝকে আছে কিনা। অন্য গলদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও অসম্ভব হয় এ গুলোর বেলায়।

কখন যে কি ভাবে থাকেন বোঝা কঠিন। তবে মনটা সাদা। অশ্লীল ভাষা ততটা ব্যবহার না করলেও, ভাল-মন্দ সব কথাতেই ব্যবহার করেন ব্লাডি-ক্যাট্ কথাটি। কাজেকাজেই এ সব নানান বিষয় জ্ঞানলাভ ক'রে যতদুর সম্ভব এড়িয়ে চলি এই দেবতার সংস্পর্শ থেকে। দুরে সরে থাকি সর্বদাই।

কিন্তু এতো সাবধানে থেকেও তাঁকে এড়িয়ে চলতে পারিনি। এরই মধ্যে তাঁর নজরে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে দু'দুবার। আরও কতোবার যে তাঁর কবলে পড়বো তা আমার ঐ ক্যাপটেনই জানেন। তবে—সুখের, আনন্দের ও স্বস্তির কথা,—তিনি খুবই স্যালিউট ভক্ত। যে টুকু টিঁকে যাচ্ছি শুধু এই চটকদার স্যালিউটের জোরে।

দাঁড়িয়ে আছি ভারতীয় অফিসারদের তাঁবুর ধারে। নিজের মনেই মেহনত করছি দাঁতের ভেতর আটকে থাকা মাংসটিকে উদ্ধার করতে।

হঠাৎ ক্যাপটেন সাহেব এসে হাজির আমার কাছে। অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে জিগ্যেস্ করলেন—হোয়াই আর ইউ লাফিং এ্যাট্ মি—ব্লাডি-ক্যাট?

এইরে মেরেছে! বিষধর সাপের সামনে পড়লে যে কি অবস্থা হয় তা যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন। এভাবে পাগলা সাহেবের সামনে পড়ে আমার যে কী হাল তা আমিই বুঝছি হাড়ে হাড়ে। সত্যিই অবস্থা আমার খুবই কাহিল।

আপনা হতেই বুটজোড়া একত্র হল খট্ ক'রে। চড়াক ক'রে হাত

উঠে গেল টুপিতে। ত্রস্ত হয়ে জবাব দিলাম—নো স্যার,—এ্যাম্ নট্ লাফিং।

জবাব শুনে লাল মুখ আরও হল লাল, চোখ হল তাঁর ভাঁটার মত। ফ্লাই-ট্র্যাপ্‌টা আমার মুখের কাছে নাড়া দিয়ে বলেন—ব্লাডি-ক্যাট্‌ ষ্টিল্ ইউ আর লাফিং।

বুঝলাম আমার অন্তিম অবস্থা। এবার নিশ্চয় খতম হল বুঝি, আমার রোলসীট্‌। বলির আগে পাঁঠাকে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে পিছনের ঠ্যাং দুটো ধরে টানলে তার যে অবস্থা হয়, আমারও ঠিক তাই। এবার খাঁড়াখানা গর্দানের ওপর বসিয়ে দিলেই হল।

ভাবছি এ আবার কি বিপদ এলো। কল্পনাও করতে পারি না আমার এরকম অকাল মৃত্যুর। বুঝছি নিরুপায়। তবু, আবার স্যালিউট্‌ ঠুকে করলাম শেষ চেষ্টা।

চোখ কান বুঁজে মরিয়া হয়ে বললাম—ইয়েস্ স্যার, আই এ্যাম্ লাফিং।

এবার ক্যাপটেন হলেন খুবই খুশি, মুখের ভাবও গেল বদলে। বুঝলাম ঠিকই দেগেছি, মোটেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি আমার—একেবারে বুল। হাতের চামরটা নিজের মুখের কাছে নাড়েন আর বলেন—দ্যাট্‌স্ রাইট—ব্লাডি-ক্যাট্‌; আই লাইক্—দোস্ হু কন্‌ফেস্।

ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো; ভাবছি, কৃপাময় সরে গেলে বাঁচি। এবার আমার নাকের ডগায় তাঁর চামরটা নেড়ে ভাল ক'রে সমঝে দিলেন। বল্‌লেন—ইউ ব্লাডি-ক্যাট—মাষ্ট নট লাফ ইন ফিউচার।

মেনে নিলাম সংগে সংগে। শপথ করলাম স্যালিউট ঠুকে। জানালাম হ্যাঁ স্যার, এবার থেকে মেনে চলবো আপনার কথা,—জীবনে আর হাসবো না।

খুশি মনে সাহেব চলে গেলেন আরও বার কয়েক ব্লাডি-ক্যাট আউড়ে। আমিও এ যাত্রা রক্ষে পেলাম দম দেওয়া কলের পুতুলের মত কারণে-অকারণে ডজন দেড়েক স্যালিউট ঠুকে।

সৈনিকরা অফিসার-দেবতাদের ভয় করে, এড়িয়ে চলে, এটা যেমন খাঁটি সত্যি,—তেমনই ভূতের ভয়ও করে এমনও আছে। তাদের মধ্যেও সংস্কার আছে বৈকি। এমন অনেক জোয়ান আছে, যারা জীবিতের ভয় না

করলেও, করে মৃতের। প্রাণের মায়া মোটেই করে না, কিন্তু ভূতের ভয় করে। ফায়ারিং লাইনে গিয়ে পড়লে হয়তো তারা অনেক কিছু দুঃসাহসিক কাজ করতে পেছপাও হবে না, কিন্তু ভূতের কবলে যাতে না পড়ে তার জন্যে তারা সজাগ যথেষ্ট। এসব ঝঞ্ঝাট থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তারা ব্যবহার করেও অনেক কিছু রক্ষা কবচ। শুধু ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে নয়—করে, সাদা-কালো সব পল্টনেই।

ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে যেমন রাখে, মাদুলি, তাবিজ, নীলা, পলা, তেমনই গোরা সৈনিকদেরও দেখি বুকের ওপর ঝুলিয়ে রাখে ছোট্ট ক্রশ। তাছাড়া সংগে রাখে আরও হরেক রকম শুভ চিহ্ন। রাখে মুরগীর বাঁকা হাড়, ঘোড়ার নাল (হর্স-সু), সবুজ চোখো কালো বেড়ালের ছবি, খেঁক্‌শেয়ালের ল্যাজ (ফক্সেস্ ব্রাস্), বাঘের নখ,—তাবিজও রাখে।

যোগীনদাতো অমন বেয়াড়া লোক,—সেও ভূত মানে। গোরস্থানের ভূতের কথাটা তার কাছেই তো শুনেছিলাম। পাত্তা দিইনি নেশাখোর বলে। শুধু জানিয়ে দিয়েছিলাম—আমাকে যা বলেছ যোগীনদা,—ভাল চাওতো আর কারও কাছে ওসব গল্প করো না। শান্ত ছেলের মত সেও আর ওসব নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি।

ঐ যে উত্তর-পুবে ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ, ওরই একপাশে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে আমাদের কবরখানা। খুব সুন্দর ব্যবস্থা, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই মোটেই। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চটপট বেড়েও উঠছে ওর আয়তন। প্রত্যেক কবরের ঢিপির ওপর বসানো আছে একটা কাঠের ক্রশ। লেখা তাতে নাম, নম্বর, রেজিমেণ্ট। তবে, ওখানেও প্রভেদ আছে।

কবরখানাটা ধর্ম ও বর্ণ নিয়ে ভাগ করা চার ভাগে। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ছাড়াও, গোরাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক।

দাহ ক'রবার রেওয়াজ নেই। সম্ভবও নয়। সকলেরই রয়েছে কাঠের ওপর কড়া নজর। শুনেছি প্রচুর রসদ থাকা সত্বেও একমাত্র জ্বালানী কাঠের অভাবে অভুক্ত থাকতে হয়েছে নাকি অনেক পল্টনকেই। এরকম নাকি মাঝে মাঝে ঘটে।

বাগদাদ শহরের সিটাডেল গেট আর আমাদের ছাউনির মাঝপথে আছে একটা বেসামরিক কবরখানা। স্থানীয় লোকদের হলেও খুবই পুরোনো। যেমনই জংলা তেমনই নির্জন।

পল্টনের যা কিছু গুজব রটে সেগুলোর কিছুটা আমদানি হয় ছাউনির পায়খানা থেকে। চায়ের দোকানের গুজবের মত নাম ডাক আছে এই— ল্যাট্রিন রিউমারের।

নতুন গুজব শুনছি। দু'চারজন সাথী নাকি ভূতের দর্শন লাভ করেছে এই বাগদাদ শহরে। ঠিক সন্ধ্যার মুখে আবছা ভাবে দেখেছে ঐ রাস্তার ধারের বেসামরিক কবরখানার মধ্যে। দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেছে—সম্পূর্ণ সত্যি। ভূত-প্রেত এড়িয়ে যাবার জন্যে ওসব সাথীরা রাতবেরাতে ঐ গোরস্থানের কাছে এলেই হুঁশিয়ার হয়ে একটু জোরে হাঁটে।

সবে মাত্র সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ফিরছি বাগদাদ শহর থেকে, আমি আর পুলিশ নায়েক অনিলদা। কলকাতার একজন নামজাদা স্পোর্টস্‌ম্যান, এই অনিলদা। ভাল বক্‌সার। ঘুষির জোর আছে যেমন, সাহসও তেমনই।

আমি বয়সে ছোট, অভিজ্ঞতাও কম, তাই বাজারে যেতে হলে সঙ্গ নিয়ে থাকি অনিলদার। বিশেষ ক'রে যখন ঘোরাফেরা করি সেই ওয়াহেদ-আনা দলের মধ্যে দিয়ে। গোরস্থানের কাছে আসামাত্রই মনে পড়লো ভূতের কথা। বললাম, অনিলদাকে। শোনামাত্রই বলে বসলো— চল্‌তো ভেতরে।

শুনেই বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। ভেতরে যাবার নাম করবে,— তাতো ভাবিনি। ভয়েতো আড়ষ্ট হয়ে গেছি। তাইতো এ আবার কি ঝঞ্ঝাট বাধালো! কি কুক্ষণেই এসেছিলাম অনিলদার সংগে। সত্যি কি সে ভেতরে যাবে? না—না, বোধহয় ঠাট্টা করছে। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে আরও কত কথা।

ভূত বিশ্বাস না করলেও—ভয় করি। চাক্ষুষ না দেখলেও, শুনেছি এ সম্বন্ধে অনেক কিছু, তাঁবুতে সাথীদের কাছে, বা বাড়ীতে। তার ওপর এখানকার খবরটা একেবারে টাটকা। পল্টনের অনেক বিশ্বাসী সাথীও নাকি দেখেছে, মাত্র দু'দিন আগে এই কবরখানায়।

বল্‌লাম—দরকার নেই অনিলদা ভেতরে গিয়ে, বরং আর একদিন যাবোখন্। আজ থাক কেমন?

কিছুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—না না, আজই যাবো, তুইতো দেখছি বেজায় ভীতু।

অনিলদার ঝোঁক চাপলে উপায় নেই এড়াবার।—বাধ্য হয়ে চলি তার সংগে কবরখানার ভেতর।

একে নির্জন, তার ওপর সন্ধ্যা উতরে গিয়ে ভরে গেছে অন্ধকারে। দেখছি চারিদিকে কেবল কাঁটাগাছ, বাইরে ভেতরে শুধু কবর, আর তারই মধ্যে লুকোচুরি খেলছে, বেশ কিছু বড়গোছের ইঁদুর।

একটু একটু ক'রে ঠোক্করের পর ঠোক্কর খেতে খেতে সদর রাস্তা থেকে এগিয়ে এসেছি অনেকটা পথ। কতদূর যাবো জানি না, বুঝিও না তার মর্জি।

চাপা গলায় বলি—আর কেন অনিলদা, এইতো, অনেকটা পথ এলাম, এবার ফিরি চল, ভূত-টুত নেই—সব বাজে, হ্যাঁ কী বল?

সে জবাব দেয় না আমার কথার। কেবল চলে, এদিক ওদিক দেখে। হঠাৎ চম্‌কে উঠি,—ওটা কী! যেন নড়ছে, তাই না?

আমারই নজরে আসে। দেখছি ঝাপসা। দেখছি কবরগুলোর ওপাশে সত্যি যেন তুটো মাথা! একটু একটু ক'রে স্পষ্ট হয়ে উঠছে মাথানাড়া—চলাফেরা।

জ্বলছে তাদের চোখগুলো, শুনছি খিল্ খিল্ হাসি।

ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন হারিয়ে ফেলেছি বাক্‌শক্তি। যেটুকু শক্তি এখনও আছে, শুধু অনিলদার সংগে আছি বলেই।

বল্‌তে গেলাম মাথাতুটোর কথা,—পারলাম না। আড়ষ্ট হয়ে এল জিব, আটকে গেল কথা।

ভয়ে ভয়ে খুবই সাবধানে ইশারায় দেখিয়ে দি অনিলদাকে। এবার তারও নজরে আসে। অবাক হয়ে গেলাম তার সাহস দেখে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মাথা তুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে বলে উঠলো—তুই এখানে দাঁড়া, আমি কাছে গিয়ে দেখে আসি!

ওরে বাবা,—বলে কী! কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র গুর্, গুর্ ক'রে উঠে বুকের ভেতরটা। সংগে সংগে জোর ক'রে চেপে ধরি তার কোমরের বেল্ট্।

বেশ বুঝছি, আমার কাছে এখন সামনে পেছনে সমান। ওর সংগে এগিয়ে যাওয়া তবু নিরাপদ, এখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব।

চুপচাপ এগিয়ে চলেছি অনিলদার সংগে, যাচ্ছি নাকি মাথা দুটোর দিকে।

তাই তো, কে যেন নড়ে উঠলো ?

এইতো, বেশী দূরে নয়—আমার পাশেই। মনে হচ্ছে যেন খুবই কাছে।

চম্‌কে উঠে মুখ ফেরাই।

এ-কী ? এ যে এক নারী মূর্তি। ঘাগ্‌রা পরা, হিল তোলা জুতো, দু'পাশে দুই বিনুনি, চোখে সুর্মা।

হুটোপাটি ক'রে কাছে আসে। হেসে বলে—মাহারাব্বা রফিগ্, তালু—ওগধ্ হেনা, (স্বাগত বন্ধু, এসো—এখানে বসো)

প্রথমে কিছুটা ভড়কে গেলেও সামলে গেলাম পোশাক দেখে। চট করে মনে এলো—আরে, এ যে আরবী বুলি, চেনা গলা !

নিমেষের মধ্যে এক এক ক'রে কাছে এসে ঘিরে ধরলো আমায়। যে দিকে তাকাই—সকলেই মেয়ে।

এবার চিনে ফেললাম বাজারের সেই ওয়াহেদ-আনা দলের কানা মেয়েটিকে।

বা-রে,—তবে এরাই কি তারা ? ভাবছি কেবল—তাইতো, এরা এখানে কেন ?

এতক্ষণে টাল্ কাটলো, শক্তি পেলাম, সাহস ফিরলো।

জিগ্যেস করি ভাঙা ভাঙা ওদেরই ভাষায়—সিত্ সেউই হেনা ? (এখানে কী করছ ?)

আমার কথার জবাব না দিয়ে, হেসে বলে—রফিগ্ ফুলুশ আকু ? (বন্ধু টাকা পয়সা আছে)

গম্ভীর চালে বলি—লেশ্ ? (কেন ?)

আমার এই কেন বলা শুনে সকলে এক সংগে বলে উঠলো—লেশ্ ? (কেন ?)

আস্তে নেই মালুম—লেশ্ ? (তোমরা জান না—কেন ?)

এদেরই মধ্যে একজন ডান হাতের দুটো আঙুল বাঁ তেলোতে ঠোকে আর বলে—রফিগ তামাম্ হামারা,—তুম্বন মাকু, খুবুশ মাকু, ফুলুশ মাকু, বেভি মাকু, সব কুছ মাকু (বন্ধু আমাদের সকলেরই অন্ন, রুটি, অর্থ, আস্তানা কিছুই নেই)

কথাগুলো শেষ হওয়ার সংগে সংগেই আবার সেই খিল্ খিল্ হাসি।

হঠাৎ এক রফিগ আমার একেবারে কাছে আসে, হাতটা ধরে আবদারের সুরে বলে,—রফিগ্ আস্তে বহুত জেন্। (বন্ধু তুমি খুব ভাল) অনিলদাকেও দেখিয়ে বলে—হাদা আস্কার জেন্। (এই সৈনিকও ভাল)

অপর মেয়েরাও এক সংগে বলে উঠলো—আউর, তামাম্ আস্কার জেন্। (আর, সব সৈনিকরাই ভাল)

এতক্ষণ অনিলদা চুপ ক'রে সব শুনছিলো। এবার মুখ খুললো—না, দেখছি এরা বড্ডো বাড়াবাড়ি করছে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলে—যাক্, এবার ভূত দেখলিতো ?

বললাম, তা তো দেখলাম।

তবে আমার বেল্টটা এখনও ধরে আছিস কেন ? এবার ছেড়ে দে।

কথাগুলো বলার পরই নিজের মনেই বলে গেল—তাইতো, এম্-পির নজর থেকে এরা একেবারে বাইরে !—খুবই অদ্ভুত তো !!

ভূতের ভয় কেটে গেলেও, মুহূর্তের মধ্যে দখল করলো মিলিটারী পুলিশের চিন্তা।

আমাকে আনমনা দেখে অনিলদা বলে উঠলো—কি ভাবছিস ?

কই না, কিছুতো ভাবিনি।

এবার বেশ কড়া সুরে ধমক দিয়ে বলে—হ্যাঁ, ভাবছিস্, খুলে বল্, তবে কি ওদের কথা ? খবরদার এখানে আর আসবি না।

এবার খুলে বললাম, ভাবছি এম-পিদের কথা, ওরা যদি এসে পড়ে ?

অনিলদার চোখে মুখে দেখা দিলো বিরক্তির ভাব। গম্ভীর ভাবে বলে গেল অনেক কথা—অত ভয় করলে বাজারে আর বেরোবিনা। পল্টনে এসেছিস কেন অত যদি ভয় থাকে ? তুই এমন কী অন্যায় কাজ করেছিস যে ভয়ে মরছিস ? ভাখ, তুই এটা জেনে রাখবি—ভয় যত করবি, ভয়ও ঘিরে ধরবে ততটা। অপরাধ না করলেও বানিয়ে দেবে অপরাধী। তাই বলছি, যখন সৈনিক হয়েছিস তখন সব বিষয়েই চলতে হবে সৈনিকেরই মত। সর্বদাই মনে রাখতে হবে পল্টনের কড়া আইন, নিয়ম-শৃঙ্খলা। ব্যস্, নিজের চরিত্রকে ঠিক রেখে এটুকু মানতে পারলেই তো—ঝানু সেপাই।

একটু থেমেই আবার সুরু করে—আচ্ছা, এম-পির ভয়ে যে মরছিস, কই এখানে আউট-অফ-বাউণ্ডস্ লেখা আছে কী? তোকেতো আগেও বলেছি, মিলিটারী নিয়ম কানুন যতই কড়া হোক না কেন, আইনের গণ্ডিটুকুর মধ্যে থাকলে ভয় কিসের রে? আচ্ছা, তোর কি মনে পড়ে না সেই করাচিতে, আমাদের গদাধরের কথা? সেই যে যখন জি ও সির হুকুমে সমস্ত সৈনিকদের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছিলো শহরের গাড়ী চড়া? তখন গদাধর কেমন উটে চড়ে এসে হাজির হল অমন জাঁকালো বায়স্কোপের সামনে, একেবারে সেই বান্দার রোডের ওপর। গদাধরকে উটের ওপর দেখেই এম্-পি ভায়া তো চ্যালেঞ্জ করলো, বল্লে—এই উটে চড়েছ কেন? খবরদার ভবিষ্যতে আর চড়বে না।

তোর মনে আছে? সেও কেমন জবাব দিয়েছিল তার মুখের ওপর—তোমার অর্ডারে লেখা আছে গাড়ীর কথা, কিন্তু উটে চড়া মানা এমন কিছু লেখা আছে কী? কই, তখন এম-পির মুখ দিয়ে আর কোন কথা ফুটেছিল কি?

অনিলদার সঙ্গ নিলে বাজারে চলা ফেরার পথ সহজ সরল হলেও, ঘোরালো হয়েও ওঠে অনেক সময়। নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার যেমন সে ভক্ত, তেমনই হঠাৎ ভেঙ্গে দিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, অন্যায় কিছু ঘটতে দেখলে। গম্ভীর হয়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে ডুয়েল লড়তে অনেকবারই দেখেছি তাকে, গোরা ভায়াদের সংগে। আমার পক্ষে সে সময় একমাত্র মিলিটারী পুলিশের আক্রমণ লক্ষ্য করা ছাড়া সম্ভব হয়নি আর কিছু করা।

দু'চারটে ঘুসি সহ্য করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারলেও এম-পি দেবতারা আমাকে যে হাজতে নিয়ে যাচ্ছে, এটা কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

মিলিটারী পুলিশ আতঙ্ক আমার বরাবরই। এতদিন অনিলদার সাকরেদি করে কিছুটা ফ্রি অবশ্য যে হইনি, তা নয়। কিছুটা হয়েছি। তবু, ওদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি আমার সব সময়। তা অন্যায় কিছু করি আর না করি। অনিলদা বলে আমার নাকি ওটা ম্যানিয়া।

কিন্তু এত লক্ষ্য করেও ওদের নজর থেকে কি এড়িয়ে যেতে পেরেছি? দু-চার বার ওদের কবলে পড়ে বে-ইজ্জতের হাত থেকে যে মুক্ত হতে

পেরেছি, তার জন্যে আমার তৎপরতার প্রশংসা না ক'রে, এম-পি প্রভুদের যে কৃপা, সেটা আমি অস্বীকার করব না।

এসব কারণে সব সময় রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে যখন ঘোরাফেরা করি তখন আর কিছু খেয়াল করি আর না করি, চরম টার্গেট জ্ঞান করি,—সর্ব প্রথমেই আউট অফ্ বাউণ্ডস্, তার পরেই মিলিটারী পুলিশ।

সোজা কথায়, সমস্ত বেড়ানোটা অনেক সময় পণ্ড হয়ে যায় ও দুটোর ওপর নজর রেখে চলতে।

শহরের মধ্যে নাচগানের বাড়ী, (আরব থিয়েটার) হামাম্ (স্নানঘর) কিছু সংখ্যক রাস্তা আমাদের জন্যে আউট অফ্ বাউণ্ডস্ তো আছেই, তাছাড়া অনেক দোকানও আছে যা আমাদের নিষিদ্ধ এলাকা,—ওর মধ্যে পা বাড়ানো সম্পূর্ণ মানা—গণ্ডির বাইরে।

মাত্র কয়েকটা লাইসেন্স করা রেষ্টুরেণ্ট, চুল কাটার দোকান আমাদের জন্য মুক্ত। বাজারে এলেই এই লাইসেন্স করা দোকান ছাড়া গতিও নেই। সৈনিকদের ভিড়ও জমে যথেষ্ট, দামও দিতে হয় প্রচুর। কিন্তু উপায়ই বা কী, ওগুলোই তো আমাদের ওয়েসিস্।

বাজারে লাইসেন্সবিহীন দোকান থেকে কিছু কিনে খাওয়া মানা হলেও, কি জানি কেন ঐ নিষিদ্ধ খাবারগুলোর ওপর লোভটা আমায় চেপে ধরে দোকানগুলোর সামনে গেলেই। কিন্তু প্রতিবারেই পিছিয়ে পড়ি এম-পির ভয়ে।

সেদিন আর রুখতে পারলাম না আমার মনটাকে। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে ঐরকম একটা খাবারের দোকানের কাছে আসামাত্র টপ ক'রে এদিক ওদিক চোখটা ঘুরিয়ে নিয়েই কিনে ফেললাম ওদের পিঠে জাতীয় খাবার—হালু। (মিষ্টি)

কিন্তু আশ্চর্য। ভানুমতীর খেল্ দেখিয়ে দিলো এক এম-পি।

ঠিক চিলে ছোঁ মারার মত সংগে সংগে এসে হাজির হল আমার সামনে।

হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলাম হালু সমেত। কিছুতেই ঠাওর করতে পারলাম না প্রভু কোথায় এতক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রেখে লক্ষ্য করছিলো আমাকে। আমারও লক্ষ্যতো কিছু কম ছিলো না। তবে কি বিভূতি টিভূতি কিছু জানে?

যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেল নিরাকার থেকে সাকারে আসবার ক্ষমতা আয়ত্ত করছে কিনা।

হাতে এসে গেছে দোকানের খাবার—হালু। উপায় নেই আর কিছু করবার। কি আর করি, সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আত্মসমর্পণ করলাম সত্ত যুদ্ধবন্দীর মত।

দেখলাম কিন্তু আর এক অদ্ভুত কাণ্ড; এ আবার কি ঘটে গেলো! হালু ফেরত দিয়ে ফিরিয়ে পেলাম পয়সা। অবশ্য এম-পির কৃপায়। বুঝলাম না এত করুণার কারণ। যাই হোক, এম-পি প্রভুটি যে নিতান্ত ভাল তাতে সন্দেহ রইলো না একটুও।

শুধু বুঝিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল। স্মরণ করিয়ে দিলো—আমাদের প্রাণের আশঙ্কা নাকি সব সময়। চারিদিকে কাজ চলছে শত্রুপক্ষের। যে কোনও মুহূর্তে খাবারের সংগে বিষ মিশিয়ে দেওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। খুব সাবধান।

শান্ত সুবোধ বালকের মত কথাগুলো শুনে ওর খপ্পর থেকে তো উদ্ধার হলাম। সবই শুনলাম। বুঝলাম, ওদের খাবার উদরস্থ করলে মৃত্যু ভয়ও আছে। কিন্তু ওদের উপদেশবাণী ভালছেলের মত ভবিষ্যতে মানতে যে পারিনি, একথাও খুবই সত্যি। অনেক সময় প্রাণের মায়ার চেয়ে জঠরের জ্বালার জন্যে আরব-ইহুদির ঘর থেকে খাবার যোগাড় করেও খেয়েছি। এক আধবার নয়—বহুবার! এবং এখনও যে কিনছি না তা নয়।

এখন হালু (মিষ্টি) খুবুশ (আরবী রুটী) সবই আসছে হাতে। যোগাড় হচ্ছে যোগীনদারই পলিসিতে। তবে কেমন করে আসছে, সেটা জানি আমি, জানে যোগীনদা আর জানে মাত্র দু'চারজন এ পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

ধরা অবশ্য আর পড়িনি। তবে এবিষয় দেমাক আর করি না; —যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে সেই হালু।

সাত

হাফু কিনে ধরা পড়বার পর একমাত্র আমার অফিসারের দু'চারটা ফরমাশ ছাড়া বাজারমুখো আর বড় একটা ঘুরিনি,— তা প্রায় মাসখানেক।

আজ মাস মাইনে আঠারো টাকা হাতে পেয়েই ঠিক করেছি বাজার যাবো। খুবই হুঁসিয়ার হব খরচ-পত্রের ওপর। মোটেই বেহিসেবি হব না এবার।

গতবারে পুরোমাইনেটা খরচ হয়ে গেল মাত্র তিন দিনেই। কেনাকাটির ফর্দ আগে থেকে লিখে নিয়ে গিয়েও কেমন যেন আমায় উপেক্ষা ক'রে হয়ে গেল ওলট-পালট। খরচের মোড় ঘুরে গেল আপনা হতেই। কপ্‌পুরের মত নিঃশেষ হয়ে গিয়ে তাক লাগিয়ে দিলো আমায়। জানতেও পারলাম না তার পুর্বমুহূর্তে, অন্তত মিনিট কয়েক আগেও।

আজ এ-বিষয় গোড়া থেকেই খুবই শক্ত হয়ে ঠিক করেছি, কিছুই কিনবো না এবার। নেহাত যদি কিছু কিনি তবে মাথায় মাখবার জন্যে ভেসেলিন, এক প্যাকেট টয়লেট পেপার, আর আমার পাগলা ক্যাপটেনকে খুশি রাখবার জন্যে এক কৌটো সবচেয়ে সেরা—জুতোর কালি। তবে, পিতল পালিশটাও কেনা দরকার। এর ওপর, বড়জোর, যোসেফের রেষ্টুরেণ্টে তেলাতা ক্রাণে (বারো আনা) দু'খানা চপ, সেই সংগে এক ক্রাণে (চার আনা) এক কাপ কফি—ব্যস্।

দুর্গাবাবু, যাকে বলি দুগোদা, এসে হাজির আমার কাছে। আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও সে নাকি নিতান্ত শিশু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে রাস্তা বাজার টহল দিতে। এখনও আঁৎকে ওঠে ঐ ওয়াহেদ আনা বক্‌শিশের দলের কাছে গেলেই।

আমি নাকি শহুরে, কোলকাতার ছেলে, তার ওপর অনিলদার সাকরেদ। সেজন্যে আমাকেই মুরুব্বী ঠাওরে তৈরি হয়ে এসেছে—বাজার যাবার আশায়।

বাজার ঘুরবার কায়দা কানুন সব ঠিক, ত্রুটি নেই একটুও। জামা জুতো পরিষ্কার। জেল্লা দিচ্ছে পালিশ করা বেল্ট বোতামের পিতল।

আঠারো ইঞ্চি লম্বা বেয়নেটখানা ঝুলছে পিছনে। ঠিকঠাক ঝুলিয়েছি ওটাকে কোমরের বেল্টের বাঁ দিকে। খুবই যত্নের সংগে বাজার বেড়ানোর ছাড়পত্র খানা চোরা বেল্টের পাউচে গুঁজে রওনা হলাম বুক ফুলিয়ে, দুগোদার সংগে পা মিলিয়ে—সিটাডেল গেটের দিকে।

ঘণ্টা কয়েক বাজারে ঘুরে ফিরতে হবে ছাউনিতে, সন্ধ্যার একটু পরে হলেও,—রোলকলের আগে।

প্রথমেই ঘুরলাম শহরের বড় রাস্তা। তারপরেই বেড়ালাম মেজ, ছোট।

এক এক করে শেষ হয়ে গেল সীমানার সব রাস্তাগুলো-মাত্র দু'ঘণ্টায়।

ঘড়িতে মাত্র দুটো। কি করা যায়, কিছুই ঠিক না করতে পেরে আবার টহল দিলাম বার দুয়েক, ঐ একই রাস্তায়।

বায়স্কোপের বাড়ী নেই যে চটকরে সময়টা কাটবে। থিয়েটার বা নাচগানের বাড়ী দু'চারটা বড় রাস্তার ওপর থাকলেও সৈনিকদের জন্য রুদ্ধ। সম্পূর্ণ গণ্ডির বাইরে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্যাঞ্জো বাজনার সংগে দু'একটা গান শোনা গেলেও ভেতরে যাবার কোনও উপায় নেই। সামনেই দণ্ডায়মান—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এম্-পির দল।

আইন বজায় রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়েই পর্দা ফাঁক ক'রে দেখলাম কিছুক্ষণ। সময় আর কাটে না। কেনবার তো বিশেষ কিছুই নেই, তবু ঘুরছি এ দোকানের পর সে দোকান।

দেখলাম রুপোর ওপর মিনের কারিগরের কাজ। ঘুরলাম ছিট কাপড়ের বাজার। ছিট কাপড় শেষ করেই আনাজের ষ্টল। তারপরেই ফলের বাজার, পোষ্টকার্ড পিকচার, চামড়া বাঁধানো সৈনিকি ছড়ি, তলাওপর আগাগোড়া সুতো দিয়ে বোনা আরবী জুতো, কার্পেটের বাজার ইত্যাদি আরও টুকি-টাকি দোকানগুলো একের পর এক খতম করে, এসে হাজির একেবারে হীরে, জহরত মার্কেটে—বাজারের দু'তলার ওপর।

মুক্তো, চুনি, পান্না, পোখরাজ, নীলা সবই দেখাচ্ছে একটি একটি করে। অবাক হয়ে দেখছে দুগোদা। হাবভাবে মনে হয়, হয়তো কিনবে। আমার কিন্তু সখ নেই ওসবের। বালাই নেই কিনবার। বুঝি না কাঁচ পাথরের তফাত—সবই যেন এক।

বললাম ছুগোদাকে—খবরদার ছুগোদা খুব সাবধান, খেয়াল থাকে যেন পুঁজি মাত্র আঠারো টাকা।

ছুগোদা কিন্তু একমনে দেখে, নাড়াচাড়া করে ছোট বড় রংবেরঙের পাথর ; কানেও নেয় না আমার কথা।

তাইতো, ব্যাপারটা যেন সুবিধে ঠেকছে না। হয়তো ফস্ করে কিনে ফেলবে।

আবার বলি খাস বাঙলায়, যাতে ওরা না বোঝে।

বললাম, ও ছুগোদা, যত ইচ্ছে দেখে নাও, কেনার ধার দিয়ে যেও না কিন্তু—বুঝেছ ? শেষাশেষি এমন একটা দাম ছাড়বে যাতে ওরা না দেয়, অথচ না চটে,—মনে থাকে যেন।

এই মরেছে,—যা ভেবেছি ঠিক তাই। দমে গিয়ে বলি—সর্বনাশ, এ-কী করলে ছুগোদা ? বলা নেই, কওয়া নেই, ঝপ করে ন'টাকায় কিনে ফেললে নীল কাঁচটা। তুমি পাগল না-কী ? এখন সমস্ত মাসটাতো পড়ে রইলো সামলাবে কেমন করে ? এতো বুঝিয়েও তোমায় কায়দা করতে পারলাম না। কেন তুমি ওদের পাঁচ টাকা বললে না ? তা' হলেই তো সব চুকে যেত, নিশ্চয় দিতো না, টাকাগুলোও বাঁচতো। আমার সংগে একটু পরামর্শও তো করলে না, মাঝখান থেকে একটা কাঁচ কিনে বসলে কিনা ন'টাকায়। ধ্যাৎ।

নীরবে নবলগ ন'টাকা নীলার দাম মিটিয়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। এখনও হাতে সময় আছে চার ঘণ্টা, আছে আমার পুরো আঠারো টাকা, আর ছুগোদার কি আছে তা সেই জানে।

দেখছি, নীলাখানা কিনে সে যেন একটু চিন্তিত।

জিগ্যেস করলাম—আবার কি হল—ভাবছো কি ? টাকাগুলো খরচ হয়ে গেল বুঝি ? তা বেশতো চল না, এক টাকা গচ্চা দিয়ে না হয় ফিরিয়ে দিচ্ছি, তবু আট টাকাতো হাতে আসবে—কী বল ?

গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়—না না, তা নয়রে, তা নয়, ভাবছি নীলাখানা কিনলাম তো, কিন্তু সইবে কি ?

শুনলাম প্রথম, নীলা নাকি সকলের সয় না।

বিরক্ত হয়ে বলি—নীলা সইবে কিনা জানি না, তবে টাকা তোমার সইলো না।

সংগে সংগে ভুগোদাও গলা ছেড়ে বলে—ওরে নাস্তিক, তুই জানিস না নীলার কতো গুণ।

নীলার গুণকীর্তন শুনতে শুনতে এসে পড়লাম বাজার থেকে অনেকটা দুর না হলেও, সম্পূর্ণ এক বেখাপ্পা জায়গায়। যখন চমক ভাঙলো, তখন বুঝলাম আমরা কোন ফাঁকে এসে পড়েছি একেবারে এই আউট অফ বাউণ্ডসের ভেতর। এক ঝলকেই বুঝে ফেললাম এ জায়গার অবস্থা।

তাইতো এ আবার কী বিভ্রাট ঘটলো।

বেশ বুঝছি খুবই কঠিন এখন বেরিয়ে পড়া। যে মোড়েরই কথা ভাবি সেখানেই, এম-পির দল।

মুখ আমার শুকিয়ে গেল। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। চিন্তার আর শেষ নেই। কেবলই মনে আসছে,—তাইতো কী উপায়। প্রতি রাস্তার মোড়েই তো আছে দেবতাদের দল। হাজত বাসতো নিশ্চয় উপরি পাওনা বদনাম।

অনিলদার সংগে ঘোরাফেরা ক'রে আমার সাহস তবু কিছু বেড়েছে। ভুগোদা কিন্তু একেবারে সাদাসিধে, সরল মানুষ, বোঝে না ঘোরপ্যাঁচ। এখনও জানে না আমরা কোথায়। নিশ্চিন্তে শুনিয়ে যাচ্ছে, নীলার গড়ন-ওজন, আরও কতো গুণের কথা।

এবার খুলে বললাম—ও ভুগোদা, এযে আউট অফ বাউণ্ডস্, হদ্দোর বাইরে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আমার কথাগুলো শুনে।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—হ্যাঁ, বলিস কীরে। এ-কী কাণ্ডটা বাধালি বলতো? তাইতো ভাবিয়ে তুললি দেখছি।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলে—হ্যাঁরে, এখন কী উপায়? চুপ ক'রে রইলি যে,—বল না কি করবি?

দেখতে দেখতে তার মুখ হয়ে গেল সাদা, ঝরতে লাগলো কপাল দিয়ে ঘাম, থর থর করে কেঁপে।

কে কাকে সামলায়। ভাবনার থই পাওয়া শক্ত। তবু ফাঁক খুঁজছি, ভাবছি কি করি।

ভুগোদা এবার খুব কাছে আসে, কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলে—ভাখ, ওদের কিছু টাকা পয়সা দিলে পার পাওয়া যায় না?

এবার আমার মেজাজ চড়ে। জোর দিয়ে বলি—কী বলছো তুমি,

ঘুষ ? ভাখো হুগোদা, তুমি এটা জেনে রেখো মিলিটারী পুলিশ জবরদস্ত হতে পারে, কিন্তু ঘুষ খায় না,—না, সাদা-কালো কেউ না।

এবার সুর নামিয়ে বলে, তবে যাহোক একটা কিছু করতে তো হবে, কতক্ষণ আর এ ভাবে কাটাবো ?

আমারও মনটা হয় চঞ্চল। তবু বিজ্ঞের মত বচন ছাড়ি। বলি, অত নার্ভাস হলে চলবে না, একটু শক্ত হও—উপায় খোঁজ।

শুনেছি মানুষ যখন ডোবে তখন যা কিছু সামনে পায় তাকেই নাকি ধরে আঁকড়ে, বাঁচবার জন্যে। বাঁচা না বাঁচা পরের কথা। তবে এটা ঠিক আমরা কিন্তু বাঁচলাম এ যাত্রা বালিশ আঁকড়ে ধরে। হুগোদা কিন্তু সেটা মানে না, অকাট্য যুক্তি তার, আমরা বাঁচলাম নাকি সন্থ কেনা তার এই নীলার জোরে।

তার বিশ্বাসের ওপর আঘাত না ক'রে বলি—তা না হয় হল, তবে বালিশের ব্যাপারটা ভুলো না হুগোদা—মনে রেখো।

সেও জোর দিয়ে বলে—না না, ওসব কিচ্ছু না—নীলাই সব।

একই রাস্তায় পাক খাচ্ছি আর মতলব ভাঁজছি—তাইতো কি উপায়! হঠাৎ বুদ্ধির ঢাকনা খুলে গেল চোখের সামনে একটা তুলোর দোকান দেখে।

নাগালের মধ্যে তুলোর দোকান দেখে আনন্দে নেচে উঠলো আমার মনের প্রতিটি কোণ!

বললাম হুগোদাকে, তুলোর দোকানের কথা। মাত্র তিন চার দিন আগে আমার অফিসার ফরমাশ করেছিলেন একটা বালিশের—তাঁর নিজের জন্যে। অতএব ওটাই হবে আমাদের বেরোবার সম্বল—কী বল হুগোদা ?

জবাব দেয় ঢোক গিলে,—তা, তাই হোক।

তুলোর দোকানে এসে সুরু করলাম দরদস্তুর। আবার ছাড়ি ভাঙা ভাঙা আরবী বুলি। বালিশ দুটোকে দেখিয়ে বলি—বেশ হাদা ? (দাম কতো)

মিষ্টি সুরে দাম হাঁকে ইহুদি রফিগ। বলে খামস্তাস (পনেরো) ফুলুশ (টাকা)

থ হয়ে গেলাম দাম শুনে। মনে হল যেন বোমা ফাটলো।

তাইতো—পনের-টা-কা।

ভাবছি উপায়ই বা কী, যেমন ক'রে হোক কিনতেই হবে ; ওটাই তো হবে আমাদের বেরোবার পাসপোর্ট।

আমিও বেল্ট টাইট করে দরদাম করি। লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, খামসা রুপি। (পাঁচ টাকা)

আবার সেই দর কষাকষি। এক এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এসে ঠেকলাম আসূরা রূপিতে।

এবার তার মন ভিজলো—রাজী হল।

আবার চোরা বেল্টের বোতাম খুলি। শুকনো মুখে থোক-থাক গুনেদি দশ টাকা। তুলেনি বালিশ দুটো। একটা রাখি আমি, অপরটা দি দুগোদার হাতে। মুরুব্বির চালে শোনাই তাকে—দ্যাখো দুগোদা, খুব হুঁশিয়ার, এম-পিরা যদি কিছু জিগ্যেস করে কোনও কথা কইবে না ; যা জবাব দেবার আমিই দেবো, কেমন, মনে থাকবে ? খবরদার, বেমক্কা কিছু বলে ফেলো না যেন।

সাহস ফিরিয়ে আনবার জন্যে উৎসাহ দিতে দিতে এগোতে সুরু করলাম বড় রাস্তার দিকে। শুকনো মুখে হেসে বলি—ভয় কি দুগোদা, এবার বুক ফুলিয়ে হাসিমুখে চল ওদের দিকে ; চল সহজ সরল ভাবে, যেন কিছুই জান না।

অভয় দিয়ে আরও বলি—আমার হাতে আছে বালিশ ; তোমার আছে বালিশ আর নীলা—ভয় কিসের ?

বুক ফুলিয়ে মোড়েতো আসি। পড়িও ওদের নজরে।

এম-পি প্রভুর দল কাছে আসে, ঘেরাও করে। সুরু হয় প্রশ্ন, জেরার পর জেরা।

জবাবদি, বীর পুরু রাজার মত। বলি ঘুরে ফিরে সেই একই কথা—আমার অফিসারের হুকুম দুটো বালিশের, তাই সারা বাজার চুঁড়ে ফেলে কিনে আনছি ওখান থেকে—এই দ্যাখো না আমার অফিসারের দেওয়া বাজার ঘোরার পাস।

বিশ্বাস তারা নিশ্চয় করলো, নইলে ছাড়ান পাওয়া যে খুবই শক্ত।

দুগোদার এবার কাঁপুনি থামে, হাসি ফোটে। এতক্ষণ ছিলো নির্বাক, এবার কথা পাড়লো।

গলা ঝাড়া দিয়ে বলে ওঠে—ওরে কফি খাবো, চল যোসেফের কফিখানায়।

চা কফিতে জমে ভাল। আবার আসর জমালো দুগোদা। আবার সুরু করলো নীলার কথা।

গদগদ ভাবে বলে—কী-রে, আমি বলিনি এটা আসল? তুইতো বোলচাল ছেড়েছিলি খুব—বলেছিলি কিনা কাঁচ। এবার দেখলিতো, চোখ ফুটলো—বিশ্বাস হল?

খোঁচা দিয়ে আমিও বলি—তা-ই নাকি? আচ্ছা দুগোদা, বলি, আসল নকল বুঝলে কিসে?

সরল ভাবে জবাব দেয় সে—আরে, দেখলি না নীলার কতো গুণ। ওরে ব্যাটা, আজ বেঁচে গেলি কিসের জোরে বলতো? শোনরে বোকা, আমিতো এখনও বলছি, যদি ভাগ্যে সয়ে যায়, তবে দেখবি ঠিক যেন এটা আলাদিনের প্রদীপ।

তর্ক করে লাভ নেই। তবু শোনালাম—এরকম বিশ্বাস যখন তোমার মধ্যে রয়েছে, তখন তোমার পক্ষে ওটা মেনে চলাই ভাল, নইলে বিপদ অনিবার্য। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি যখন ওসব মানি না তখন ওরকম ডজন কয়েক রাখলেও ফল হবে না একটুও।

এবার তার চোখ কান হয় গরম। আচমকা আমার মুখের সামনে ঘুসি বাগিয়ে ধমক ছেড়ে বলে—ওরে বেইমান, এসব দেখেও কি তোর জ্ঞান হবে না? সাধে কি তোকে বলি নাস্তিক। হাতে হাতে ফল পেয়েও স্বীকার করিস না—আশ্চর্য।

পুরোদস্তুর জমে উঠেছে কফিখানার মজলিস। জমেছে ভোজনের সংগে নীলার ভজন গানে, আর আমার মুণ্ডপাতে। কিন্তু দেখছি, হঠাৎ দুগোদার বদন গেল যেন শুকিয়ে। হল কিছুটা আন্‌মনা।

বললাম তাকে—আবার কি ঘটলো? হঠাৎ মুশড়ে পড়লে যে?

চিন্তিত ভাবে খানাপিনার বিলখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সুর নামিয়ে বলে—ওরে, বড্ডো ভুল হয়ে গেছে। এই স্থাখ ভাই, আমার কাছে সম্বল আছে আর মাত্র দু'টাকা, কিন্তু বিল হয়েছে যে সাত টাকা। কি করি বল্‌তো?

অভয় দিয়ে হেসে বলি—তা ভাববার কি আছে দুগোদা; বেশতো, এখন আমিই না হয় সামলে নিচ্ছি। স্থাখো দুগোদা, এখনও আমার হাতে

আছে টাকা, অবশ্য তোমার আছে অমন জলজ্যান্তো নীলা। তবে এটা আমি স্বীকার করবো, নীলাটা তোমার কিন্তু একেবারে আসল—নকল নয়।

উৎসাহের সংগে টেবিল চাপড়ে বলে—সত্যি। ঠিক বলছিস ?

বললাম—নিশ্চয়, একেবারে খাঁটি।

কিসে বুঝলি বল না ?

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলি, ঘা খেয়ে বুঝছি দুগোদা, ঘা খেয়ে বুঝছি। দেখছ না, আমায় কেমন ঘায়েল করছে তোমার ঐ নীলা, আর সেই সংগে তোমায় কেমন বাঁচাচ্ছে।

আমার কথা শেষ হবার সংগে সংগে দুগোদা যেন কি সব বলে গেল। আবছা কানে গেল শেষ দুটো কথা—ইডিয়েট, বেকুব।

শেষ 'হয়ে আসছে অসহ্য গরমের পালা। ফুরিয়ে যাচ্ছে আঙুর খেজুর। শীতের আর দেরী নেই। সেও কম জাঁকালো নয়। জল জমে হয়ে যাবে বরফ। কনকনে ঠাণ্ডার সংগে দেখা দেবে টিপ টিপ বৃষ্টি। রাস্তা-ঘাট ভরে যাবে নাকি কাদায়। বইবে ভূমধ্যসাগরের মৌসুমী হাওয়া। তবে আসবে আনার (ডালিম), আসবে নারিঙ্গী (মিষ্টি লেবু)।

এদিকেও তোড়জোড় হচ্ছে নানান্ ভাবে। ছাউনিতে হবে নাকি দুর্গাপুজো। বলির জন্যে তৈরি হয়েছে খোঁয়াড়। জমা হচ্ছে পাঁঠা-দুম্বা। তাঁবু খাড়া করা হয়েছে রসদের। সেখানেও জমছে অনেক কিছু। জমছে কাঠ, জমছে চিনি, ময়দা-ঘী।

ওদিকে চমৎকার জমে উঠেছে স্বামিজীর আশ্রম। আশ্রম মানে ভজনালয় নয়। মাত্র চা কফির সংগে মজলিসির স্থান।

সমস্ত দিন ধুনি জ্বলে (ষ্টোভ) আশ্রমের তাঁবুতে। ধুনির ওপর বসানো আছে ক্যানেসতারা ভরতি জল। ভক্তরা আসে, সিগারেটের পর সিগারেট ফোঁকে, ধোঁয়া ছাড়ে, চালায় খোশ গল্প। সেই সংগে মাটিতে ঠুকে ঝেড়ে ফেলে দেয় এঁটো চায়ের পাতা। ঢালে নতুন চা, পান করে মৌজ করে।

আসা যাওয়া করছে নতুন ভক্ত আশপাশের ছাউনি থেকে। বাদ নেই গোরা ভক্তের। আমিও যাওয়া আসা করছি সমানে—গোপনে।

তাঁবুর কোণটিতে বসে আশ্রম পরিচালনা করেন স্বামিজী নিজেই। হুকুম নেই চলাফেরার ; প্যারেড বা অন্য কোনও ডিউটির। সযত্নে তাঁর পায়ে বাঁধা ব্যাণ্ডেজ। আজও শুকোয়নি ঘা। এখনও চলছে ক্যাম্প হাসপাতালের ডাক্তারের মঞ্জুর করা লাইন্-লিভ্। তা একনাগাড়ে বেশ কিছুদিন।

তারিফ করি অনিলদার কথা, আইনের ফাঁকে থাকলে ঝঞ্ঝাট নেই, যতো বিপদ তার বাইরে গেলেই।

ভক্তরাই যোগায় আশ্রমের রসদ। আমিও গোপনে যুগিয়েছি দুধ চিনি আমার অফিসারের মজুত রসদ থেকে।

হাসপাতালের গোরা ভক্তরা আনে টফি, চকোলেট, রুটী-কেক্। আনে বুলি, আরও কতো কি টিনে ভরা।

প্রসাদের ফাঁক যায় না কারও। পেয়ে থাকি বরাবরই প্রসাদের কণিকা মাত্র। এক ভক্ত যোগায়, সব ভক্ত খায়, এটাই আশ্রমের নিয়ম।

আজ ভক্তবৃন্দ সবাই মিলে প্রসাদ পেলাম—মেটে চচ্চড়ি।

প্রধান ভক্তের গুণগান করে বিতরণ করলেন স্বামিজী নিজেই। বললেন তিনি—আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, সবই ভক্তদের চেষ্টা, তাঁরই কৃপা।

আজ ক'দিন তাঁর বাসনা হয়েছিল, মেটে চচ্চড়ির। সে সাধ পুরণ করলো প্রধান ভক্ত, আজ ভোরে মাংসের ফেটিগে গিয়ে। সাপ্লাই-ডাম্প থেকে মাংসগুলো নিয়ে এসে ঠিক মতন পৌঁছে দিয়েছে ছাউনির কিচেনে। বুঝিয়ে দিয়েছে একটির পর একটি গুনতি ক'রে। সবই দিয়েছে ঠিক-ঠাক ; কিন্তু মাঝপথে বস্তাখানেক মেটে পাচার হয়ে এসে গেছে আশ্রমে।

এ রকম উধাও হওয়াটা আজ নতুন নয়। আগেও ঘটেছে, এখনও ঘটছে। ঘটে সব পল্টনেই। এটাও সৈনিকদের একটা খেয়াল। নীরস ভাবকে কাটিয়ে নিয়ে আনন্দ কিছুটা তারা পায় বৈকি। সবই যে নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে যায় তা নয় ? ঝক্কিও আছে যথেষ্ট।

করাচিতে থাকতে শুনেছিলাম সুবেদার মেজর বোস সাহেবের অমন পোষা সাদা মুরগিটা হঠাৎ উধাও হল। এসে হাজির হয়েছিল নাকি স্বামিজীরই আশ্রমে,—পরিণত হয়েছিল নাকি প্রসাদে।

সেদিন ঘৃণা করেছিলাম ওদের খুবই। রাগের ওপর শুনিয়েও দিয়েছিলাম বেশ দু'চার কথা। কিন্তু আজ আমার সে ভাব আর নেই। বদলে গেছে আমার মন। আপনা হতেই সরে গেছে লজ্জা, নীতি, ঘৃণা। এখন নেই আর আমার ল্যাট্রিন আতঙ্ক। বেশ বুঝছি, মাত্র এক বৎসরেই এগিয়ে গেছি আমি অনেক—অনেক।

এভাবে উধাও হওয়া ব্যাপারটা মাঝে মাঝে ঘটলেও, ছাউনিতে বা তাঁবুতে চুরি বা চোর যে নেই তা কম তাজ্জবের কথা নয়। হাভার স্যাক্ বা কম্বলের ভাঁজে টাকা পয়সা রাখাই আমাদের রীতি, কিন্তু তাতে হাত পড়ে না কারও। কেউ নেয় না। অতএব ওসব চিন্তা আমাদের মোটেই নেই। তবে উধাও হওয়া, লোপাট হওয়া বা খোয়া যাওয়া পল্টনে হামেশা ঘটলেও ওগুলো যে চুরির পর্যায়ে পড়ে না তা আমরা বিলক্ষণ জানি।

লোপাট হওয়া ব্যাপারটা একটু খোলসা করলে ক্ষতি কি?

এই যেমন, আমার মশারিটা খুঁজে পাচ্ছি না; বেশ কিছুক্ষণ খুঁজলাম, জিগ্যেস করলাম তাঁবুর সাথীদের; কিন্তু সকলেই নীরব, নিরুত্তর।

বুঝে নিলাম উধাও হয়েছে, অর্থাৎ খোয়া গেলো। আরও বুঝলাম, যিনি লোপাট করেছেন, তিনি একমাত্র সেই শ্রীযুক্ত কেউনা ছাড়া আর কেউনা।

আমার মশারিটা এতক্ষণে টাইগ্রীস নদীতে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়ে তাদের যে খেয়াল মেটাচ্ছে এ অনুমান করাও মোটেই কঠিন নয়। এবং ওটার যে আবার দর্শন মিলবে এ আশা করাও সম্পূর্ণ বৃথা; করিও না।

এ ভাবে কম্বল, মশারি, জুতোর ফিতে, বেল্ট-ব্যাণ্ডোলিয়ার, বেয়নেট, বুলেট, রাইফেলের বোল্ট ছাড়াও উধাও হয়—ঘোড়া, মিউল আরও কতো কি।

এখন এ স্থলে আমার করণীয় যা সেগুলো আমিও এখন ভালরকমই শিখেছি। একটুও দেরি হয়নি ওগুলো দখলে আনতে। অর্থাৎ, এখন আমিও শ্রীযুক্ত কেউনা হয়ে তাগবাগ বুঝে লোপাট করে দিলাম অপর

জোয়ানের। চোদ্দ তুগুণে আঠাশ পুরুষ উদ্ধার করলেও এটা খুবই সত্যি শ্রীযুক্ত কেউনা থেকে যাবেন সেই—কেউনাতেই।

আমার ক্যাপটেন সাহেবের পদোন্নতি ঘটেছে যে সাধারণ সৈনিক থেকেই তা আমাদের কাছে কিছুমাত্র গোপন নেই; এমনকি তিনি যে একজন ঝানু ঘোড়সওয়ার তাও আমরা অনেকেই জানি। অতএব এই সৈনিক অবস্থার খুঁটি-নাটি ছোট-বড় ব্যাপারগুলো তাঁর যে অজানা তা নয়। তিনিও যে এই উধাও হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল তাও জানলাম হঠাৎ তাঁর সেদিনকার প্রশ্নে।

প্যারেড মাঠে চক্কর দিতে দিতে আমার কাছে আসামাত্রই প্রশ্ন করলেন—হোয়ার ইজ্ ইওর চিন্‌ষ্ট্র্যাপ, ব্লাডিক্যাট?

থুতনিতে লাগাবার টুপির চামড়াটা উধাও হয়েছে আজ ক'দিন। যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করলেও বিনা চিনষ্ট্র্যাপেই কাজ চালাচ্ছি বাধ্য হয়ে।

জবাব দিলাম পা তুটোকে একত্রে ঠুকে,—এ্যাটেনসন্ হয়ে।

বললাম—ইট্‌স্ টোরন্ স্যার।

ক্যাপটেন সাহেব হয়তো ছিলেন খোশমেজাজে। হুকুম দিলেন, নতুন টুপির। সেই সংগে আবার ছাড়লেন উপদেশ। বললেন তাঁর সেই চামরটা নেড়ে—ইউ আর এ ফুল, ব্লাডিক্যাট। লুক হিয়ার—হোয়াই ডোণ্ট ইউ স্ন্যাচ্ ফ্রম আদার ব্লাডিক্যাট? শুধু কি তা-ই। ওকথা ছাড়াও আরও শোনালেন তাঁর অভিজ্ঞতা। শুনলাম, সাউথ আফ্রিকায় থাকতে একদিন হঠাৎ কি ভাবে উধাও হল তাঁর ঘোড়া; এবং সংগে সংগে তিনিও কি প্রকারে অপরের ঘোড়া লোপাট করে বেঁচে গিয়েছিলেন রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে—ছোট্ট করে লোম ছেঁটে, বুরুশ দিয়ে রং পালটে, নতুন করে নম্বর-টম্বর ছাপ মেরে।

এসব নানা রকম জ্ঞানলাভ করার পর, এখন আমিও যদি দেখি আমার জড়ানো পট্টির ভেতর থেকে, অথবা বুট জোড়ার অন্দর মহলে লুকিয়ে রাখা পুরি বা চাপাটি খোয়া গেছে, তখন আমিও অতি সাবধানে অপর সাথীর চিনি বা জ্যাম উধাও ক'রে দিতে একটুও চিন্তা বা দ্বিধা করি না। তাতে তাঁবুর সাথীরা পিতৃশ্রাদ্ধ করলেও কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে তাদেরই সামনে কাটিয়ে দি সময়টুকু—বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়ার বা রাইফেল সাফাসুফি ক'রে। অর্থাৎ তারা যেমন করে, আমিও হুবহু তেমনটিই করি।

আট

শীতের আমেজের সংগে সংগে মা এসেছেন। সংগে এনেছেন প্রচুর খাদ্যসম্ভার। এতদিন চলছিলো কেবল শুকনো আনাজ, কপি কড়ায়ের কারি, আর মটর ডালের খিচুড়ি। এখন পাল্‌টে গেছে লাংগারখানার রূপ।

এনেছেন বেতিন্‌জান্ (বেগুন) কাঁকড়ি, পালংশাক ছাড়াও এনেছেন ফিল্‌ফিল্ (কাঁচালঙ্কা)। এখন নিত্যই আমদানি হচ্ছে বেশ কিছু বিরাট আকারের মাছ, (টাইগ্রীস্ স্যামন)—তা প্রতিটি লম্বা প্রায় সাত ফুট তো নিশ্চয়।

বেশ আনন্দে আছি। ক'টা দিন কাটবে ভাল।

পুজামণ্ডপ সাজানো হয়েছে খেজুর পাতা দিয়ে, মাটির বেদীকে একপাশে রেখে। আরতির পঞ্চপ্রদীপ, কোষা-কুষি, কাঁসর, ঘণ্টা, অভাব নেই কোনটারও। ফরমাশ মতন সবই তৈরি হয়েছে বাগদাদ বাজারে।

পার্শেল এসেছে কোলকাতা থেকে। পূর্বেই বোসসাহেব আনিয়েছেন সিমলের মাতৃভাণ্ডারের মারফত একফুট উঁচু চীনেমাটির দুর্গা প্রতিমা। এখন আবার সদ্য এসেছে ছোট্ট শিশিতে গঙ্গাজল, এসেছে নামাবলী, শাঁখ, শুকনো বেলপাতা, আরও কতোরকম পুজোর উপকরণ। সবই ব্যবস্থা করে পাঠিয়েছেন, বাঙলার মহিলা সমিতির (লেডিস্ কমিটি) সদস্যারা।

পুজোর বাজনা বেজে উঠেছে মারাট্টা পল্টনের কাছ থেকে চেয়ে আনা ঢোলের আওয়াজে। বাজাচ্ছে আমাদেরই এক জোয়ান। একটুও বোঝা যায় না, ঢুলি না সৈনিক। কাঁসির অভাবে চমৎকার বেজে চলেছে ট্রেঞ্চ খুঁড়বার ছোট্ট কোদালটী।

পুজোর পুরোহিত নেবুতলার বেচারামদা। পাঁচদিন খুবই ব্যস্ত পুজোর ফেটিগ্-ডিউটীতে।

সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে কলাহীন নৈবেদ্য। ইহুদি পরিবার

থেকে চেয়ে আনা তামার থালায় আছে প্রচুর আঙুর, আনার (ডালিম), নারিঙ্গী (লেবু), খেজুর।

যোগাড় হয়েছে দুষ্প্রাপ্য ছোট্ট কলাগাছটি কোন এক বাগান থেকে মাত্র তিনখানি লীরার (গিনি) বিনিময়ে। জোড়া বেল? হ্যাঁ,—তাও এসেছে বৈকি। কোন এক বাগিচার নিভৃত কোণে গা ঢাকা দিয়ে থ'কলেও, এসে গেছে নজরে।

মনিয়ম যোগাচ্ছে ফুল। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি তোড়ার চারপাশে তুলসী পাতা দেখে!

বলির জন্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে জ্বালানী কাঠকে হাড়িকাঠে। খাঁড়ার অভাবে তরোয়ালই সম্বল। বলির এ্যামেচার কামার, বাগবাজারের হেমন্ত।

কাপড়ের অভাবে পরনে খাকী হাফপ্যাণ্ট, ভেষ্ট-সার্টের ওপর নামাবলী জড়িয়ে ধুপ-ধুনোর মধ্যে বসে একমনে পুজো করছেন বেচারামদা। সকলেই স্নিগ্ধ ভাব নিয়ে দিচ্ছে মায়ের কাছে শ্রদ্ধাঞ্জলি। কারও মনে নেই এতটুকু ভেদাভেদ, উচ্ছৃঙ্খল বা ঠাট্টা বিদ্রূপের ভাব। মেতে আছে সকলেই, কি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান। এসেছে সৈনিক, গোরাপল্টন থেকে। তারাও নত হয়ে দিচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলি,—ওয়ার গডেসকে। দেখছি সকলেই আজ শান্ত, ধীর-স্থির। তাই ভাবি, যারা কথায় বা গানে সর্বদাই ব্যবহার করে রুচিহীন ভাষা, তারা আজ কোথায়? এ কি ভেল্‌কি, না স্বপ্ন দেখছি!

পুজোর অনুষ্ঠান আর যুদ্ধের নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলো সবই চলছে একই সংগে, একই তালে। পরস্পরের কোনটিরও ব্যাঘাত না করে নীরবে হয়ে যাচ্ছে অতি সুষ্ঠু ভাবে। তবে এটাও ঠিক, আমোদ আহ্লাদে মশগুল থাকলেও সজাগ কিন্তু আমরা যথেষ্ট। দেখছি প্রতিদিনই মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে, তুর্কি এরোপ্লেন। চেষ্টার ত্রুটী নেই বোমা ফেলতে। তারাও জানে আমাদের ছাউনি,—হালচাল। এদিকে চলছে আরতি, শুনছি শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর; ওদিক থেকে কানে আসছে গোলা ফাটার শব্দ, দেখছি তার চেক্‌নাদার জলুস।

এ ক'দিনের আনন্দানুষ্ঠান, ভজন-ভোজন, খেলাধুলা, মজলিস। বসছে নাচ গানের আসর। আছে প্রতিদিনই ভুরিভোজনের ব্যবস্থা—তা নিত্য

প্রায় হাজার দেড়েক লোকের। অনেক প্রবাসী ভারতীয়ের দেখা পাচ্ছি এই পুজোর মাধ্যমে।

প্রতি সন্ধ্যায় বসে আসর। গানে আনন্দ দিচ্ছেন সংগীতজ্ঞ হাবিলদার অমিয় সান্যাল, গজল গানে বেনারসের নিয়োগী। আসর জমছে নাচের। আলিবাবা নাটকের আবদাল্লার ভূমিকায় নাচছে হেমন্ত ঘোষ; মরজিনা—ভূমেন রায়। অংশ নিয়েছেন ইংরেজ গুরুজীরা আবৃত্তি ও হাসির গানে। ছোটখাটো হাল্‌কা আনন্দ থাকলেও আছে রুচি, নেই অশ্লীলতা। আপনা হতেই রক্ষা হচ্ছে পুজোর পবিত্রতা আসরের শৃঙ্খলা।

আমাদের কর্ণেল যে কতটা কড়া ও একগুঁয়ে তার আর একবার পরিচয় পেলাম আজ, আমাদের এই পুজোর আসরে।

আবদাল্লা-মরজিনার নাচ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আসর জম-জমাট। হাজির আছেন পাশের পল্টনের সাদা-কালো সাথীরাও। এসেছেন অফিসারের দল।

ওদিকেও গলা পাচ্ছি কর্ণেলের। আসছেন তিনি রঙ চড়িয়ে, মেজাজী হয়ে। গুণ-গুণ করে গাইছেন গান। তাল দিচ্ছেন মাটিতে। ঠুকছেন তাঁর লাঠিটা দিয়ে।

শুনছি তাঁর প্রিয় গানটা : ফট ফট ফট কাবুল রিভার। থেকে থেকে বলে ওঠেন, হিপ্‌-ওয়ে—হিপ্‌-ওয়ে।

আসরে এসেই চোখ গেলো তাঁর ঘুরে, মেজাজ গেলো বিগড়ে। ছাড়লেন হুঙ্কার তাঁর বাজখাঁই গলায়।

বলে উঠলেন—হু দি ডেভিল ড্যানসিং হিয়ার? থামাও,—এখনই থামাও নাচ, হাটাও ওদের—এখনই হাটাও।

ডাক পড়ে হাবিলদার মেজরের, ডাক পড়লো এ্যাডজুটেণ্টের (ভারতীয়)।

জিগ্যেস করেন কর্ণেল—ইউ মুড্‌ নো দি আর্মি অর্ডার, হোয়াই দি গের্ল ইন্‌ দি ক্যাম্প?

অবাক হয়ে পড়েন এ্যাডজুটেণ্ট। জবাব দেন চিন্তিত হয়ে—না স্যার, কোন মেয়ে ছাউনির মধ্যে তো আসেনি।

জোর দিয়ে বলেন কর্ণেল—হ্যাঁ, এসেছে বৈকি, এইতো এতক্ষণ নাচছিলো এক ইহুদি মেয়ে।

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন এডজুটেণ্ট। জবাবে বলেন—স্যার, ও তো মেয়ে নয়। ও যে আমাদের রায়, নায়েক ভুমেন রায়।

সন্দেহ থেকে যায় কর্ণেলের মনে। জেদের ওপর আবার বলেন, কোথায় রায়? আমি দেখবো তাকে, এখনই দেখবো।

বাধ্য হয়ে নিয়ে যান তাঁকে সাজঘরে। দেখালো ভুমেন তার মুখের রঙ তুলে, সেই সংগে মাথার পরচুলা খুলে।

এবার খুশি হয়ে ফিরে যান কর্ণেল। গেলেন আবার গাইতে গাইতে—ফট ফট ফট কাবুল রিভার। হিপ্-ওয়ে হিপ্-ওয়ে...

দেখতে দেখতে কেটে গেল এ ক'টা দিন; এসে গেল বিসর্জনের পর্ব। মা চলে যাবেন।

আবার বেজে উঠলো ঢোল; তাও বাজাচ্ছে আমাদেরই সৈনিক। চমৎকার, হুবহু বাজনদার।

দেখছি নীরবে নিয়ে চলেছে মাকে টাইগ্রীসের ধারে। নেই কদর্য ব্যবহার, উচ্ছৃঙ্খল চিৎকার বা অসভ্যের মত হৈ-হল্লা। অবাক হয়ে চেয়ে আছি সৈনিক সাথীদের দিকে; এমন ভাব পুর্বে কখনও দেখিনি, আবার দেখবো কিনা জানি না।

মা চলে গেলেন। রেখে গেলেন অনেক কিছু রসদ; কিন্তু নিয়ে গেলেন সংগে করে জ্বালানী কাঠ, বাগদাদ গ্যারিসন উজাড় ক'রে। কাঠের অভাবে একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে লাংগারখানার ধুনি; শুধু আমাদের নয়, নিভে গেল সব পল্টনেরই।

মাঝে মাঝে খেজুর গাছের মূলোচ্ছেদ করে সাময়িক ভাবে সরগরম হয়ে উঠছে লাংগারখানা। কোনও রকমে তৈরি হচ্ছে আধসেদ্ধ খিচুড়ি। পরমানন্দে ভোজন করছি বেশ কয়েকদিন অন্তর। বাকি দিনগুলো কাটছে টিনে ভরা মটন, পোকা ধরা ছোলা আর বোলতা ভরা ভেলি গুড়ে।

এবার উধাও হল মটন, এসে গেল ডগ-বিস্কুট। আকৃতিতে ক্রীম-ক্র্যাকারের মত হলেও প্রকৃতিতে বিপরীত। সিকি ইঞ্চি পুরু এই ডগ-বিস্কুট মোটেই কাবু হয় না দিন তিনেক জলে বা দুধে ভিজে।

তাতেই তো ঠাকুরদা বলে, ওটা নাকি—ওয়াটার প্রুফ হেড়ো বিস্কুট, বলে, হাড়ের গুঁড়োর তৈরি ছাড়া আর কী হতে পারে ?

এবার দুধের পালা, তাও বন্ধ হল। ডগ-বিস্কুট থাকা না থাকা সমান। সুখের বিষয় এখনও জুটছে চা, তবে চিনি বন্ধ হয়েছে অনেক আগেই। এখন বিনা দুধে চলছে চা, বোল্‌তা ভরা ভেলিগুড়ে। হ্যাঁ, বোলতা। পাখা, মাথা, ঠ্যাং সমেত অতি উপাদেয় এই ভেলিগুড়। চা যে পাচ্ছি এটাই আশ্চর্যের, না পাওয়াটা আতঙ্কের। অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে এই সৈনিকের দল। বিনা চা, অসম্ভব!

বেশ চলছে কটা মাস। চাল, ডাল ইত্যাদি প্রচুর মজুত থাকা সত্ত্বেও দিন গুজরান করছি বিনা খাদ্যে। অভাব একমাত্র জ্বালানী কাঠের। তাই চলছে সেরেফ উপবাস। মাত্র এক আধ সপ্তাহ নয়,—তা একটানা দু' মাস। তবে বাদ নেই ডিউটিগুলো ; যাচ্ছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই টিপ টিপ বৃষ্টি আর হাড় কাঁপানো শীতে।

এখন বাধ্য হয়ে বন্ধ করেছি বাজার যাওয়া। আশে পাশে ক্যানটিন্ বা দোকান নেই যে ক্ষিধে মেটাই ; অতএব এখন একমাত্র ভরসা আমাদের এই মরিয়ম।

আমাদের এই ছাউনিতে রোজই আসে মরিয়ম, সংগে নিয়ে বিস্কুটের বেসাতি। ভিতরে আসবার হুকুম না পেলেও, আদেশ পেয়েছে বেচা-কেনার।

পরনে স্কার্ট। উঁচু হিলতোলা জুতো, মাথার দুই বিনুনিতে জড়ানো লীরার (গিনি) মালা। একহাতে বরসাতি, অপর হাতে খেজুর পাতার বাস্কেটে ভরা বিস্কুট—নাইস্, প্যাটাকেক—পেটিট-বিউরে।

সুন্দর নির্মল হাসি ভরা মুখখানি এই মরিয়মের। অপরূপ তার দীপ্তি, অসাধারণ তার ক্ষমতা, অদ্ভুত তার চরিত্র। দিনের পর দিন যুগিয়ে যাচ্ছে বিস্কুট, এই দারুণ শীত বৃষ্টির মধ্যে।

কারও মনে আসে না তার সম্ভ্রম হানি করবার চিন্তা। করেও না কেউ। সকলেই পথ চেয়ে থাকে ঐ মরিয়মের। এই কঠোর পরিশ্রমের পর মরিয়মের দর্শন লাভ, একটু হাসি মস্করা—কতো মধুর, কতো মিষ্টি তার ঐ বিস্কুট। এক কথায় মরিয়ম বিনা ছাউনি অন্ধকার, ফাঁকা, একদম ফাঁকা।

সত্যিই সে আনন্দ দেয় প্রচুর।

নিত্যই সে আসে—হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে বাড়িয়ে দেয় তার বিস্কুট। সকলেই তার রফিগ (বন্ধু),—কেউ বা ব্রদার (ব্রাদার)—সে যেন আসে আমাদেরই সেবা করতে, সেবা ক'রে চলে যায়, মনে হয় সে কতো আপন, যেন আমাদেরই একজন।

মরিয়মের বিস্কুটে ক্ষিধের আকাঙ্খা মেটে, কমে না পেটের জ্বালা। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকার কষ্টটাকে কিছুটা হালকা করবার জন্যে ধরনা দি পাশের গ্রামে। স্নান করবার ছুতো ক'রে নদীর ধারে গিয়ে আরব, ইহুদির ঘর থেকে কিনে থাকি এদেশের রুটি খুবুশ।

সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ হলেও, সাহায্য নিয়ে থাকি ওপাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের। এখন তাদেরই মারফত চলে কেনা-বেচা। কিন্তু চট ক'রে মেলা ভার, ধৈর্য ধরতে হয় অনেকটা সময়, আবার নজর রাখতে হয় এদিক ওদিক।

অনেক মেহনতের পর আজ আবার জুটিয়েছি একখানা, মাত্র এক ক্রাণ (চার আনা) দামে। সাইজে বেশ বড়। যেমনই টাটকা, তেমনই গরম।

সবে মাত্র এক কামড় দিয়েছি, নজরে এলো আমার ক্যাপটেন সাহেবকে। দেখছি চামর হাতে এগিয়ে আসছেন সোজা নদীর পথটি ধরে।

আবার পড়লাম ফাঁপরে। বেশ বুঝছি, ঘনিয়ে আসছে বিপদ। সরে পড়বার তাল খুঁজলেও উপায় নেই। আশ-পাশে ফ্যাঁকড়া রাস্তা একটাও নেই, যার মধ্যে ঢুকে পড়ি। সব আপদ চুকে যায়, যদি খুবুশ-খানার মায়া ত্যাগ করি। ফেলে দি। তাও পারছি না—অসম্ভব। ভাবছি কী করি। এক দিকে যেমন সাহেবের হুমকি, অপর দিকে এই খুবুশ (রুটি)। একান্ত হতাশ ভাবে এগিয়ে চলেছি—ক্লাই সানটিং ওয়াগণের মত।

বেশ বুঝছি আজ আর রক্ষে নেই; তাইতো, এগিয়ে আসছেন যেন আমারই দিকে। তবে কি লক্ষ্য করেছেন খুবুশ কেনা?

অভিজ্ঞতায় জেনেছি, চিন্তা করে লাভ নেই—বৃথা সময় নষ্ট, বাড়িয়ে দেয় যেন আরও চিন্তা। দরকার এখন উপায় খোঁজা, অব্যাহতি পাওয়া।

আর কিছু মাত্র চিন্তার প্রশ্রয় না দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মেশিন-গানের (লুইস্) ম্যাগাজিন বদল করার মত চটপট খুবুশটাকে চারপাট ক'রে ভরে দিলাম সার্টের মধ্যে। উঃ,—সংগে সংগে ছ্যাঁক ক'রে ঠেকলো আমার বুকে।

এবার ক্যাপটেন এসে গেছেন খুবই কাছে। বুকের মধ্যে করছে টিপ-টিপ, বাইরে করছে জ্বালা। তবু সব উপেক্ষা করে ঠুকলাম স্যালিউট।

দেওয়া স্যালিউট গ্রহণ ক'রে বিস্মিত হয়ে বলেন ক্যাপটেন—হোয়াই আর ইউ মুভিং এবাউট—ব্লাডি ক্যাট ?

কিছু মাত্র প্রস্তুত ছিলাম না তাঁর ঐ প্রশ্নের। ভাবছি কী জবাবই বা দেবো। কিন্তু আপনা হতেই খুলে গেল মুখ। বেরিয়ে গেল—বেদিং প্যারেড স্যার।

হয়তো খুশি হলেন স্নানের কথা শুনে। বুঝে নিলাম তাঁর মুখের ভাব দেখে। সংগে সংগে আবার সুরু হল তাঁর চামর নাড়া, ব্লাডি ক্যাট বলা, উপদেশ দেওয়া।

ঘন ঘন স্যালিউট ঠুকে শুনলামও সেই পুরোনো কথা—নিট-ক্লিণ, (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা)—স্কিন, টিথ, বুট—লেদার।

চলে গেলেন নিজের মনেই। গেলেন,—চামর নেড়ে, মাছি তাড়িয়ে, সেই সংগে বার কয়েক ব্লাডি ক্যাট আউড়ে।

আমিও পাশ কাটিয়ে বাঁচলাম বটে, কিন্তু বুকটা আমার বাঁচেনি। ফোসকা-টোসকা পড়েনি যদিও, তবে লাল হয়ে গেছে সারা বুকটা। তা হোক, তবু, আমি কিন্তু খুবই খুশি। তবে বন্ধ রাখলাম নদীর ধারে যাওয়া, খুবুশ খাওয়া। ভয় হয়, কী জানি—আবার যদি খপপড়ে পড়ি।

পুরোদ্যমে চলছে মানুষ মারার রকমারি কায়দা শেখবার ক্লাশ, দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেও। ভারতের মৌ থেকে বোমা ছোড়ার কায়দা কানুন শিখে এসেছেন আমাদেরই তিন জোয়ান। এবার নাকি বসবে বোমা ফাটানোর ক্লাশ, দেখাবেন তার সাজ সরঞ্জাম।

বোমাও এসেছে বাক্স বন্দি হয়ে। রথের মতন খাড়া করা হয়েছে গার্ডরুমের ধারে : সবই ঠিক, এবার বাক্স খুললেই হল।

এক এক করে পার হয়ে গেল বেশ কটা দিন, কিন্তু শেখাচ্ছে না বোমা ছোড়া। ওপরওয়ালা নীরব, একেবারে চুপচাপ।

এলো গেলো আরও কটা দিন, কিন্তু শেখালো না বোমা ছোড়া। চোখের সামনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সব। যেমন এসেছিলো তেমনই গেলো, জায়গা হয়ে ফাঁকা, কারণ রয়ে গেলো চাপা।

বোমাগুলোতো পাচার হল, এবার মেসিনগানের পালা। তাও এসে গেল বাক্স বন্দি হয়ে। এ হাতিয়ারটা কিন্তু মন্দ না, হালকা হলেও বেজায় তেজী। রাইফেলে ছোটে প্রতি মিনিটে বড় জোর কুড়িটি গুলি, এই মেসিনগানে কিন্তু বেরিয়ে যাবে সাড়ে সাতশো—হ্যাঁ, প্রতি মিনিটে সাড়ে সাতশো।

এটাও শিখে এসেছেন কোয়েটা থেকে আমাদের ক'জোয়ান, উপরন্তু রাজপুত পল্টন থেকে এসে হাজির হাবিলদার সিস্‌পাল সিং এই মেসিনগানের গুরুজী হয়ে।

এবার বসবে মেসিনগানের ক্লাশ; দেখাবেন তার কলকজার ব্যাপার, শেখাবেন মেরামতি, আর শেখাবেন ঝাঁজরা ক'রে মানুষ মারা।

দেখতে দেখতে সুরু হয়ে গেল মেসিনগানের ক্লাশ। সকালে শেখাচ্ছেন মানুষ মারা, বিকেলে বসছে মেরামতির কাজ; বসছে ছাউনিরই এক কোণে খেজুর বাগানের মধ্যে।

মেসিনগানে ক্ষয় ক্ষতি করে বেশী, তাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে বিপক্ষ দল। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সর্বদাই চেষ্টা করে তারা মেসিনগানের দলকে নির্মূল করতে। শুনেছি মৃত্যুটা ঘটে নাকি এদের মধ্যেই বেশী। তা হোক, সামলাতে পারলাম না বসে ক্লাশ করার লোভ, কিছুমাত্র এদিক ওদিক না করে নাম লেখালাম ওদেরই দলে। এখন সকালে ঐ কামান নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করলেও বিকেলে বেশ আরাম করি বসে ক্লাশ ক'রে।

এই মেসিনগানের ক্লাশ ছাড়াও খবরাখবরের জন্যে পূর্বেই সুরু হয়ে গেছে সিগনালিংএর ক্লাশ। শেখাচ্ছেন হাবিলদার সেন। সেনমশাই এ বিষয় খুবই পটু। লোকও ভাল। মেজাজ শান্ত, সব ঝামেলার থেকে থাকেন দূরে: তবে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে এই সেনমশায়ের। তিনি কথা বলেন খুবই কম, নিজের মনেই থাকেন চুপচাপ। ধূমপান করেন একটির পর একটি সিগারেট, পান করেন চা মগের পর মগ।

এরকম সর্বদাই মৌন থাকার জন্যে গুরুদের নাম দিয়েছেন,—প্রভু।

ক'মাস ডগ-বিস্কুট, ভেলিগুড় আর পোকাধরা ছোলা খেয়ে কাটাবার পর আবার আসতে সুরু করেছে জ্বালানী কাঠ। আবার সরগরম হয়ে উঠেছে লাংগারখানা। এখন রাতের মেনু মাংস পুরি, সংগে থাকে ভাজা বেতিন্‌জান (বেগুন)। এ ক'দিনেই ভুলে গেছি ডগ-বিস্কুটের তেজ, তবে ভুলিনি ভেলিগুড়ের স্বাদ। এখনও সমানে চালাচ্ছি ওটা, চিনির দর্শনলাভ ঘটেনি যে অনেকদিন। শুনেছি বাজারে নাকি পাওয়া যায়, কিন্তু দাম অনেক—দু'টাকা পাউণ্ড।

এখন আশপাশের পল্টন থেকে রোজই সন্ধ্যায় আসা যাওয়া করছে কিছু কিছু গোরা ভায়ার দল। ঘোরা ফেরা করে লাংগারখানার ধারে। ফিকির খোঁজে আলাপ জমাবার। দোস্তিও করে আমাদের সঙ্গে। মজলিস বসে ওদের নিয়ে ভারতীয় অফিসারদের লাংগারখানায়। তাঁবু হলেও ধুনির পাশে জমছে ভাল এই কনকনে শীতে। চলে কত রঙ তামাসা। চালায় তারা পুরির সঙ্গে বেগুন ভাজা, আর চলে মগ ভরতি ভেলিগুড়ের চা। বদলে অবশ্য আনে মারগারিন, আনে চীজ-ম্যাকরোনি,—জমে ভাল। আরও জবর জমে যখন খানাপিনার পর সুরু করে তারা, মাউথ অরগ্যান বাজনার সঙ্গে কাঁটা-চামচ বাজিয়ে কনসার্ট।

দেখতে দেখতে কাটলো কমাস। কাটলো এই বাগদাদের একপ্রান্তে খেজুর বাগিচার মধ্যে। কাঠের অভাবে কমাস অনশনে কাটালেও এখানে আনন্দ পেলাম প্রচুর। সৈনিকের প্রকৃতি যে সরল, মেজাজ তাদের রুক্ষ মনে হলেও মন কিন্তু শিশুর মত কোমল। তারা যে সামান্য আনন্দের ছোঁয়া পেলেই সব দুঃখ যায় ভুলে, তুচ্ছ মনে করে তার শারীরিক কষ্ট। সে জন্যেই তো তারা এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ায় রাস্তাঘাটে। আসর জাঁকিয়ে খানা খায় রেষ্টুরেণ্টে। যায় কার্নিভালে, ছোট ছেলেদের মত হুটোপাটি করে মেরিগো-রাউণ্ডে বা হেল্টার-স্কেল্টারে চড়ে।

কোনও পল্টনকে বেশীদিন একই জায়গায় রাখার যে রেওয়াজ নেই তা জেনেছি অনেক আগেই। দেখছি সর্বদাই নাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। কারণ ওপরওয়ালারাই জানে। দিন রাত চোখের সামনে দেখছি অদলবদল। এক যাচ্ছে, আর এক আসছে। চলে গেল ও-পাশের হাইল্যাণ্ডার পল্টন। কসাক্‌রা চলে গেছে এই কিছুদিন আগেই।

কোথায় গেছে তারাই জানে। এখন কানাকানি হচ্ছে আমাদের নড়বার। রটছে ল্যাট্রিন রিউমার। শুনছি, চলে যেতে হবে নাকি বাগদাদ ছেড়ে। ভুলতে হবে বাগদাদের বাজার, যোসেফের কফিখানা, মরিয়ম, আর ভুলতে হবে নাস্‌রাকে, সেই সংগে আশপাশের শিশুদের। যেতে হবে নাকি এখান থেকে একশো মাইল নীচে টাইগ্রীসেরই ধারে, নির্জন ফাঁকা মরুভূমির ওপর একটা ছোট্ট জায়গায়।

আবার ঘুরপাক খেলো রিউমার। গুজবের পরেই এলো খবর। খবর শেষ হতেই হল হুকুম। ব্যস, হুকুমের পরেই আবার সেই চটকদারী, আবার তাঁবু গোটানো, বাঁধা-ছাঁদা।

সবরকম তোড়জোড় করে দিন তিনেক ষ্টিমারে দানাপানি খেয়ে এসে হাজির এই নীরস নিস্তব্ধ জনমানবহীন আজিজীয়ায়।

টাইগ্রীসের পুবপাড়ে আট দশ বর্গমাইল জায়গা ফুট আষ্টেক উঁচু ও ফুট দশেক চওড়া হিজিবিজি তালগোল পাকানো কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা এই আজিজীয়া। এই ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে আছে যুদ্ধ বন্দিশালা, গোলাগুলির ডাম্প, হাসপাতাল, একটা মার্চিং পোষ্ট, আর মাত্র একটা তাঁবু খাটিয়ে এই আজিজীয়ার রেল ষ্টেশন। ভারতীয় পল্টনের দু'একটা ছোটখাটো দল থাকলেও আসর জাঁকিয়ে আছে ইংরেজ পল্টনের একটা পুরো দল—সাত নম্বর হ্যাণ্টস্।

এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পুবের একমাত্র সেই লম্বা পাহাড়টা। পারসীয়ান বর্ডার। ছাউনির কোল ঘেঁসে পশ্চিমে থমথমে এই টাইগ্রীস। পার হলেই ফাঁকা মরুভূমি, একেবারে সেই ইউফ্রেটিসের ধার পর্যন্ত। তা প্রায় মাইল ষাটেক—শুধু ফাঁকা আর ফাঁকা।

এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে গাড়ী চলার মত রাস্তা না থাকলেও আছে উটচলার মত কাঁচা সড়ক। মাঝে মাঝে দু'চারটে বেদুইনের ছাউনি থাকলেও জলের খুবই অভাব। তবে কোনও রকমে ইউফ্রেটিসের ধারে পৌঁছোতে পারলেই—হিল্লা শহর। হিল্লা থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে ব্যাবিলন। আর ঠিক তার তিরিশ বত্রিশ মাইল পশ্চিমে ছোট্ট শহর কারবালা।

আজিজীয়া ছোট জায়গা হলেও কম নয় গুরুত্বে। কাজের দায়িত্ব আছে যথেষ্ট। এখানকার মোটামুটি কাজ, রেল ষ্টেশনকে রক্ষা করা,

সেই সংগে গোলাগুলির ডাম্প, যুদ্ধবন্দিশালা। মোটের ওপর এই আজিজীয়ার যা কিছু কাজের ভার সবই পড়লো আমাদের ওপর।

সমস্ত আজিজীয়াটাই অদ্ভুত রকম কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা। বেড়ার প্রতি চারশো গজ অন্তর রয়েছে মাটির নিচে একটা ছোট্ট ঘর—ব্লক হাউস, এবং ঐ ব্লক হাউসের চারপাশে আছে ট্রেঞ্চ।

দিনে রাতে ব্লক হাউসের মধ্যে আস্তানা নিয়ে ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে হবে তারের বেড়া ; দেখবে বাইরের লোক (শত্রু) ভেতরে যাতে না আসে।

বেড়ার ভিতর দিয়ে প্রতি ব্লক হাউসের সংগে যোগাযোগ করা আছে একটা সরু তার—মাইক্রোফোন। তারের বেড়া পারাপারি করলেই খড় খড় শব্দ হবে ঐ মাইক্রোফোনের বাক্সে। ঐ রকম আওয়াজ শোনা মাত্র সেন্ট্রিও দাবিয়ে দেবে রাইফেলের ট্রিগার ; ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের লোকও হবে জখম।

নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা ইয়ারকি, ছটোপাটি, মজলিস ইত্যাদি নিয়ে মাতামাতি করলেও যথেষ্ট সজাগ আমরা ডিউটিগুলোর বেলায়। শুনলাম গোরাদের মুখে,—পুর্বে নাকি অনেক কিছু ঘটে গেছে ঐ ব্লকহাউসগুলোতেই এবং এখনও যে ঘটছে না তা নয়—প্রায়ই ঘটে।

তারের বেড়ার ব্যাঘাত না করে তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে ভেতরে ঢুকে বহুবার অনেক কিছু ক্ষতি করে গেছে বেদুইনের দল মাত্র মাস খানেক আগেও।

বুঝলাম, এই বেদুইনের দলই আমাদের এখন বড় শত্রু, এবং এদেরকে ঠেকাবার জন্যে এতো তোড়জোড়, এতো আয়োজন।

সেন্ট্রিপোষ্টগুলো দখলে এলেও এখনও আয়ত্তে আসেনি ওদের তাঁবুগুলো। ওরা চলে গেলে তবে মিলবে তাঁবুর আস্তানা। বুঝছি এই রাতটা কাটাতে হবে খোলা মাঠে। শীত এখনও যথেষ্ট আছে, বৃষ্টির জন্যে মাটিও ভিজে, ভরে আছে কাদায়। বেলচা দিয়ে ওপরের কাদা সরিয়ে নিচে পেলাম শুকনো মাটি। বর্ষাতির ওপর দরি (সতরঞ্চি) বিছিয়ে, কাদার তালকে বালিশ বানিয়ে স্বচ্ছন্দে রাত কাবার করলাম কম্বল মুড়ি দিয়ে।

সূর্য উঠবার আগেই চলে গেল গোরাপল্টন। ফেলে গেল অনেক কিছু। দৌড়ে গিয়ে দখল করলাম তাদের ফেলে যাওয়া রসদ। পেলামও

কিছু। পাঁউরুটি, টিনে ভরা মাংস বুলি, আর প্যাকেটে আঁটা পি স্যুপ-ই সেগুলোর মধ্যে জুতসই।

হাবিলদার ঘোষের সংগে ডিউটী পড়লে রাতভোর চা কফি বা কোকোটা-আশটা চলে ভাল। বেপরোয়া হয়ে হৈ-হুল্লোড়ের পর্বটাও হয় জবর। যেমনই ফুর্তিবাজ তেমনই তেজী আমাদের এই হাবিলদার ঘোষ বা পটলদা। নিত্য নতুন মতলব ভেঁজে নীরস ভাবকে কাটিয়ে দিতে তার জুড়িদার খুবই কম।

মাঝরাত্রে ভিজিটিং রাউণ্ড ও গ্র্যাণ্ড রাউণ্ডকে বিদেয় দিয়ে রাত দুটোয় এক ব্লক হাউস থেকে অপর হাউসে চুপি চুপি কফির নিমন্ত্রণে হাজির হয়েছি বেশ কয়েকবার এই পটলদারই চেলা হয়ে। তাও বিপদ কিছু কম না। অন্ধকারে রাস্তা ভুলে তারের বেড়ার ওপর হুমড়ি খেলে মৃত্যু তো অনিবার্য। আবার সেন্ট্রির চ্যালেঞ্জ কর্ণকুহরে প্রবেশ না করলে তাতেও বিপদ ঐ একই। তা হোক। এসব বিপদ মাথায় নিয়েও নানা রকম ফিকির-ফন্দি করে সর্বদাই চেষ্টা করি তার দলে থাকতে।

কিন্তু এখানে এসে অবধি পটলদা কিছুটা যেন মনমরা। এখনও ভুলতে পারেনি জারোভার কথা। বাগদাদ শহরের বুকে এফ টি সি ওর ডিউটীতে থেকে আলাপ জমেছিলো নাসরাণী বান্ধবী জারোভার সংগে। কতো মেলামেশা, কতো গল্প। সব বরবাদ হয়ে গেল। বেচারি,—একটুও ভাবতে পারেনি হঠাৎ রাতারাতি পাততাড়ি গুটোতে হবে ঐ বাগদাদের সব কিছু মুছে ফেলে।

কিছুদিন এ ব্লক হাউস, সে ব্লক হাউসে রাত কাটাবার পর এবার এসে হাজির আজ সন্ধ্যায়, হাবিলদার ঘোষ অর্থাৎ পটলদার সংগে এই রেল লাইনের ধারের ব্লক হাউসটিতে। শুধু কি পটলদা। অনেকদিন বাদে আবার যোগাযোগ হয়েছে আমার বড় মুরুব্বি যোগীনদার সংগে। বুঝছি, আসর আজ জমজমাট।

ব্লক হাউসে হাজির হওয়া মাত্র নিয়ম মাফিক দু'জোয়ান তো মোতায়েন হল দু'পাশের দুই সেন্ট্রি-পোষ্টে। বাকি ক'জন আস্তানা নিলাম মাটির নিচের এই ছোট্ট ঘরটিতে—ব্লক হাউসে। পূর্বেই বেশ ভালভাবে

মালুম পেয়েছি মরুভূমির এই কনকনে শীত, তাই আবার যোগাড় করা হল শুকনো কাঁটাগাছ, সুরু হল আগুন করে হাত পা সেঁকা। তৈরী হচ্ছে মগের পর মগ কফি, চলছে খোস গল্প।

কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। ঘুরে ফিরে এলো আমাদের পালা। খাড়া হলাম একদিকে আমি অপর দিকে যোগীনদা।

রাত গভীর। চুপচাপ নিঃসঙ্গভাবে সময় কাটাচ্ছি হাতিয়ার কোলে নিয়ে। এক মনে দেখছি রাতের মরুভূমি। হট্টগোলহীন, নিঝুম। দেখছি অনন্ত আকাশে চাঁদের খেলা—আলো আঁধারির লুকোচুরি। নজর রাখছি তালগোল পাকানো তারের বেড়া। দেখছি আসা যাওয়া করছে শেয়ালের দল, মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে পঙ্গপালের ঝাঁক। থেকে থেকে দুমদাম শব্দ আসছে অপর ব্লক হাউস থেকে রাইফেল দাগার।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা চুরমার করে এসে গেল একখানা মালগাড়ী।

ওঃ, কী বিকট শব্দ। ঘুমন্ত আজিজীয়া যেন জেগে উঠলো। সরগরম হয়ে উঠলো রাতের মরুভূমি। চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমরাও।

এখন কাটছে বেশ। বিভোর হয়ে শুনছি ইঞ্জিনের হুস্‌-হাস্‌, ক্যাঁচ-কোঁচ ছাড়া আরও কতো রকমারি শব্দ। শুনছি সানটিং-এর দুমদাম আওয়াজ। আমারও চটপট কেটে যাচ্ছে সময়টা ঐ গাড়ীগুলোর শব্দ শুনে।

যোগীনদা এতক্ষণ কি করছিলো সেই জানে। এবার তার সাড়া পেলাম। চিৎকার করে বলে উঠলো—এই তিনশো তেতাল্লিশ, কি করছিস, বলি ঘুমোচ্ছিস নাকি ?

সাড়া দিলাম। বললাম—কেন বলতো ?

জবাব পেয়ে বলে উঠলো—বলি, শব্দগুলো কানে যাচ্ছে ?

মুরুব্বির কথাটা লাগলো ভাল। বুঝলাম সেও লক্ষ্য করেছে। কাটখোট্টা যোগীনদার মনের মধ্যে এসব রেলগাড়ীর শব্দ-টব্দ যে তোলপাড় খাচ্ছে এটাই আশ্চর্য।

গদগদ ভাবে বলে উঠলাম—হ্যাঁ শুনছি বৈকি, ইঞ্জিনের শব্দগুলো বেড়ে লাগছে,—না যোগীনদা ?

আবার তার সেই ঝাঁজালো ভাব। তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠলো—তোর মাথা ; ওরে কালা শুনতে পাচ্ছিস না বেড়ার বাইরে থেকে গুলি চালাচ্ছে।

এবার আমার হুঁস হল। এ্যাঁ—সত্যিই তো, এ যে রাইফেলের আওয়াজ! সব বুলেটগুলো চলেছে যে মাথার ওপর দিয়ে!

উৎসুক হয়ে ভাবছি, তাই তো, এ আবার কী। হঠাৎ বুলেট আবার কোথা থেকে আসে! নিমেষের মধ্যে কয়েকটা বুলেট এসে বিঁধলো ব্লক হাউসের দেওয়ালে, ঠিক আমারই পিছনে।

এভাবে গুলি আসতে দেখে আমিও সবেমাত্র বাগিয়ে ধরেছি রাইফেলটা। আচমকা মুরুব্বি গুড়ি মেরে কাছে এসে আমার মাথাটা দাবিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—এই হাঁদা, ট্রেঞ্চের থেকে মাথাটা অত উঁচু করে আছিস কেন? এখনই খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে যে! শীগ্‌গির মাথা নিচু করে গুলি চালা।

হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম—ওরা কারা যোগীনদা, এদিকে গুলিই বা চালাচ্ছে কেন?

মুরুব্বি আর একটুও অপেক্ষা না করে চলে গেল হুড়মুড় করে। যেমন এসেছিলো তেমনই গেল। তবে ধমক দিয়ে বলে গেল—অত জানবার দরকার কী গুলি যখন আসছে তুইও গুলি চালা।

বেশ কিছুক্ষণ গুলি চালা-চালি হল উভয় পক্ষের। হঠাৎ সব চুপ। একেবারে নিস্তব্ধ। আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। এখন আবার কানে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ।

অল্প সময়ের মধ্যে এসব কাণ্ড ঘটে গেলেও মনের মধ্যে কেবলই তোলপাড় করছে, ওরা কারা? এই লোকালয়হীন মরুভূমির ওপর এলো কী ভাবে!

আধ ঘণ্টা চুপ চাপ কাটলো, এবার এসে হাজির এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্টের ষ্টাফ ক্যাপটেন। জানিয়ে গেলেন কাছে এসে—বেশ বড় একদল বেদুইন আক্রমণ করতে এসেছিলো গোলাগুলি ভরতি মালগাড়ী। আমরা বাধা দিয়েছি, তাই চুপ চাপ আছে। খুব হুসিয়ার, সম্পূর্ণ আজিজীয়ার ওপর চড়াও হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। ওদেরও আছে লোকবল, আছে সব রকম হাতিয়ার। আবার বলছি খুব সাবধান।

শুনলাম সবই। জানলাম বেদুইনদের কথা। আমাদের বাধা দেওয়ার কথা। তবে এটাও ঠিক, অসাবধান আমরা কখনও থাকি না, বরং সজাগ আমরা অতিমাত্রায়। হালকা ভাবে দেখি না কোন ঘটনাকে। সন্দেহের কারণ ঘটলেই জবাব দি রাইফেলের ট্রিগার দাবিয়ে। অবশ্য

কয়েকবার ঠকেও গেছি ট্রিগার চেপে। মাইক্রোফোনের শব্দ শুনে বহুবার নিরাশ হয়েছি গুলি ছেড়ে। দেখেছি ভোরের আলোয় মরা শেয়াল। ঘন ঘন তারের শব্দে নতুন বেলায় বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও, পরে বুঝেছি মাইক্রোফোনের তারের ওপর আছড়ে-পিছড়ে পড়া পঙ্গপালের দল।

নয়

একে এই আজিজীয়া খাঁ খাঁ করছে ফাঁকা মরুভূমি, তার ওপর যে কদিন এসেছি খাচ্ছি আতপ চালের পিণ্ডি, আর টিনের দুধের পায়েশ। তবে মাঝে মাঝে পায়েশে থাকে কৌটোর ফল—পিচ, পিয়ার্স, এপ্রিকট। নিশ্চিন্ত আছি জ্বালানীর, সে ভাবনা আর নেই। এখন রান্না হচ্ছে নতুন কায়দায়। কাঠের বদলে ইরাণ থেকে আসছে জ্বালানী তেল। কাঁচা ইটের গাঁথুনি করে খাড়া করা হল লম্বা চিম্নি। তৈরী হল নতুন চুলো। অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হলেও আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই হচ্ছে বেশী।

কদিন যেতে না যেতেই বন্ধ হল পায়েশ, ফুরিয়ে গেল কৌটোর ফল; রইলো কেবল মাসকড়ায়ের ডালের খিচুড়ি।

তারের বেড়ার ওপারে কাঁটাগাছ আছে প্রচুর, একটুও তফাৎ নেই নটেগাছের সঙ্গে। হল শাকের ডাক্তারী পরীক্ষা। হুকুমও পেলাম জঠরে ভরবার।

এবার বেশ কিছুদিন চালাচ্ছি মাসকড়ায়ের ডালের খিচুড়ির সঙ্গে কাঁটাগাছের থসথসে ঘ্যাঁট, শাকের টক।

শালগম আর আসে না। যতদিন পেরেছে দিয়েছে ওটা। বন্ধ দেয়নি পাকা ঝিঙুট অবস্থায়ও।

শাকের পর্ব চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল পেঁয়াজ। ব্যস, চললো মটর ডালের খিচুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজের কারী, পেঁয়াজের টক।

মাত্র ক'টা দিন চলে, হঠাৎ উধাও হল পেঁয়াজ। এবার এলো তরমুজ। বদল হল মেনু। আবার ঘুরেফিরে চললো মাসকড়ায়ের ডালের খিচুড়ির সংগে তরমুজের ঝোল।

এবার বেশ বুঝছি মুখ আর চলে না; রুটিন মতন পেটে পুরলেও মন আর চায় না হাসপাতালে গিয়ে যে মুখ বদলাবো তারও উপায়

নেই। সেখানেও সেই একই মেনু। টিনে আঁটা মাংস বুলি পাওয়া অবধি আজও খুলিনি। কৌটোর মধ্যে যেমন বন্ধ তেমনই আছে। অবশ্য মন্ত্রণা পাচ্ছি দু'চার জন সাথীর, তারা নাকি পরখ করেছে সেদিন। বলে মোটেই খারাপ নয়; তফাৎ নেই মটনের সঙ্গে—রূপে বা স্বাদে। হাণ্টস রেজিমেণ্টের কাছ থেকে উদ্ধার করা প্যাকেটে ভরা পি-সুপ জিনিসটা যে প্রকৃত কী—তা ঠিক না জানলেও অনুমানে বুঝেছি বেসন জাতীয় একটা কিছু জিনিস।

কেউ কেউ বলে যোগীনদা নাকি আমার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী। ঠাকুরদা বলে—সে নাকি আমার প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলি। পঞ্চাতেলি টাইটেলটা ঠাকুরদার কাছ থেকে চালু হলেও জানি না ওটার ইতিবৃত্ত।

বিকেলে অবসর সময়ে তাঁবুর মধ্যে জমেছে আসর। হচ্ছে করাচির কথা—পোলাও কালিয়ার খোশ গল্প। এহেন শুভক্ষণে যোগীনদা এনে হাজির করলো পি-সুপের কোটিং দেওয়া গরম গরম দুখানা মাংসের চপ। এনেছে নাকি আমারই জন্যে। চপের পাশেই পিঁয়াজ কুচি, তার কোলে একটু রাই।

মাংসের চপ।

চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। খাবো না দেখবো? ভাবলাম জিগ্যেস করি—কোন্ কারিগরের কেরামতি? কিন্তু কি দরকার? পাচ্ছি যখন তাতেই খুশী।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে দিয়ে ফেললাম তাকে একটা টিনের দুধ। না ফুটো করা নয়। সম্পূর্ণ আস্ত।

আশপাশে ভাগিদার নজরদার যথেষ্ট থাকলেও কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা না করে একটু একটু করে শেষ করলাম চপ দুটি।

এতক্ষণ পাগলা ঠাকুরদা চুপ করে সব দেখছিলো। এবার বেফাঁস করলো। আমি নাকি ফেঁসে গেছি। এতোদিন বাদে আজ নাকি আমি উদরস্থ করলাম চপরূপী বুলি।

মেজাজ গেল বিগড়ে। এগিয়ে গেলাম হাতা গুটিয়ে। শুনিয়েও দিলাম দু'চার কথা। মনকে ঠাণ্ডা করলাম আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অফিসারের উপদেশবাণী স্মরণ করে। তাই, আর কথা না বাড়িয়ে ক্ষান্ত হলাম শুধু দুধের টিনটা ফেরৎ চেয়ে।

ঢাকা-চুকো দিয়ে রাখলে যেমন অনেক কিছু চলে যায়, তেমনই বেশ চালু হয়ে গেল পি-সুপের কোটিং-এর মধ্যে কৌটোয় ভরা মাংস বুলি। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা বেশ পোক্ত হয়ে উঠলাম ওটা ধাতস্থ করতে। তবে সকলেই হুঁসিয়ার,—সর্বদাই নজরে আছে ঐ পি-সুপের কোটিং।

বুলি ফুরিয়ে গেলে ইংরেজ সৈনিকদের সংগে বদল করি মাসকড়ায়ের ডালের খিচুড়ি দিয়ে। এই অমৃতের সন্ধান পাওয়া মাত্র ছুটে আসে তারা দলে দলে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আশীর্বাদ করে তারা বুকে ক্রুশটা ঠেকিয়ে, যাতে আমরা গলার আইডেনটিটি ডিস্কটা বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি সশরীরে।

আমাদের এই ছাউনীর পাশেই আজিজীয়ার মার্চিং-পোষ্ট। লানসার, ক্যাভালরী, আরটিলারী বা ট্রানসপোর্ট কোরের দল এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় বদল হলে যেতে হয় তাদের হাঁটা পথে। ষ্টীমারে বা ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয়। এই মার্চিং পোষ্টটা তাদেরই একটা বিশ্রামের ঘাঁটি।

প্রতি কুড়ি বা পঁচিশ মাইল অন্তর নদীর ধার ঘেঁসে ব্যবস্থা আছে এরকম তাঁবু বিহীন ছাউনির।

আমাদের পল্টনের ট্রানসপোর্ট কোরের দল তাদের অশ্বতরগুলো নিয়ে বসরা থেকে বাগদাদ যাবার সময় একরাত বিশ্রাম নিয়েছিলো এইখানেই, এই আজিজীয়ার মার্চিং পোষ্টে।

মরুর বুকে হেঁটেছিলো তারা পাঁচশো মাইল। নিজেদের ওপর ছাড়াও তদারক করতে হয়েছিল তাদের অশ্বতরগুলোর।

দিনের পর দিন ওভাবে কঠোর পরিশ্রম করাতে তাদের দেহগুলো দেখতে হয়েছিলো কর্কশ, মনটাও হয়ে উঠেছিল নীরস,—মরুভূমিরই মত শুকনো।

মাঝে মাঝে ভোরে উঠেই দেখি বেশ কয়েক হাজার সৈনিক মার্চ করে এসে হাজির হয় এই খোলা মাঠে। সংগে থাকে তাদের কামান সমেত গাড়ী, ঘোড়া, অশ্বতর।

যাদুকরের ভেলকির মত চোখের পলকে ফাঁকা মাঠ তাঁবু খাটিয়ে হয়ে যায় গ্রাম। ভরে যায় নানান দেশের সৈনিকের দলে। দিনভোর যে যার কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিকেলে তাদের অবসর। আসে তারা নদীর ধারে। আলাপ জমে। গোরা সৈনিকরাই আসে বেশী। আনন্দে

উথলে উঠে আমাদের দেখে। মনে হয় কতো পরিচিত—কতো আপনার। দেখায় তাদের স্ত্রী-পুত্রের ছবি, কেউ বা প্রেমিকার। শুনি তাদের গান। আমরাও শোনাই তাদের। হাসি গানে হৈ-হল্লায় ভরপুর হয়ে ওঠে এই নিঝুম আজ্বিজীয়া। সবশেষে দিই তাদের খিচুড়ি বা পুরি। বদলে দেয় বেলের জ্যাম, কিংবা পেঁপের। দেয় টিনে আঁটা বুলি। আমরাও দি স্মারক চিহ্ন। খুলে ফেলি কাঁধের ব্যাজ—এঁটে দি' তাদের বেল্টে। হাসি মুখে তারাও খোলে,—করে অদল বদল।

মাত্র একটি সন্ধ্যার সাথী তারা। তবু লাগে ভাল। মোটেই ঠাঁই দেয় না মনে আবার তারা তাঁবু গুটোবে, আবার নিঃশব্দে চলে যাবে নিশীথ রাতে। কিন্তু সব মায়া কাটিয়ে দিয়ে, চলে যায় তারা। যায় মনকে একটা নাড়া দিয়ে। দেখি ভোরে উঠেই আবার সেই ফাঁকা মাঠ। আবার নিঝুম জনমানবহীন এই আজিজীয়া।

ভাবি তাদের কথা। মনের কোণে তাদের ব্যক্তিগত মুখগুলো উঁকি না দিলেও রেখে যায় তারা তাদের দলগত স্মৃতি।

চলছে দিনের পর দিন ব্লক হাউস ডিউটি, লক্ষ্য তারের বেড়া—মরুভূমি। লক্ষ্য যুদ্ধের রকমারি শত্রু ছাড়াও বেদুইন। সর্বদাই মনে হয়—এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্লকহাউসে, তছনছ করে দেবে বুঝি তারের বেড়া।

তারের বেড়ার বাইরে যেমন শত্রুর আশঙ্কা আছে তেমনই ব্লক হাউসের ছোট ঘরটির মধ্যেও কিছু কম নেই। বাইরের শত্রুর জন্যে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকলেও ভেতরের জন্যেও সাবধান থাকতে হয় সব সময়। বড় ইঁদুরগুলো যথেষ্ট উপদ্রব করলেও অনিষ্ট তেমন কিছু করে না। তবে, কুচকুচে কালো বাচ্চা গলদা চিংড়ির মত কাঁকড়া বিছের আতঙ্ক আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে অনেক সময়।

উকুনের মত সাদা পোকাগুলো ক্রমশ এতই বেড়ে চলেছে যে গরম প্যাণ্ট কোট দেহে রাখা অসহ্য। প্যারেডের সময় ওদেরও রীতিমতন কুচকাওয়াজ চলে আমাদের সর্বদেহে। বুক পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করলেও চলবে না নড়া চড়া। নড়লেই কর্ণেলের হুঙ্কার বা বরাতে একটা কিছু। সর্বদাই খেয়াল রাখতে হয় গুরুজীর কথা—হিলো মাৎ, যব বিচ্ছুমে কাটেগা তব্ ভি নেহি হিলেগা।

যেখানেই থাকি না কেন, সামান্য ফুরসত পেলেই ধ্বংস করতে সুরু করি এই ক্ষুদ্র দুশমনদের। শুধু কি আমরা? সব পল্টনের একই অবস্থা। বাগদাদে যে হাইল্যাণ্ডার পল্টনকে ঘাগরার বদলে প্যাণ্ট পরা দেখেছিলাম, এখন বুঝছি কেন তারা ঘাগরা ত্যাগ করেছে।

মশা না থাকলেও তার দোসর আছে—স্যাণ্ডফ্লাই। আকারে ছোট হলেও তেজ আছে। কামড়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে অবশ্য অনেক সময় অপকারের চেয়ে উপকারই বেশী। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসহ্য কষ্টবোধ হলে এই স্যাণ্ডফ্লাই-ফিভারই শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম এনে দেয় হাসপাতালে আশ্রয় দিয়ে।

পিশু নামে কালো তিলের মতন পোকাটি যে হাসপাতালেও নেই তা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না। কামড় খুব মারাত্মক না হলেও মাত্র একটা পিশু এক রাত্রের ঘুমের দফারফা করবার ক্ষমতা রাখে যথেষ্ট।

আর ঐ বাগদাদ বয়েল?

ওটার আক্রমণ হলেই তো অস্থির কাণ্ড। আলবত পেনসন।

কাঁকড়া বিছে বা পিশুর কামড় কিছুটা বরাতের ওপর নির্ভর করলেও এই স্যাণ্ডফ্লাইয়ের উৎপাতের জন্যে আমরা মোটেই নিষ্ক্রিয় নই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সংগে সংগেই গায়ে মুখে ভারমি-জেলি মাখা আমাদের নিত্যকর্ম। তা ছাড়া শোবার আগে বিছানা মশারিতে কিছুটা কেরোসিন তেল ছড়াতে পারলে তো কথাই নেই। কিছুটা নিস্তার পাওয়া যায় বৈকি। তবে ঐ কেরোসিন তেল যোগাড় করাও একটা শক্ত ব্যাপার।

এই স্যাণ্ডফ্লাই ছাড়া মাছির দাপটও কিছু কম না। মাছিতে যে কামড়াতে পারে এ ধারণা আগে ছিল না। মাছি নির্মূল করবার জন্যেও ব্যবস্থা করা হয়েছে বেশ কিছু। চারিদিকে ছড়ানো হচ্ছে মাছি মারা তেল, আটকানো হয়েছে মাছি বসবার চটচটে কাগজ—ট্যাঙ্গল ফুট। প্রতি তাঁবুতে দেওয়া হয়েছে ছোট এক টুকরো তারের জাল আঁটা একটা ছড়ি—ফ্লাইট্র্যাপ। সর্বদাই ঘটা করে শোনানো হচ্ছে রেজিমেণ্টাল অর্ডার,—মাষ্ট কিল দি ফ্লাই।

পাগলা ঠাকুরদারও জুটেছে এখন নতুন বুলি। চিৎকার ক'রে বলে বেড়াচ্ছে—ডোণ্ট্ ফরগেট্ আওয়ার রেজিমেণ্টাল্ অর্ডার—এভ্রি বডি মাষ্ট কিল্ দি ফ্লাই—মাছি মারো—মাছি মারিতেই হইবে।

প্রায় মাস দেড়েক বাইরে কাটিয়ে আবার এসে জুটেছে আমাদের এই পাগলা ঠাকুরদা। এসেছে আজ মাত্র কদিন। আমিও পাগল হবার উপক্রম হয়েছিলাম তার অনুপস্থিতিতে। একটু একটু করে কেম যে তার ওপর এরকম টান পড়ছে তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। তাকে পেয়ে গুরুদেবও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

গোপনে যোগাড় করা মাংস থেকে তাকে ভাগ দেওয়া আমার একটা প্রধান কাজ। অপরিষ্কার পোশাকে প্যারেডে হাজির হয়ে পাছে সে দণ্ডভোগ করে, সেজন্যে প্রায়ই যুগিয়ে যাচ্ছি পরিষ্কার সর্ট-সার্ট আমারই কিট্ব্যাগ হাতড়ে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে একটা বাড়তি কাজ হয়ে পড়ে আমার জ্যাম-জেলি নিয়ে তার কাছে দৌড় ঝাঁপ করা।

তারও প্রকৃতি কিছুটা অদ্ভুত। মাইনে পেলেই টাকাগুলো ধরে দিতে আসে আমায়। বলে—ওরে, এইনে, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ করে খুশি মত খরচ করবি। আরও বলে—টাকার আমার দরকার নেই—কী হবে টাকা দিয়ে? তার কথার ওপর বাধা দিয়ে বলি—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোর চলবে কেমন করে?

জবাব দেয়—কেন, তোরা চালাবি। গুরুদেব আছে, রাম আছে,—তুই আছিস।

গম্ভীর হয়ে বলি—আমি তোর টাকা নেবো কেন?

এবার চুপ করে কি ভাবে, হয়ে যায় মনমরা। উদাস ভাবে বলে—নিবি কেন!

ফিরে আসার পর দিল্ যেন তার খুলে গেছে। মনের আনন্দে ঘোরাফেরা করছে এ তাঁবুর থেকে সে তাঁবু। থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে—মাছি মারো, মাছি মারিতেই হইবে। গুরুদেব দিচ্ছেন নতুন মন্তর। কি শিখছে সেই জানে।

বেচারির বয়েস কিছুটা বেশী হলেও আমাদের মতনই ভোগ করেছে অসহ্য গরম। সহ্য করেছে টিপ্ টিপ বৃষ্টির মধ্যে হাড়কাঁপানো শীত। ত্যাগ করেছে স্নান। কষ্টের মাত্রা বেড়ে গেলে অগত্যা আশ্রয় নিয়েছিলো হাসপাতালে।

ঘুরপাক খেয়েছে এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতাল। কখনও কুত (কুত-এল্ আমারা) আবার সেখান থেকে আমারা। কাটিয়েছে

রেষ্ট-ক্যাম্পে। বাদ দেয়নি কমজুরি (কন্‌ভ্যালেসেণ্ট) ডিপো। কিন্তু আজও ঠিক সেইরকমই আছে। বদলায়নি একটুও। এখন ফুরসত পেলেই আসর জমাচ্ছে খোলা মাঠে বা নদীর চরে। আবার ভাও বাতলে ঠুংরি শোনাচ্ছে। গাইছে তার মার্কা মারা গান......

পেয়ারে লাগিরে মন ইয়া কানাইয়া বংশী মেরা
পেয়ারে লাগিরে মন ;
দোলে মুকুতি মান্দার মালা, গলে বাসন্তি মালা,
বৃন্দাবন মে ধেনু চরাওয়ে, কানু চিকণ কালা,
পেয়ারে লাগিরে......

তোফা জমিয়েছে। গাইছে ফোগলা দাঁতে, টাক মাথা নেড়ে—হাত দুটো এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। হুল্লোড় চলছে খুবই, ওকে মাঝখানে রেখে। এখন সর্বদাই সে আসর গুলজার করে ছাউনির এখানে সেখানে। কখনও বা লাংগারখানায়। এমন কি প্যারেড মাঠেও। তবে একটু নাচিয়ে দিলে তার সেই নেচে ওঠা অভ্যাসটা এখনও আছে। এত পরিশ্রমের মধ্যে পড়ে আজও কমেনি একটুও। ঠিক তেমনটিই আছে। অবশ্য, এরকম হঠাৎ নেচে উঠে একটা কিছু করে বসার জন্যে তাকে দুর্ভোগ পেতেও হচ্ছে অনেক।

আমাদের ক্যাপটেনের হাব-ভাব একটু বেয়াড়া ধাঁচের হলেও, বুঝেছি, তাঁর মনটা সাদা। যেটুকু বাতিক, তা ঐ মাছি তাড়ানোর সংগে বারকয়েক ব্লাডি-ক্যাট বলা, আর আমাদের হাড়-মাস পরিষ্কার আছে কিনা লক্ষ্য রাখা। তবু বলবো—লোক ভাল।

ঠাকুরদাকে নাচিয়ে দেওয়ার উৎসাহটা গুরুদেবেরই বেশী। কারণ তাকে নিয়ে একটু আমোদ ভোগ করে সময়টা কাটানো মাত্র। অতএব বরাবরের মত এবারেও তাই করলেন।

বিকেলে নদীর চরে ক্যাপটেন সাহেবকে বেড়াতে দেখে গুরুদেব পাগলা ঠাকুরদার কাছে এসে উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁরে ঠাকুরদা, পারবি অফিসারের কাছে গিয়ে বলতে তোর সেই কাব্যটা? কি কল বানিয়েছ কোম্পানি কলেতে ময়দা দিলে হয় চিনি।

একটু কি যেন চিন্তা করার পর ঠাকুরদা বলে—হ্যাঁ, তা অবশ্য পারি বৈকি; তবে কিনা গুরুদেব, ও বড্ডো খামখেয়ালি। যখন তখন যা

তা বলে ; শুধু কি বলে ? কখন যে কি করে বসে বলা শক্ত। তাই ভাবছি, কি করবো—একটু ভয়ও করে।

টাকের উপর হাতটা একটু বুলিয়ে নিয়ে আবার সুরু করলো—এই ভাখো না, সেই শনিবার বিকেলে কি করলে জান ? সেদিন আচমকা ক্যাপটেন সাহেবের সামনা সামনি হতেই আমাকে লক্ষ্য করে মুখ ভেংচে জিগ্যেস করলো—হু আর ইউ ব্লাডি ডার্টি-ক্যাট।

ভ্যাবাচেকা মেরে গেলাম ওর কথা শুনে। কোনও রকমে তাল কাটিয়ে ফস করে বলে ফেললাম—ইয়েস্ স্যার আই এ্যাম নাথিং বাট্ এ ডার্টি-ক্যাট।

জবাব শুনেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো—হোয়াট, ব্লাডি-ক্যাট ?

আর হোয়াট। আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। হোয়াটের পর আর কিচ্ছু না গুরুদেব, সেরেফ চুপ, এক্কেবারে স্পিক্‌টি নট্।

আচ্ছা, এ'তো হল পয়লা পর্ব, তারপরের ব্যাপার কি হল জান ? বলি তবে—এই শীতে আমায় দিগম্বর করে নামিয়ে দিলো টাইগ্রীসের জলে। বলে, আমি নাকি নোংরা, অপরিষ্কার—ডার্টি। সংগে সংগে আনিয়ে নিলো একটা ঘোড়ার বুরুশ আর একটা স্যাডল্ সোপ। তারপরেই পুলিশ নায়েককে দিয়ে চললো আমাকে নিয়ে ডলাই-মলাই। এই শীতে কষে স্নান করিয়ে দিয়ে ব্যাটা তবে আমায় রেহাই দিলে। পাগলা আবার পাশে দাঁড়িয়ে রগড় দেখে—মুচকি মুচকি হাসে—মুখের কাছে চামড় নাড়ে—মাছি তাড়ায়।

না গুরুদেব, দরকার নেই ওর কাছে গিয়ে, খুঁচিয়ে ঘা করা বৈত নয়। ওর থেকে যতো দুরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। তা নইলে, সেবার গার্ডমাউন্টিং এর ইন্‌স্‌পেক্‌সনে এসে কি নাস্তানাবুদই না করলে বলতো ? বন্দুকের ব্যারেল পরিষ্কার আছে কিনা দেখবার জন্যে কম্যাণ্ড তো দিলো,—ফর ইন্‌স্‌পেক্‌সন, পোর্ট আর্ম, প্রভু কিন্তু দেখতে সুরু করলেন রাইফেলের বদলে জুতোর ফিতে আটকাবার পিতলের ছ্যাঁদাগুলো ঝকঝকে আছে কিনা। ভাখোতো কি কাণ্ড। ফলে, একধার থেকে প্যাক ড্রিল।

গুরুদেব কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে আবার উৎসাহ দিয়ে বললেন—ওরে, ও একটু বেয়াড়া ভাবের হলেও লোক খারাপ না। আচ্ছা ভাই, আজ আর একবার পরখ করে ভাখ না, তোর কোনও ভয় নেই। যা ভাই, নাক

কান বুজে বলে ফ্যাল—তারপর ও যদি কিছু বেয়াড়াপনা করে, তখন তুইও না হয়—বেয়াড়া গাইবি। যা, আর দেরী করিসনি, চটপট উঠে পড়।

ঠাকুরদা এবার নেচে ওঠে। মাথায় হেলমেট চড়িয়ে চিনষ্ট্র্যাপ আঁটে—উঠে দাঁড়ায়। সুরু হয় বিড়-বিড় করে কি যেন বলা, সংগে সংগে উটের মতন পা ফেলে ক্যাপটেনের দিকে চলা।

সোজা-সুজি সাহেবের সামনে এসে বলে তার ছড়া। বলে, তার সেই জড়ানো কথায়—নানা রকম মুখভঙ্গী ক'রে।

হতভম্ব হয়ে পড়েন আমার ক্যাপটেন। থমকে দাঁড়ান তার ভাবগতিক দেখে। রেগে বলেন—হো-য়াট। হোয়াট ডু ইউ মিন্ বাই দিস্?

ঠাকুরদা এবার পড়ে মুশকিলে। ছুটে যায় তার খেয়াল খুশি, মতলব ভাঁজে পাশ কাটাবার।

কোনও রকমে তো তাল সামলায়। জবাব দেয় করুণ ভাবে। বলে যায় খাসা ইংরেজীতে—স্যার, এ-কথার অর্থ অতি সামান্য, কিন্তু খুবই গভীর। যদি হুকুম করেন তবে আমিও খোলাখুলি ভাবে শোনাতে পারি আমার ছন্নছাড়া মনের কথা।

হুকুম হল—ওয়েল, ক্যারি অন্।

ঠাকুরদা গম্ভীর ভাবে বলতে সুরু করলো—করতাম মাষ্টারি কলকাতারই কোনও এক স্কুলে। সামান্য রোজগার হলেও সুখে শান্তিতে কাটছিলো দিনগুলো। হঠাৎ এলো দুর্দিন। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আমাদের ক্ষুদ্র সংসার। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ইহলোক ছেড়ে চলে গেল এক এক করে—আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। রয়ে গেলাম আমি একা আমার নিঃসঙ্গ সংসারে; কিন্তু ভুলতে পারলাম না তাদের এক মুহূর্তের জন্যে। যেখানেই যাই দেখি তাদের। দেখি, সামনে এসে দাঁড়ায়—সরে যায় কাছে গেলেই। এই অসহ্য যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যোগ দিলাম পল্টনে। ভেবেছিলাম শান্তি পাবো দূর-দূরান্তরে গেলে, কিন্তু আশ্চর্য—এতো দূরে এসেও দেখছি তাদের। এখনও তারা এসে হাজির হয় আমার সামনে। বিশেষ করে রাত্রে যখন থাকি সেন্ট্রি পোষ্টে দাঁড়িয়ে—মরুভূমির দিকে তাকিয়ে। কী অসহ্য। কে বুঝবে আমার দুঃখ, কাকেই বা বলব আমার মনের কথা। আজ আপনাকে যেতে দেখেই কেমন যেন হয়ে গেলাম, জানাতে এগিয়ে এলাম আমার বেদনাভরা কাহিনী।

ঠাকুরদা একটানা কথাগুলো বলেই একটা বড়গোছের নিঃশ্বাস ছাড়লো। খেয়ালি ক্যাপটেনও এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন তার কথা। হয়তো মনটা ভিজলো, কিংবা বুঝলেন পাগল।

নরম মেজাজে জিগ্যেস করলেন—নাম, নম্বর, প্লেটুন ?

ক্যাপটেনের কাছ থেকে ছাড়ান পেলেও আমি কিন্তু চিন্তায় রইলাম ওর ভাগ্যে কি জুটবে ভেবে।

কাছে আসতেই ব্যস্ত হয়ে গুরুদেব জিগ্যেস করলেন—কিরে, কী ব্যাপার ? কী এতো কথা ছাড়ছিলি সাহেবের কাছে ? ওরেঃ বাব্বা, কথা যেন আর ফুরোয় না। হ্যাঁরে, কি বললি—বল না।

জবাব দেয় গম্ভীর হয়ে—বিকাশ।

একগাল হেসে বলেন গুরুদেব,—বিকাশ। কিসের বিকাশ ?

ঠাকুরদা আর কোনও কথা বলে না। কারও দিকে তাকায়ও না। চলে যায় উদাস ভাবে। অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে বলে—সত্যিই তো, কিসের বিকাশ ? না না ওসব কিছু না। এখন আর ওসব চিন্তা নয়। এখন শুধু মাছি—হ্যাঁ, এই মাছি।

পরমুহূর্তে জেগে উঠলো তার পুরোনো খেয়াল। চিৎকার করে বলে—আই সে, ফলো আওয়ার রেজিমেণ্টাল অর্ডার—মাছি মারো, মাছি মারিতেই হইবে, মাছি মারিতেই হইবে......

ঠাকুরদার ভাবটা এবার কিছুটা নতুন ঠেকলো। তবে কি বিগড়ে গেলো ? আড়ালে ডেকে ধমক দিয়ে বলি, এই ললিত, তুই বড্ডো বাড়িয়ে তুলেছিস। সব সময় এর-তার কথায় মেতে উঠিস, ওরা যা শিখিয়ে দেয় তুইও তাই করে বসিস। না, ঠাকুরদা তুই ভবিষ্যতে কারও কথায় আর নাচবি না। আমার ভয় হয় কোনদিন তুই বিপদে পড়ে যাবি। তোর কি মনে নেই সেই বাগদাদের ঘটনা ? সুবেদার মেজর বোস সাহেব রাত্রে যখন খাচ্ছিলেন, ওরা তোকে নাচিয়ে দিলো, তুইও ফট করে কিন্তু কাছে গিয়ে বলে বসলি—কী কাণ্ড। আমায় বাদ দিয়ে ভোজন ? ভোগের আগেই প্রসাদ !!

আচ্ছা, কী দরকার ছিলো তোর ওসব কথা বলবার ? মাংস তোকে দিয়েছিলেন এটা ঠিক, নিজে না খেয়ে আমাকেও খাইয়েছিলি তাও

স্বীকার করি, কিন্তু ওরকম বেয়াড়াপনা করার জন্যে তোকে হাবিলদার মেজর খেজুর গাছে বেঁধে রেখে যে দণ্ড দিলো, তা তোর মনে না থাকলেও আমি ভুলিনি।

না ঠাকুরদা, তুই কারও কথায় ওরকম মাতামাতি আর করবি না, বল আমাকে, কথা দে ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলো। একটু পরেই আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে—সত্যিইতো, ওরকম কেন করি বলতো ?

বললাম, তুই একটা জ্ঞান পাপী।

ঠাকুরদার ওপর রাগ হয়, দুঃখও হয়। আমিও ভাবি ঐ একই কথা—কেন সে ওরকম করে। আরও ভাবি, আজ কলকাতায় থাকলে আমার সংগে সম্বন্ধ থাকতো হয়তো গুরু-শিষ্যের ; কিন্তু এখানে এসে সব যেন ওর একাকার হয়ে গেছে।

আমারও মনটা হয়ে যায় পাগলা। মেজাজও হয় রুক্ষ। সুর চড়িয়ে বলি—আচ্ছা ঠাকুরদা, তুই না আগে মাষ্টারি করতিস। একজন মাষ্টার হয়ে এত শীগগির নিজেকে নষ্ট করে ফেললি ? তোর একটুও লজ্জা করে না ওরকম ফষ্টিনষ্টি করতে ? ছিঃ।

এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলো। হঠাৎ কী রকম যেন হয়ে গেল। বদলে গেল তার মূর্তি। চোখ মুখ হয়ে গেল লাল। উগ্রভাবে বলে—ফের, ফের মাষ্টারের নাম নিচ্ছিস ? খবরদার, ললিত মাষ্টারের নাম আর মুখে আনবি না। ললিত মাষ্টার মরে গেছে অনেকদিন, এখন কেবল বেঁচে আছে এই পাগলা ঠাকুরদা। যেমন বেঁচে আছে এখানকার মাছি।

হ্যাঁ, মাছি। মাছি !! মাছি !!!

মাছি মারিতেই হইবে, মাছি মারো, মানুষ মারো। দিনরাত কেবল মারো মারো মারো......

দশ

এই নীরস আজিজীয়ায় গুরুদেব যেমন কিছুটা আনন্দ দেন তাঁর নিত্য নতুন মতলব ভেঁজে, তেমনই অনেক সময় চাঙ্গা হয়ে উঠি আরও কোন কোন সাথীর আপ্রাণ চেষ্টায়।

আমুদে বেচারামদার বয়েস কিছু বেশী হলেও উৎসাহ তাঁর অনেক। পুজোর পুরোহিতের ফেটিগ-ডিউটিতে মেতে থাকতে তাঁকে যেমন দেখেছি, তেমনই খেলার মাঠে হিপ্-ওয়ে বলে টাগ-অফ-ওয়ারের দড়ি টানাটানিতেও ওস্তাদ কিছু কম না।

এখন দেখছি তাঁকে নতুন ভাবে; মেতে আছেন ছাউনির শিক্ষকরূপ ধারণ করে।

হ্যাঁ, শিক্ষক। যাকে বলে মাষ্টার মশায়। অবিকল পাঠশালার গুরু। চলন-বলন, ধমক-ধামক। তফাৎ শুধু, ধুতি চাদরের বদলে—সর্ট-সার্ট, বুট-হ্যাট।

নিরক্ষর সৈনিকদের অক্ষরজ্ঞান দেবার জন্যে ছুটো তাঁবু জোড়া দিয়ে ইস্কুল বসছে আমাদেরই ছাউনিতে। বই, স্লেট, বোর্ড, চক, সবই আছে। অভাব নেই কোনটারও। উৎসাহ খুবই,—শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের। শিক্ষা দিচ্ছেন—বেচারামদা।

স্কুল বসে প্যারেডের পর। দিব্যি চেঁচায় তারা অ, আ, ক, খ বলে। পড়া দেয় সটকে নামতা। অনেকেই ধাপ পেরিয়েছে—এ, বি, সি, ডি-র, যোগ-বিয়োগ, টাকা-আনা,—এই ইস্কুলেরই তাঁবুতে এসে।

সেদিন জানিয়ে গেল বেচারামদা—সিন্নির নিমন্ত্রণ। বিকেলে হাজির হতে হবে ইস্কুলের তাঁবুতে।

মন-খানেক ময়দা, সেই পরিমাণ চিনি। আইডিয়াল মার্কা বিলিতি টিনের দুধের সংগে সেরপাঁচেক মনক্কা ঢেলে তৈরি হয়েছিলো কলাহীন সিন্নি।

একের পর এক ভরে দিলো আমাদের র‍্যাসানটিনে। দিলো জাতি-ধর্ম নির্বিচারে।

নারায়ণ যে সত্য যুদ্ধক্ষেত্রেও আছেন তা স্মরণ করিয়ে দিলো বেচারামদা সত্যনারায়ণের সিন্নি খাইয়ে। তবে, একটু বেশীরকম স্মরণ করেছিলো আমাদের ভোজনপ্রিয় যোগীনদা। মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়ে প্রাণ ভরে চালিয়ে ছিলো সিন্নির পর্ব। কিন্তু বিরূপ হয়েছিলেন নারায়ণ। দাদাকে শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো ছাউনির ছোট ডাক্তার, যোশী ভায়ার। মাঝরাতে আস্তানা নিতে হয়েছিলো তাকে আমাদেরই হাসপাতালে।

এরকম ছোট বড় রকমারি ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি এই আজিজীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে।

কাটলোও প্রায় দেড় মাস।

গরমের সংগে মোলাকাত হতে আর বেশী দেরী নেই। এখন চলছে ফাল্গুন মাস। শীত গরমের মাঝামাঝি।

ফাল্গুনী হাওয়ার ছোঁয়া না পেলেও মনের মধ্যে হয়তো দোল খাচ্ছে অনেকের। এই ফাঁকা আজিজীয়া বাস্তব অভাব মেটাতে না পারলেও বঞ্চিত করেনি তার প্রকৃতিতে। এখন জ্যোৎস্না ঢালা চাঁদনি রাতে এই মরুর বুকে জমছে বাসন্তিক আসর।

এসে গেল দোলপুর্ণিমা।

প্যারেড বন্ধ।

হোলির উৎসব-আনন্দে মেতে আছে পণ্টনীয়ার দল, এক একটা ছোট খাটো পৃথক দলে। চলছে গান, গল্প-গুজব, হাসি-মস্করা। আবির বা রং কল্পনার বাইরে। প্যারেড বন্ধ—তাই যথেষ্ট।

কিন্তু সইলো না। ভেঙে গেল হোলির আসর; আনন্দ, উৎসব। সৈনিক অনেক কিছু সইতে পারে, কেবল সহ্য করতে পারে না কেউ তাকে বে-ইজ্জত করলে।

আত্মমর্যাদা জ্ঞান তার কিছু কম নয়। এইটুকু বজায় রাখবার জন্যে অপরের বুকের ওপর রাইফেল দাগতে সে যেমন পটু, তেমনই একটুও পিছপাও হয় না নিজের গলার নলীতে বন্দুকের ডগা রেখে পা দিয়ে ট্রিগার দাবিয়ে দিতে।

তারই কিছুটা পরিচয় দিলো আজ, এই হোলিরই দিনে।

বেওয়ারিস ভাবে হঠাৎ দৌড়ে এলো দুটো ঘোড়া। বরাবর এসে হাজির হল ছাউনির মধ্যে।

কার ঘোড়া কে জানে ?

হোলির আমোদ-প্রমোদও জেকে উঠলো ঘোটকারোহণে।

হঠাৎ এভাবে ছাউনির মধ্যে ঘোড়া পেয়ে খুশি মনে একটির ওপর বসেছেন কর্ণেলরূপে—হাবিলদার মেজর; অপরটিতে আছেন আমার ক্যাপটেন রূপে—স্বয়ং গুরুদেব।

চলছে হরেক রকম রঙ-তামাশার ব্যঙ্গাভিনয় উক্ত অফিসারদের হুবহু নকল কম্যাণ্ড করে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হল একদল আরব।

দাবি জানালো ঘোড়ার।

কোনও প্রকার সৌজন্য প্রকাশ না করে ফৌজীদের ওপর সরাসরি বর্ষণ করতে লাগলো অশ্লীল গালিগালাজ।

ভেঙে গেল আমুদে হাস্য কোলাহলপ্রিয় সৈনিকদলের সহ্যের সীমার বাঁধ।

অবশেষে ? তা-হলও কিছুটা রক্তক্ষয়।

বেলা বারোটা।

অপেক্ষায় আছি কিচেন-কলের (খাবার ডাক) বিউগিলের শব্দের।

বাজলো বিউগিল—জেনারেল ফল-ইন।

ছুটোপাটি করে দাঁড়ালাম সার দিয়ে, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

কর্ণেল উপস্থিত।

হাজির হয়েছেন, সাদা-কালো অফিসারের দল।

শুনছি কর্ণেলের হুঙ্কার—তোমরা নষ্ট করেছ শৃঙ্খলা, শিথিলতা এসেছে অফিসারদের কাজে—তাই এই উচ্ছৃঙ্খলা। এ অন্যায়, শুধু অন্যায় নয়, অমার্জনীয়। বল, তোমাদের মধ্যে কোন্ সেই সৈনিক, যারা পলিটিক্যাল অফিসারের ঘোড়া ধরেছ ? জখম করেছ আরবদের ? স্বীকার কর, নইলে দেবো চরম শাস্তি—রেখে যাবো দৃষ্টান্ত।

খট করে এক কদম এগিয়ে গেলেন হাবিলদার মেজর—খটলদা। সংগে সংগে গেলেন গুরুদেব। আর এগিয়ে গেলেন আমাদের কোম্পানিরই একজন সাধারণ সৈনিক—বাজপায়ী।

গর্জে উঠে কর্ণেল বলেন—আরও আছে, নাম কর তাদের।

আর সাড়া শব্দ নেই, সব চুপ।

বিচার শেষ হল। পেলাম দণ্ড।

যেতে হবে রুটমার্চে—মাত্র কুড়ি মাইল। যাবেন দু'একজন শান্ত প্রকৃতির ক্ষুদ্র ইংরেজ অফিসার, বাকি ভারতীয়।

যাত্রা সুরু হল, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। সংগে নিয়ে তলপি তলপা। চলতে হবে অনাহারে, বিনাজলে—এই ফাল্গুনের রোদে, মরুভুমির বুকে—মাত্র বিশ মাইল।

কর্ণেল একগুঁয়ে হলেও নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অফিসারকে ; কিন্তু তিনিও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে চলেছেন আমাদেরই সাথী হয়ে, শুধু এ অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ জানাতে। চলেছেন তালে তালে পা মিলিয়ে,—কষ্ট হলেও কাতর হননি একটুও।

বোঝা নিয়ে রুটমার্চ। মাত্র কুড়ি মাইল ?

তা যেতে পারি স্বচ্ছন্দে ; সে কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছি এতদিনে। দুঃখ নেই তাতে একটুও। তবে মুশড়ে পড়ি যখন দেখি এত প্রভেদ এই সাদায়-কালোয়। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন।

দেখছি ইংরেজ অফিসাররা আছেন ঘোড়ার পিঠে।

ভারতীয় অফিসারের দল ? না, ঘোড়া তাঁদের প্রাপ্য নয়।

শুধু কি তাই ? তফাৎ অনেক।

ভারতীয় সৈনিকদের বেতন মাত্র আঠারো টাকা, গোরা সৈনিকদের, ষাট টাকা। ভারতীয় অফিসারদের বেতনের শেষ সীমা মাত্র আড়াইশো। সাদা অফিসারদের—কয়েক হাজার। আস্তানা থেকে সুরু করে অশন, বসন, র‍্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিটিতে রয়েছে সুন্দর ব্যবধান। এমন কি হাসপাতালেও।

আমরা বুঝেছি এই পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য ভারতীয় ফৌজীর দল গোরা অফিসারদের কাছে আজ কতো অবহেলিত। এই নির্মম অবজ্ঞার জন্য বহু অফিসার আজ কতো বিলাসী, কতো অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন তা আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পেরেছি আমাদের এই অল্পদিনের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতায়। অন্তরের সংগে অনুভব করছি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির অভাব। তা নইলে, আমরা যখন বাগদাদে কয়েক মাস অনাহারে ছিলাম, তখন তাঁরা বড়দিনের আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন কিনা মদের সংগে টারকি ধ্বংস ক'রে। যখন উদর পুরণ করেছি দিনের পর দিন পোকা ধরা ছোলা খেয়ে, তখন তাঁরা ভোগ বিলাসের ওপর স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছেন কিনা রকমারি ফেটিগ-ডিউটিতে।

ফুরসত হয়েছিলো কি আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করবার? যখন আমাদের লাংগারখানার আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেছে, ক্ষুধা দমন করেছি বোলতা ভরা ভেলিগুড়ের চা দিয়ে—তখন কোন কোন দাম্ভিক আয়েশী অফিসার অবুঝের মত বেশ কয়েক ঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে মেজাজের ওপর চালিয়েছেন কিট্-ইনস্‌পেক্‌সনের পর্ব।

কোথায় দরদ!

আজ যখন দেখছি আমার সাথীরা ঘর্মাক্ত দেহে সব কষ্ট উপেক্ষা করে আনন্দের সংগে চলেছে এই রুক্ষ কুড়ি মাইল পথ—তখনই ভুলে গেছি দুঃখ, লাঘব হয়েছে কষ্ট। তাই আজ নতুন উদ্যমে এই রুটমার্চের দণ্ডকে হোলিরই একটা আনন্দ মনে করে গান গাইতে গাইতে প্রায় শেষ করে এনেছি এই বিশ মাইল পথ। এখনও আমরা অবিরাম গেয়ে চলেছি, আমাদের নেপালী সাথীর রচিত গান,—

ঘর ভি ছোড়া, দোর ভি ছোড়া,
ছোড় দিয়া পিয়ার
বেণ্টকা ভিতর পাউচ ভরকে,
সিনে ব্যাণ্ডোলিয়ার,
বাঙালী পণ্টন—(ইয়ে) এলেমদার পণ্টন...

আর মাত্র দু'মাইল। ঐ, ঐতো সামনে পড়ন্ত রোদের আলোয় চিক্-চিক্ করছে তাঁবুগুলো। ঐতো লাংগারখানার চিমনির ধোঁয়া। মনে হয় কত কাছে। কিন্তু পথের আর শেষ নেই? দেখছি মরীচিকার মত তাঁবুগুলোও যেন এগিয়ে চলেছে আমাদেরই চলার সাথী হয়ে। কী অদ্ভুত, পথ যেন আর ফুরোয় না, চলেছি তো চলেইছি। একটানা এই মরুর ওপর কেবল হাঁটা আর হাঁটা? তাইতো, এতটা পথ এলাম, নতুন কিছুই নেই? সবটাই শুষ্ক। সেই বেলেমাটির ওপর একঘেঁয়ে কাঁটা গাছ। তবে হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি—দেখেছি ক'টা বুনো খরগোস, সারসের ঝাঁক, আর দেখেছি, মাত্র একটা গাজল, কিন্তু আশ্চর্য যেটার আজ বিশেষ দরকার, যার ওপর নির্ভর করে আমাদের শক্তি, পথ চলা, কই? তার এক ফোঁটাওতো পাইনি এই কুড়ি মাইল চলার পথে। কোথায়—কোথায় সে জল?

বাস্, আর মাত্র এক মাইল। এই, এইতো তারের বেড়া,—ব্লক হাউস। এইতো ইংরেজ-তুর্কিদের ভাঙা গড়া ট্রেঞ্চগুলো, এইতো সেই অবজারভেসন পোষ্টটা।

আহা, বেচারি খোকা—আর চলতে পারলো না। পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো—জল-জল, একটু জল। কারও কথা শুনলো না। বেরিয়ে গেলো লাইন থেকে, শুয়ে পড়লো মরুর বুকে।

পাশের সাথীর স্থূল দেহ। তার পাও আর চলে না। মুখ-চোখ হয়ে গেছে ফ্যাকাশে। অবসন্ন দেহে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে—ওরে, আর তো পারছি না—বেরিয়ে পড়বো, বসবো।

স্মরণ করিয়েদি কর্ণেলের হুকুম—অসম্পূর্ণ হলে কাল আবার নতুন করে চলতে হবে এই পথটুকু—খবরদার।

হতাশ ভাবে বলে সে—তা হোক, পা যে আমার অবশ হয়ে আসছে। আমি যে আর পারছি না। শুয়ে পড়বো।

চোখ রাঙিয়ে বলি—তা কি সম্ভব! না, হতে পারে না,—হতেও দেবো না তা।

মরিয়া হয়ে বলে সাথী—না, আর একপাও না, ছেড়েদে, আমি বসবো।

জোর করে ধরি তাকে,—ধরে যোগীনদা। সুর নামিয়ে উৎসাহ দিয়ে করি অনুরোধ। যষ্ঠি-মধু মুখে গুঁজে দিয়ে বলে যোগীনদা—চল ভাই, এইতো এসে গেছি, আর মাত্র কয়েক কদম বৈত নয়, এই নে, ধর আমাদের কাঁধ—কই, তুলেদে।

এবার সাথী মাথা তোলে, চোখ মেলে তাকায়, বাড়ে আগ্রহ। অবসাদ তুচ্ছ করে ধীরে ধীরে হাত দু'খানি তুলে দেয় আমাদের কাঁধে।

আমাদেরও আসে উৎসাহ। ধরা-ধরি করে চলি কায়ক্লেশে। মদ্যপায়ীর মত ফেলি প্রতি পদক্ষেপ, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে টেনে আনি তাকে বাকি পথটুকু।

ঠেলা দিয়ে বলি—ওরে এই, এই তিনশো ছাব্বিশ, এই ছাখ, এসে গেছি, চেয়ে ছাখ, এইতো ছাউনির তাঁবু, এইতো লাংগারখানা, এইতো জলের হাবস্ (জলের জালা) এইতো...।

জবাব দেয় ক্ষীণ স্বরে—এঁ্যা, এসে গেছি? এসে গেছি! কাতর ভাবে বলে—জল, একটু জল।

দেখি করুণ চাউনিতে বেয়ে পড়ে তার আনন্দের আঁখিজল।

আমাদেরও আনন্দে ভরে ওঠে মন। কতো আনন্দ, কতো তৃপ্তি, কতো শান্তি সাথীকে আনন্দ দিয়ে।

বিনা জলে, বিনা অন্নে, সারা দিনটা কাটলো এই ভাবেই। দেখিয়ে দিলো আমাদের সৈনিক সাথীরা, তারাও পারে যে কোনও স্থায়ী ঝানু পল্টনের মত সব রকম কষ্ট সহ্য করতে।

কিছু সাথী মরুর ওপর রয়ে গেলেও, বেশীর ভাগই ফিরে এসেছে ছাউনিতে। কিন্তু আসা মাত্রই খুশি মত ছত্রভঙ্গ হয়নি কেউ। পল্টনের দস্তুর কায়দা মত চলা।

ফিরে এসেই আবার দাঁড়ালাম সার দিয়ে; যেমন খাড়া হয়েছিলাম মার্চের আগে। চলবার আগে হুকুম পেয়েছিলাম কুইক-মার্চ। এবার শুনলাম ডিস্‌-মিস্‌।

দিনভোর হেঁটে পায়ের ও কাঁধের অবস্থা শোচনীয় হলেও ভোগান্তি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভুল মনে করা হবে, দৌড়ে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করেছি মনে করলে। এতক্ষণতো হল দণ্ডভোগের পর্ব, এবার যে যেতে হবে ডিউটীর পালা গুলোতে।

মাত্র আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর গার্ডের দল আবার দাঁড়াবে সার দিয়ে; যাবে ব্লক-হাউসে, বন্দিশালায়, গোলাগুলির ডাম্পে। আবার চলবে রাতজাগা—কফি খাওয়া। তাজ্জব হবার কিছু নেই। কষ্ট সহ্য করাই তো সৈনিকের ধর্ম। সম্পূর্ণ গা সওয়া হয়ে গেছে এভাবে রাতের পর রাত কষ্ট ভোগ করা। তবে, যন্ত্রণার মাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে দেয় এই শ্রীচরণ।

মোটেই ফুরসত হল না বুটজোড়া খুলে চরণযুগলকে একটু তোয়াজ করবার। থাকলো এই ভাবেই আঁটা সাঁটা। আবার থাকবে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা। দরকার হলে তিন দিনও থেকে যায়। তবে গরমের দিনে পা দুটো ভেপ্‌সে উঠলেও, শীতের মত অসহ্য নয়।

সে সময় বৃষ্টি নামে, হাঁটু ডোবে কাদায়—বুটপট্টি ভিজে গিয়ে থেকে যায় ঐ ভাবেই।

ঐ, আবার বাজলো বিউগিল।

বাজাচ্ছে, গার্ড ফল-ইন্‌।

হল এ্যাড্‌জুটেন্টের আগমন—ইনস্‌পেক্‌সন্‌। হল, ম্যাগাজিনে গুলিভরা।

সবরকম ঝঞ্ঝাট শেষ করে আবার হল হুকুম—গার্ড কুইক-মার্চ।

অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বার আগেই চলে গেলো গার্ডের দল। গেলো যে যার পোষ্টে। একটু একটু করে মিলিয়ে গেলো বুটের শব্দ—মস্-মস্, খড়াক্-খড়াক্......

নেই বিরক্তি, ঈর্ষা, ক্ষোভ, তাচ্ছিল্য-ক্রোধ। সব থেকেই সে থাকে দূরে। সে যে প্রকৃত ত্যাগী। সে শুধু জানে, আজ তার পালা। জানে হুকুম করা—হুকুম মানা।

এই আভিজীয়াতে ক'মাস কাটিয়ে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কিছু বাড়লেও বুদ্ধি-শুদ্ধি নাকি মোটেই বাড়েনি, বরং যেটুকু মগজে ছিলো তাও নাকি লোপ পেয়েছে।

এসব হক্ কথা শুনলাম আজ এই ব্লক-হাউস ডিউটীতে হাবিলদার পাঁড়েজীর সঙ্গে কাটিয়ে।

আজ সকাল থেকেই আমার ওপর অগ্নিমূর্তি হয়ে অনেক কিছু কথা শোনালেন। বললেন আমার মাথা মোটা, নীরেট, অর্থাৎ আমি একটা আকাট মূর্খ ছাড়া আর কিছুই না।

বুঝলাম, ও কথা বলা তাঁর খুবই ভুল। বুদ্ধি থাকলে তবে তো লোপ পাবে? কাল আমার বেশ ধারণা হয়ে গেলো, ওটার পুঁজি আমাদের কারও নেই। অন্তত যে ক'জন এই ব্লক-হাউস ডিউটীতে আছি সে ক'জোয়ানের তো নিশ্চয়ই। তা না হলে কাল রাত্রে অমন কাণ্ড ঘটে। যোগীনদা তো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বেমালুম পাশ কাটালো। মাঝখান থেকে আমাকেই কথাগুলো হজম করে দস্তুর মত তোয়াজ করতে হচ্ছে আমাদের এই গার্ড-কম্যাণ্ডার হাবিলদার পাঁড়েজীর।

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ হলেও কী রকম যেন হয়ে গেলো গোলমেলে। সত্যি, সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। তবে বরাত ভাল যে ঘটনাটা বিশেষ জানাজানি না হয়ে চাপা রয়ে গেলো এই সাতজন ফৌজী আর আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অফিসারেরই মধ্যে।

তবে এটা সকলেই স্বীকার করবো গত রাত্রে আমরা ক'জনে ঘায়েল না হলেও বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম তো নিশ্চয়ই। সব জোয়ানকেই কাবু করে দিয়েছে মাত্র এক রাত্রেই।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো লেমোনেড খাওয়া নিয়ে। খেয়েছিলামও বেশ কিছুটা। তা মাথা পিছু তিন মগতো হবেই। তবে আসল কথা, লেমোনেডের বদলে কেমন করে যে সিড্‌লিজ পাউডার পান করেছিলাম, সেটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। কিন্তু আমার জবান শোনার অপেক্ষা না করেই আজ ভোরে কম্বল ত্যাগের পর, আমার মুখ দর্শন করা মাত্র এন্তার কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন, হাবিলদার পাঁড়েজী। এমন কি গত রাত্রের কাণ্ডকারখানার জন্যে শেষ পর্যন্ত তিনি দায়ী করলেন কিনা আমাকেই।

শপথ করে বলছি, দায়ী আমি মোটেই নই। আমি বরং বলবো, কিছুটা দায়ী আমার মুরুব্বি যোগীনদা, দায়ী আমাদের কাটখোট্টা সৈনিক জীবন, আর সম্পূর্ণ দায়ী যদি কাউকে করতে হয়, তা একমাত্র এই প্রাণহীন স্তব্ধ আজিজীয়া।

এখানে আসা পর্যন্ত নতুন কিছু চোখে পড়া তো দূরের কথা আজও দেখতে পাইনি একটাও নারী বা শিশুর মুখ। সর্বদাই দেখছি, পল্টন আর পল্টন। সেই একঘেয়ে ক্যাভালরী আর আরটিলারী।

নদীতেও ঠিক তাই। ষ্টিমারের শব্দ পেলেই ছুটে আসি নদীর ধারে। দেখি সেই একই রূপ। চলেছে বোঝাই হয়ে শুধু সৈনিকের দল।

আশপাশে বা দূরে একমাত্র কাঁটাগাছের ঝোপ ছাড়া অন্য কোনও গাছ পালা তো নেই-ই, এমনকি আজও নজরে আসেনি দু'একটা উট বা গাধা দুম্বা। অন্তত যদি একটাও বেদুইনের ছাউনি থাকতো তা হলেও তাদের বাজনার আওয়াজে এই একঘেয়েমিটা নিশ্চয় কিছু কাটতো।

রেলওয়ে ক্যাম্পের স্টেশন বলতে একটা মাত্র তাঁবু সম্বল। বালাই নেই টিকিটের বা টিকিট ঘরের। প্যাসেন্‌জার গাড়ীও নেই। সব সময় চলছে মালগাড়ী। বে-সামরিক লোকদের সম্পর্কও নেই এগুলোর সংগে। দিন রাত যাচ্ছে রসদ, মানুষ মারার সরঞ্জাম, আর যাওয়া আসা করছে কেবল ফৌজ আর ফৌজ।

ওরই মধ্যে এম্বুল্যান্স ট্রেনটা এসে গেলেই কিছুটা নতুন লাগে চোখে। আগ্রহের সংগে দৌড়ে হাজির হই গাড়ীর কাছে। দেখি, চুপ-চাপ পড়ে আছে আগাপাস্তলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আহত সৈনিকের দল। কারও হাত আছে, পা নেই—পা আছে, হাত নেই।

এসব ছাড়া এখানে যে আর কিছু থাকতে পারে তা আমার মোটেই জানা ছিলো না, কিন্তু কাল বিকেলে হাবিলদার পাঁড়েজীর সংগে এই রেলওয়ে ক্যাম্পের ব্লক-হাউস ডিউটীতে মোতায়েন হবার পর যোগীনদাই কথা পাড়লো। বললে—স্টেশনের কাছে এক নতুন ক্যান্‌টীনের কথা। অনেক কিছু নাকি পাওয়া যায় সেখানে, এমন কি লেমোনেড পাউডার!

পাঁড়েজীর বপুটা একটু ভারী হলেও দস্তর মত হুজুকে। শুনেই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন—ইয়েঃ, সাবাস্! বল কী? সত্যি লেমোনেডের মত?

যোগীনদার ঝোঁকটা সবচেয়ে বেশী।

হাবিলদার সাহেবের উৎসাহ দেখে আবার নতুন উদ্যমে সুরু করলো তার লেমোনেড পাউডারের কথা।

নানারকম ভঙ্গী করে শোনাতে লাগলো—একটা ছোট টিনের কৌটাতে থাকে মোট চুয়াল্লিশটা পুরিয়া। অর্ধেক পুরিয়া মোড়া সাদা কাগজে, বাকি অর্দ্ধেক, সবুজ মোড়ক। ঐ দু'রঙের দুটো পুরিয়া একমগ জলের সংগে মেশানো মাত্র, দেখতে না দেখতে, ভজ-ভজ করে ফেনা হয়েই, অবিকল লেমোনেড। ভজকট মোটেই নেই পাঁড়েজী, শুধু একটু মেহনত করে প্যাকেট দুটো জলের সংগে ঠিক্‌ঠাক মিশিয়ে নেওয়া। দামও অল্প, মাত্র সাত সিকে পুরো বাক্সটা। তবে কিনা, হাবিলদার সাহেব, একমাত্র অভাব বরফের।

এতক্ষণ পাঁড়েজী সব শুনছিলেন। এবার তাঁরও ঝোঁকটা দস্তর মতন চাপলো। আগ্রহের সংগে বলে উঠলেন—তা হোক, বিনা বরফেই চলবে, তুমি বাপু নিয়ে এসো।

ওঃ, আর সহ্য হয় না এরকম গরম হাওয়া। যাও হে, আর দেরী করো না তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

মাথা পিছু হিসেব করে জমা হল সেয়ার হোল্‌ডারের পয়সা। কিন্তু, আর কে যাবে আমার মুরুব্বির সংগে?

লেমোনেডের ওপর ঝোঁক না পড়লেও, মন টানছে দোকান দেখবার। অনেকদিন অনেক কিছুই দেখিনি। যা কিছু শেষ দেখা—সেই বাগদাদে। তাই, সেখানে গিয়ে চোখ দুটোকে একটু ঝালিয়ে নেওয়া মাত্র।

মনের কথা পাঁড়েজীকে বলা মাত্র হুকুম পেলাম সংগে যাবার। আর

এদিক ওদিক না তাকিয়ে, চটপট ব্যাণ্ডোলিয়ারটা বুকের থেকে খুলে রেখে, হেলমেটটা মাথায় চড়িয়ে চিনষ্ট্র্যাপটা থুতনিতে এঁটে, বেরিয়ে পড়লাম যোগীনদার সঙ্গে, লেমোনেড পাউডারের খোঁজে।

সস্ত লাইসেন্স করা ছোট্ট দোকান। নল-খাগড়ার ছিটে বেড়ার ঘর। মাটি লেপা ওপর পাশে।

মাত্র একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে; জ্যাম-জেলি থেকে সুরু ক'রে ভেসেলিন, জুতোর কালি, পিতল পালিশ, আর আছে প্রচুর ইজিপ্‌সিয়ান জিগারা (সিগারেট)।

বে-সামরিক দোকান হলেও মাল-মশলা সবই আছে সৈনিকেরই চাহিদা মতন।

হাজির হওয়া মাত্র ইহুদি রফিগ উঠে দাঁড়ালেন।

হেসে জানালেন—মোসায়েল্‌ খের। (গুড ইভিনিং)।

আমরাও আলাপ জমালাম, মোসায়েল খের জানিয়ে।

জিগ্যেস করলাম—রফিগ, লেমোনেড় পাউডার আকু ? (আছে)

দোকানি রফিগ কী যেন ভাবলেন।

বললেন—জ্যাম আকু, প্যাটাকেক আকু—লেমোনেড পাউডার মাকু (নেই) রফিগ।

আমি একটু হতাশ হয়ে পড়লেও, মুশড়ে পড়লো যোগীনদা। তবু, আশা ছাড়লো না।

পাশ থেকে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—নিশ্চয় আছে, ও বোধহয় নাম জানে না, তুই ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বল।

আমিও গলাটা ভেঁজে নিয়ে, আবার পাঁচমিশুলি বুলি ছাড়ি। বলি, হাদা, (ঐ) লেমোনেড পাউডার এক নমুনা ডিঙ্ক, আস্তে নেই মালুম ? (তুমি বুঝতে পারছো না)

ব্যগ্র হয়ে বলেন—ড্রিঙ্ক ? ও—ইয়েস,—মালুম। (বুঝেছি) একদম মালুম।

মুরুব্বিও বলে উঠলো—দেখলি তো এবার ঠিক বার করবে। আমি জানি আছে।

রফিগ এবার একটু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে, বার করেন লাইম জুসের বোতল।

বোতল দেখেই বললাম—লা (না) উ নমুনা নেহি।

সংগে সংগে বোতল রেখে তুলে ধরেন দুধ চিনি কফি মেশানো কৌটো—কফি উঁলে।

খিটখিটে যোগীনদা এতক্ষণ চুপ-চাপ সব দেখছিলো। এবার ধৈর্য হারালো। আমাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো—তুই ঠিক বোঝাতে পারছিস না,—এপাশে সরে দাঁড়া, আমি অন্য কায়দায় বিলকুল বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বললাম—তা না হয় দাঁড়ালাম, কিন্তু আরবী বুলির ওপরতো তুমি আমারই মত দিগ্‌গজ পণ্ডিত—বোঝাবে কেমন করে?

গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো—ঠিক আছে; এই গ্যাখনা কি করি।

বাধ্য হয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখতে লাগলাম ব্যাপারখানা।

দেখছি, হাতে-কলমে বোঝাবার উদ্দেশ্যে তৈরি করলো দু'রঙের দুটো নকল পুরিয়া।

কোমরের বেল্টের হুক থেকে মগটা খুলে সামনে রেখে, হাবভাবে বোঝাবার সংগে ছাড়তে লাগলো এক বেয়াড়া ধরনের খিচুড়ি ভাষা।

একটা পুরিয়া মগের মধ্যে রাখবার ভান করে বলে—সুপ আস্তে, (আপনি দেখুন) ই নমুনা ওয়াহেদ প্যাকেট, (এরকম একটা পুরিয়া) হেনা, ই মাইকো (এখানে এই জলের) ভিতরমে রাখ দিয়া।

দ্বিতীয় পুরিয়াটাও ঐভাবে যেন মগের মধ্যে ঢেলে দিলো। আগেরই মত পাঁয়তারা কষে হিন্দী-আরবী ভাষা আউড়ে বোঝাবার সংগে সংগে হঠাৎ মুখ দিয়ে এমন এক অদ্ভুত ভজ-ভজ শব্দ করে উঠলো, ঠিক যেন মনে হল লেমোনেডের বোতল খুললো।

মুরুব্বির চালে কোমরে হাত রেখে জিগ্যেস করে—কিয়া রফিগ, আভি আরাফ? (বুঝছেন) আকু উ নমুনা ড্রিঙ্ক? (কি বন্ধু ওরকম পানীয় আছে?)

দোকানী রফিগ হেসে বলেন—ইয়েস,—ইয়েস, নাউ আরাফ, (বুঝেছি) তমাম আরাফ (সব বুঝেছি)।

আর কোনও দিকে না তাকিয়ে শশব্যস্ত হয়ে, আকু উ নমুনা (ওরকম আছে) বলেই টেবিলের এক কোণ থেকে বার করলেন একটা ছোট কৌটো।

যোগীনদার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—হাদা (এটা) ভেরি গুড ড্রিঙ্ক, তমাম ইংলিশ আস্‌কার (সব সৈনিক) টেকিং,—সী লেবেল, লুক্ ই নমুনা?

দু'জনেই নাড়াচাড়া করে দেখলাম কৌটোটা। বড় অক্ষরে ফরাসী ভাষায় কী সব লেখা থাকলেও, ছোট্ট করে নিচের একপাশে ইংরেজীতে লেখা—সিড্‌লিজ্‌ পাউডার।

লেখাটা পড়ে কী রকম যেন সন্দেহ ঠেকছে।

বললাম মুরুব্বিকে—ছাখো যোগীনদা, এ তোমার কিন্তু লেমোনেড পাউডার নয়।

চোখ পাকিয়ে জোরের সংগে জবাব দিলো—কে বললে নয়? আলবত লেমোনেড।

কৌটোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলি—এই ছাখো, কী লেখা, পড়তো তুমি একবার।

লেখাটার ওপর বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে—ঠিক আছে।

সিড্‌লিজ্‌ পাউডার পদার্থ টা যে কী তা না জানলেও, জেদের ওপর আমিও বলি—না ঠিক নেই— নিশ্চয় অন্য কিছু। আচ্ছা যোগীনদা, তুমি কি এই সিডলিজ পাউডার নাম আগে কখনও শুনেছো?

নাই বা শুনলাম, স্যামপেল টেষ্ট করলেই তো সব ফ্যাসলা হয়ে যাবে।

বেশ তাই লাগাও।

তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে কৌটোটা ছিনিয়ে নিয়ে আর একবার ভাল করে জিগ্যেস করে রফিগকে—ই নমুনা মিঠা ড্রিঙ্ক? মাইকো (জলের) ভিতরমে দেনেসে ভজ-ভজ শব্দ করেগা? ফেনা হোগা?

ইহুদি ভায়া কোনও কথার জবাব না দিয়ে তড়ি-ঘড়ি দু'টো পুরিয়া একমগ জলের সংগে মিশিয়ে ফেললেন। ফেনা হওয়া মাত্র মগটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ইয়েস, হাদা কুম্নে জেন, (খুব ভাল), ইস্‌ফার আস্তে, (আপনি পান করুন)—সুপ (দেখুন)।

যোগীনদাও ঢক্‌-ঢক্‌ করে মগের জলটা খালি করে দিয়ে, মুখটা বিকৃত করে বলে—ওরে, ঠিক বলেছিস, ছাখ, এটা লেমোনেড পাউডার নয়।

উৎসুক হয়ে জিগগ্যেস করি—তবে তুমি খেলে কী?

একটু চিন্তা করে বলে—হাঁ, বুঝেছি, এটা সোডাওয়াটার পাউডার। তা হোক, ঠিক আছে।

আমিও ধমক দিয়ে বলি—তুমিতো সবেতেই বল—ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক কোথায়? না যোগীনদা দরকার নেই এসব পাউডারে, তার চেয়ে ফিরি চল।

আমার কথাগুলোর ওপর কিছুমাত্র কর্ণপাত না করে নিশ্চিন্তে দাম মিটিয়ে দিলো। কৌটোটা তুলে নিয়ে বলে—তোর একটুও বুদ্ধি নেই, একেবারে মুখ্যু, ওরে একটু চিনি মেশালেই যে লেমোনেড তা তোর ঘটে আসে না? স্বাদ ফিস্তে কি সব সময় সব কিছু পাওয়া যায়? ওরই মধ্যে একটু সামঞ্জস্য করে নিতে হয়। বুঝলি?

প্রথমে কথাটা একটু বেয়াড়া ঠেকলেও, ভেবে দেখলাম যুক্তিটা ভাল। মেনে নিলাম যোগীনদার কথা। মুরুব্বির বুদ্ধির সুখ্যাতি করতে করতে ব্লক হাউসে ফিরে এসে সানন্দে পাঁড়েজীর হাতে তুলে দিলাম সিডলিজ পাউডার নামধারি লেমোনেড পাউডারের কৌটো। শোনালাম সোডা-ওয়াটার রহস্য, চিনি মেশানোর যুক্তি।

হাবিলদার সাহেব হুজুকে। চিনি মেশানোর মতলব শুনে, মোটেই অমিল হল না তাঁর সংগে মতের। বরং খুশি হলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শোনালেন—এই ফাঁকা মরুভূমিতে বসে লেমোনেড খাওয়া, একি কম সৌভাগ্যের? যা পেয়েছ তাই যথেষ্ট। যাক্, আর দেরী কেন—খুলে ফেলো কৌটো।

অনেক দিন পর আজ আবার সুরু হল মাতামাতি। এই ভরা বিকেলে ব্লক হাউসের চালের ওপর বসলো বৈঠক। চললো মগের পর মগ সিডলিজ পাউডারের সরবতের সংগে গলা ছেড়ে মাণিক পীরের গান,—

কতো ক্যারামত জানোরে যাদু, কতো ক্যারামত জানো,
মাঝ দরিয়ায় জাইল্ ফ্যাইলা তুমি, ডাঙায় বইসা টানো,

—মাণিক পীর,

সুবুদ্ধি গোয়ালার ম্যাইয়া কুবুদ্ধি ঘটিলো,
বেসালিতে দুগ্ধ রাইখ্যা পীরকে ফাঁকি দিলো,

—মাণিক পীর,

এঁই এঁই এঁই এঁই.........হো।

একটু একটু করে কমে এলো দিনের আলো। কৌটোও হয়ে গেল খালি। থেমেও গেল গান। অন্ধকার ছড়িয়ে যাবার সংগে সংগে বেড়ার ওপর ফেলতে লাগলো সার্চ লাইটের আলো। আবার ছেঁকে ধরলো স্যাণ্ড ফ্লাই, এসে জুটলো পঙ্গপালের ঝাঁক। আর এসে গেলো ছাউনির

কিচেন থেকে রাতের ভোজ্য—ডাল, মাংসের ঝোল, চাপাটি। যথা সময়ে রীতিমত ওগুলোও উদরসাৎ করলাম ভরপেট। করলেন পাঁড়েজী। করলো সকলে।

উদর পুরণ করলাম বটে, কিন্তু উদর করলো বেইমানি।

শুধু কি আমার? না, করেছে যোগীনদারও; আমার অপর সাথীদের ছাড়াও যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছে বয়োজ্যেষ্ঠ হাবিলদার পাঁড়েজীকে।

তবে স্বস্তির কথা, জ্ঞান দিয়ে গেছেন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী অফিসার মাঝরাত্রে রাউণ্ডে এসে। এখানকার হালচাল দেখে প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও, অভয় দিলেন সিডলিজ পাউডারের কথা শুনে।

অফিসারের কথায় ভাবনা কমলেও শক্ত হয়ে পড়েছে আজ হাবিলদার সাহেবের সামনে যাওয়া।

এখনও ক্ষীণ স্বরে তিনি শোনাচ্ছেন কথা।

শুনছিও অনেক কিছু।

বলছেন,—আমি নাকি খুনে—একটা আস্ত খাজা, এমন কি মূর্খতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করে আমি চলে গেছি নাকি অনেক দূরে।

পাঁড়েজীর অবস্থা দেখে মায়া হওয়া স্বাভাবিক। তাই, দোষস্খালন করবার ইচ্ছে থাকলেও নীরব হয়েই রইলাম।

রাতভোর উভয় ডিউটী করে ক্লান্ত বোধ করলেও রাগটা পড়লো মুরুব্বির ওপর।

চড়া ভাবে বললাম তাকে—ত্থাখো যোগীনদা তোমার ওরকম একগুঁয়েমির জন্যে আমি কথা শুনবো কেন? আচ্ছা, সবুর কর, একটু চাঙ্গা হয়ে নি, এর বিহিত আমি কোরবই কোরব।

বেশী কথা কাটাকাটি করবার শক্তি তারও নেই। কিন্তু এখনও রোখ আছে।

দেখছি শুয়ে শুয়েই সে আস্তিন গোটায়। তিরিক্ষি মেজাজে বলে, বেশ তাই হবে, ঠিক আছে।

এগারো

পল্টনের জবর কাজ হুকুম করা—হুকুম মানা। ও-দুটোকে ঠিক মত বজায় রাখতে পারলেই বাজি মাত।

যতদিন এসেছি, শুনছি কেবল হুকুম আর হুকুম। হুকুম করার ক্ষমতা আমার না থাকলেও দক্ষ আমি তামিল করতে।

করছিও তাই।

বুঝেছি হুকুমটা মেনে চলা সহজ, করা শক্ত। ছেঁকে ধরে যেন—মায়া, দয়া, চক্ষুলজ্জা। তা ছাড়া এই হুকুমদারি নিয়েও বাধে গণ্ডগোল। অনেক কিছু ঘটে যায় এই বড়-ছোট নিয়ে। অসম্ভব নয় মন কষাকষি,—এমনকি হত্যাকাণ্ড।

এতদিন বাদে এই হুকুম নিয়েই দেখছি দ্বন্দ্ব। ছোটখাটোদের মধ্যে নয়। বেধে গেছে ওপর তলায়।

লড়াই বেধেছে দুই কর্ণেলে। বেধেছে নকল যুদ্ধের মহড়ার আদেশ করা নিয়েই।

জেদ ধরেছেন আমাদের কর্ণেল, বলছেন—হুকুম করবো আমি,—আমিই ডাইনেওয়ালা কর্ণেল।

এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্ট কর্ণেল গর্জন করে বলেন,—না, ওসব চলবে না, আমিই বড়। আমি এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্ট—অতএব কম্যাণ্ড করবো আমি।

গড়ালো অনেকদূর।

বন্দী করলেন এরিয়া কম্যাণ্ডাণ্ট আমাদেরই কর্ণেলকে। তবে গারদে নয়। থাকবেন তিনি ছাউনিরই মধ্যে। বজায় থাকবে অফিসারেরই ইজ্জত। শুধু পারবেন না এখন হুকুম চালাতে। বন্ধ রাখতে হবে প্যারেড মাঠে যাওয়া,—স্যালিউট নেওয়া।

কর্ণেলও জবরদস্ত। শুনিয়ে দিলেন তেজীয়ান হয়ে, কী, ওপন এরেষ্ট? বহুত আচ্ছা, বলে, সংগে সংগে খুলে দিয়েছেন বুক-কোমরের বেল্ট। আরজি জানিয়েছেন জেনারেল হেড-কোয়ার্টারে।

কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমাদের কিন্তু প্রাণ খোয়া যায়নি, বরং প্রাণ পেলাম।

দেখতে দেখতে জমজমে হয়ে উঠেছে ল্যাট্রিন। এখানেও আছে একত্রে পঞ্চাশ জোয়ানের মত বসবার স্থান। তবে বাগদাদে সামনে না থাকলেও, ছিল পাশে পর্দা। এখানে কিন্তু অন্তর্ধান হয়েছে পাশেরটাও। এখন আর নই আমরা পর্দানশিন। একটু একটু করে নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের চোখের পর্দা।

এখন স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট চক্কর দেয় পঞ্চাশ সৈনিকের হাতে। চলে কতো হাসি ঠাট্টা—ক্যাপটেন, মেজরের দাপটের কথা।

শুনছি, দুই কর্ণেলের গুঁতো-গুতির কথা। তাই, এখন নিত্য নতুন ছাড়াচ্ছে রিউমার।

এবার নতুন করে রটলো,—আমরা কিনা নড়বো, সরে যাবো নাকি এই আজিজীয়া ছেড়ে। বলে,—প্রেসের খবর ভেস্তে গেলেও,—ঝুটা হয় না ল্যাট্রিন রিউমার।

দেখছি, হলও তাই।

শুনছি ওপর থেকে হুকুম এসেছে, রাখবেন না আর দুই কর্ণেলকে একই জারগায়। আবার হবে নাকি তাঁবু গুটোনো—বাঁধা-ছাঁদা। আস্তানা নিতে হবে নতুন জায়গায়। সেখানেও তাঁবু খাটিয়ে হবে ছাউনি পত্তন। হবে নতুন করে ল্যাট্রিন তৈরি।

পাগলা ঠাকুরদা এতদিন যেন মুশড়ে ছিলো। এবার চাঙ্গা হল। এখন সে বেশ আছে। শুয়ে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে তার দিনগুলো। তাকে নাকি ফতোয়া দিয়েছেন আমার ক্যাপটেন—তার ডিউটি বন্ধ, প্যারেড বন্ধ। এখন সে ঘোরাফেরা করে লাংগারখানার ধারে। বাকি সময় মাছি মারার বুলি ছাড়ে। তবু সে এই আজিজীয়ার ওপর বেজায় বিরূপ। এখানে তার নাকি ওষ্ঠাগত প্রাণ। আজও সে ভোলেনি টাইগ্রীসে স্নান।

হ্যাঁ, সত্যিই জিত হল? মিথ্যে হল না ল্যাট্রিনের গুজব।

সুবেদার মেজর শোনালেন খবর। হুকুম হল নড়বার। ছাউনি ভাঙবার, তাঁবু গোটাবার—মিউল সাজাবার।

সময় পেলাম মাত্র একদিন! এই একদিনের তোড়জোড়েই এসে হাজির আরও পঞ্চাশ মাইল নিচে, এই টাইগ্রীসের পূর্ব পাড়ে। এসেছি সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত জায়গা, কুত বা কুত এল্ আমারায়।

বিরাট না হলেও, দেখছি খেজুর গাছে ভরা ছোট শহর। আছে নারী-শিশুর দল, যাযাবরের ছাউনি, কাঁকুড়কাঁকড়ির ক্ষেত, যষ্টিমধুর ঝোপ।

দেখছি মরুর বুকে যাওয়া আসা করছে সওয়ারি বোঝাই উট,—মাঠে চরছে গাধা-দুম্বার দল।

এই!—এই সেই অভিশপ্ত কুত?

এইখানেই হয়ে গেছে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ?

শুনেছি, কতো সৈনিক প্রাণ হারিয়েছেন এইখানেই,—এই কুত এল্ আমারায়। বাদ যায়নি নাকি কেউ। কি ইংরেজ, তুর্কি, জার্মান, ভারতীয়, আরব-ইজিপ্‌সিয়ান। হয়ে গেছে নাকি হত্যার তাণ্ডবলীলা মাত্র বছরখানেক আগে। এখনও চারিদিকে পড়ে আছে তার কতো চিহ্ন—কতো কঙ্কাল। সহজেই অনুভব করা যায় লড়ায়ের বিভীষিকা। আজও আকাশ বাতাস যেন ব্যথায় ভারাক্রান্ত।

এইখানেই আমাদের বেঙ্গল এম্বুলেনস্ কোরের দল বন্দী হয়েছিলেন তুর্কি আস্কারদের (সৈনিকদের) হাতে। প্রাণ দিয়েছেনও কেউ কেউ। এই কুখ্যাত কুতে।

আজ মনে পড়ে কতো পুরোনো স্মৃতি। সেই উনিশশো পনের সাল।

দেখেছিলাম সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে তাঁদের মহড়া। এখনও মনে আছে,—বোমা ফেটে জখম হল সৈনিকের দল, ষ্ট্রেচার নিয়ে দৌড়ে গেল এম্বুলেনস্,—ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিলো হাসপাতালে।

এক মনে দেখেছিলাম তাঁদের মহড়া। দেখেছিলাম শৃঙ্খলার সংগে ক্ষিপ্রতা। নেচে উঠেছিলো আমার মন, কিন্তু বয়সের নাগাল না পেয়ে থামতে হয়েছিল ঐখানেই। তবু যেতে ছাড়িনি তাদের ছাউনিতে। দূর থেকে দেখতাম তাঁদের কুচকাওয়াজ চলাফেরা। আনন্দ পেতাম প্রচুর। যে দিন তাঁরা চলে গেলেন মেসোপোটেমিয়া—আজও স্পষ্ট মনে আছে।

তাঁবু খাটানোর পর্ব, আর যা কিছু সবই করা হয়েছে এ ক'দিনেই। নদীর পুর্বদিকে পণ্টুন-ব্রীজের কোল ঘেঁসে তৈরি হল হেড কোয়ার্টার ছাউনি। এখানকার গুরুত্ব আছে যথেষ্ট, তাই ব্যবস্থাও আছে অনেক কিছুর। এখানে ফৌজের সংখ্যাও বেশী।

মাইল দেড়েক দূরে গুর্খা পল্টনের ছাউনি। ওদের থেকে আরও মাইলখানেক উত্তর-পুবে রয়েছে ইংরেজ পল্টন ডেভন্-সায়ার। তা ছাড়া এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে হাসপাতাল, যুদ্ধবন্দিশালা, রসদ ও গোলাগুলির ঘাঁটি। এ ছাড়া রয়েছে আরও কতো কি। যা কিছু সবই নদীর এপারে। ওপারে মাইল বারো দূরে কুত-এল্-হাই নামে একটা ছোট শহর থাকলেও জলের খুবই অভাব। সেট-এল্-হাই নামে একটা খাল যদিও ওপারে আছে, তবে সেটা গরমকালে একেবারে শুকনো।

এখান থেকে হিল্লা ও ব্যাবিলন মাত্র পঁচাত্তর মাইল।

এই মরুর ওপর একমাত্র উটচলার মত কাঁচা রাস্তা থাকলেও, জলের অবস্থা সেই একই। খুবই কষ্ট জলের।

ব্যাবিলনের উত্তর পুবে কয়েকটা সাত-আট মাইল লম্বা লেক বা জলা থাকলেও তাও প্রায় শুকনো।

ছাউনির মাত্র আধ মাইল উত্তরে ছোট্ট এই শহর কুত।

সৈনিকদের শহরে যাবার হুকুম না থাকলেও আমার অফিসারের বরফ আনবার ছুতো করে ফেটিগ-ডিউটী নিয়ে এরই মধ্যে ঘুরে এসেছি বার তিনেক।

দেখবার মত জাঁকালো তেমন কিছু না থাকলেও, আজিজীয়া থেকে এখানে এসে ফিরে পেলাম দৃষ্টিশক্তি। সবই লাগলো নতুন।

দেখলাম উটের দলকে অপেক্ষা করতে বোরকা পরা যাত্রীদের নিয়ে,—যাবে মরু পথে,—হয়তো সেখসায়াদ, বা আলি-এল্-গরবি,—কিংবা যাবে কোনও বেদুইন ছাউনিতে।

দেখলাম আরব-ইরানীর দোকানে খেজুর পাতার তৈরি খাটিয়া, টেবিল, চেয়ার দোলনা,—ঝুড়ি, ঝাঁটা, পাখা ছাড়া আরও কতো রকম খেলনার জিনিস। সবই খেজুর গাছের দান—কুতের কারিগরের বাহাদুরি।

শহরের মধ্যে আছে দুটো মসজিদ, গোটা দুয়েক চুল কাটার ঘর, ডজনখানেক কাফিখানা, খেজুর-খুবুশের দোকান, কাঁচা-পাকা মিলিয়ে শ'খানেক বাড়ী, আর দেখলাম নদীর ধারে জ্বালানী কাঠের দোকানে উঁচু করে সাজানো রয়েছে মাটি খুঁড়ে বার করা গাছের শিকড়ের এক-একটা মোটা তাল।

অবাক হলাম শিকড় দেখে। গাছ নেই এদেশে,—আছে কিন্তু মাটির নিচের ঐ শিকড়।

এখানেও সুরু হয়ে গেল,—শালগম সেদ্ধ, খিচুড়ি। সেই সংগে রাতের পর রাত চললো আজিজীয়ারই মত গার্ড-ডিউটী। হেড-কোয়ার্টার ক্যাম্পে জাঁকিয়ে বসার সংগে সংগেই একটা প্লেটুনের (৬৫ জন) ওপর হুকুম হল নদীর ওপারে চলে গিয়ে পণ্টুন-ব্রীজকে রক্ষা করবার। এ ছাড়া একটা পুরো কোম্পানি (২৫০ জন) চলে গেল ১৬ নম্বর রিডাউট-ক্যাম্পে।

সেখানে থেকে ব্লকহাউস ডিউটী করাই হবে তাদের কাজ। মোটের ওপর এখানে আসামাত্র পণ্টনকে ভাগ করে দিলো নানান্ দলে,—ছড়িয়ে পড়লো সকলে এদিক ওদিক।

আমার কিন্তু উপায় নেই অন্য ছাউনিতে যাবার। সর্বদাই থাকতে হয় আমার অফিসারের সংগে। এখন রাতে পাহারা দেওয়া থেকে ছাড়ান পেলেও,—প্যারেড করি। নানারকম ফরমাশ শুনি। তাঁর জন্যে আরব-ইহুদির দোকান থেকে কিনে আনি ফুটি, শশা, তরমুজ। সব শুদ্ধ তাঁকে ধরে দিলেও আজও আমার জোটে প্রসাদ। আমিও সুবোধ ছেলের মত কথা শুনি। তাঁর মর্জিমত দুপুর রোদে রাউণ্ডার খেলি, বক্সিং লড়ি, লেবেল না দেখে মাংস খাই। আবার রাতের দিকে আমাকেই শ্রোতা করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন। শঙ্করাচার্যের শ্লোক ছাড়েন। গীতার ব্যাখ্যা শোনান।

আমি শুধু হাই তুলি,—উসখুস করি। লক্ষ্য রাখি কেবল লাইট্‌স্ আউট বিউগিল কলের।

বেসামরিক দোকান ছাড়া মিলিটারীর তরফ থেকে চালু করা দোকান, এক্‌স্‌পিডিসানারী ফোর্স ক্যানটীনকে সহজ কথায় বলি—ই-এফ-ক্যানটীন।

আমাদের এই হেড-কোয়ার্টার ক্যাম্পের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল দূরে ফেঁদে বসেছে নতুন দোকান—ই-এফ-ক্যানটীন। দোকানের মালিক, সরকার বাহাদুর,—বিক্রি করে গোরা সৈনিকের দল।

হাতে টাকা পয়সা যখন থাকে না তখন চেনা জানা সাথীর ঘাড়ে চেপে খাওয়ার 'অভ্যাসটা শুধু আমার কেন, অনেকেরই আছে সাথীদের মধ্যে। খাবারের ওপর হাত বাড়ালে রেওয়াজ নেই বাধা

দেবার। এটা ফৌজীদের একটা প্রথা হলেও সীমাবদ্ধ থাকে তার নিজের দলটুকুরই মধ্যে। ব্যতিক্রম ঘটে শুধু জলের বেলায়। এভাবে খাওয়াকেই পল্টনের কথায় বলে—রেঁাদিয়ে খাওয়া।

আজিজীয়ায় মাইনের টাকার মূল্য বিশেষ ছিল না। মাত্র একটি বেসামরিক দোকান ছিল সম্বল। এখানে এসে হাতের কাছে দোকান পেয়ে মাইনের টাকা খতম হয়ে গেল মাত্র চার দিনেই, কেবল টিনে ভরা মাছ—স্যামন, সার্ডিন খেয়ে। এখন কপর্দকহীন হয়ে ভাবছি কার ওপর চাপবো। সকলেই তো আমারই মত হুশিয়ার।

সামনে যেতে দেখছি হারান ওরফে হরাকে। একই দিনে রংরুট হয়ে গাড়ীতে চড়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। লম্বা দোহারা শরীর। একটু তোতলা, কথা বলে তাড়াতাড়ি। মনটা সাদা, বোঝে না ঘোর প্যাঁচ। বাঙলা ভাল জানলেও, জানে না ইংরেজী। বড় সখ ইংরেজীতে কথা বলে কিন্তু আজও হদিশ পায়নি কি প্রকারে ওটা আয়ত্তে আসে। আমি ও বিষয় তেমন ঝানু না হলেও চালিয়ে আসছি কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে। যখনই গোরাদের সংগে মজলিস বসে, সেও থাকে আমাদের সংগে। গোরা প্রীতি ওর কিছু বেশী।

তার এ দুর্বলতা আমি জানি। মনে মনে মতলব ভেঁজে জিগ্যেস করলাম—কিরে হরা কোথায় যাচ্ছিস? আজ ডিউটী নেই?—বাড়ীর চিঠি পেয়েছিস?

কাছে এসে বসে। কথা হয়,—বাড়ীর, ডিউটীর—শালগম সেদ্ধর।

দু'চার মামুলি কথার পর কথা পাড়লাম—হ্যাঁরে, ইংরেজী কেমন শিখলি? দু'চার কথা বলতে পারিস?—শিখেছিস কিছু?

জবাব দেয় উৎসাহের সংগে—তা, দু'একটা শিখিছিরে, তবে ঠিক হচ্ছে কিনা কিছুই তো বুঝতে পারি না।

বললাম—কেন?

হতাশের সুরে বলে,—কী করেই বা শিখবো বল,—কেই-ই বা শেখাবে। সহানুভূতি দেখিয়ে বলি,—তা যা বলেছিস, ছাখ হরা, হা হুতাশ করলে চলবে না, চেষ্টা করতে হবে সব সময়, বেশ কয়েকবার ঠোক্কর খাবি, তবে তো শিখবি। এ্যাদ্দিন যদি আমার কথা শুনতিস—কোন কালে শিখে যেতিস।

আগ্রহ দেখিয়ে হরা বলে—না ভাই, আমি সব শুনবো—বল না, কী করলে হবে?

বললাম—বেশ, বলি তবে শোন। ইংরেজী বলতে হলে দরকার গোরাদের সংগে কথা বলার। যখন তখন ছুতোনাতা করে মেলামেশা করবি ওদের সংগে। তেড়ে ফুঁড়ে কথা আউড়াবি ইংরেজীতে। বার কয়েক মোলাকাত করলেই দেখবি ঠিক হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে—কিন্তু বলবো যে, যদি ভুল চুক হয়? বড্ডো ভয় হয় ভাই—লজ্জাও করে।

আশ্বাস দিয়ে বলি—কিচ্ছু ভয় নেই, ভুল টুল হলে লজ্জা কিসের রে? তুইতো তবু ওদের বুলি দু'চারটে ছাড়তে পারছিস, ওরা পারে কী আমাদের একটা কথাও বলতে? যা, উঠে পড়ে এখনই চলে গিয়ে, একবার না হয় পরখ করে ছ্যাখ—সস্ত সস্ত বুঝতে পারবি কেমন শিখেছিস।

হরা যেন সাহস পেলো। ব্যগ্র হয়ে বলে—তা, যাবো যে, কিন্তু, আশেপাশে গোরা কোথায়?

আমিও ঠিক মুখিয়ে ছিলাম। বললাম—কেন, ঐ তো রয়েছে ই এফ ক্যানটীন, ওটাতে তো জিনিস বিক্রি করে গোরারা। যা, কিছু সওদা করবার ছুতো করে ওখানেই চলে যা ইংরেজীও বলবি, জিনিসও কিনবি।

আগ্রহের সংগে বলে উঠলো—তা ভাই, বেড়ে বলেছিস।

ওর ভাবগতিক দেখে আমারও উৎসাহ বাড়ে। আবার সুরু করি বাতলাতে।

তবে আর দেরি কেন? মনে মনে কথাগুলো ভেঁজে, উঠে পড়।

একটু ভেবে বলে—তা ভাই, আমি না হয় বলবো, কিন্তু তোকেও সংগে থাকতে হবে।

কিছুমাত্র গরজ না দেখিয়ে রাজী হয়ে বলি—তা না হয় যাচ্ছি—চল।

নানারকম ভজন-ভাজন দিয়ে ওকে তো নিয়ে চলেছি ক্যানটীনের দিকে। পথে সুরু করলো—আচ্ছা ভাই, কি কিনবো বলতো? হ্যাঁরে, ওরা নাকি বিফ বেচে?

জিভ কেটে বলি—দূর পাগলা, বিফ বেচবে কেন রে। ওটাতো ওদের দু'চোখের বিষ, ঠিক আমাদের শালগম সেদ্ধর মত, ওকথা ছেড়েদে।

ঠিক করেছি ওকে দিয়ে আনারসটাই কেনাবো, ওটা খেতেও ভাল।

বললাম—তুই কিনবি আনারস, বলবি পাইনাপল।

হরা সংগে সংগে চোখ কপালে তুলে বলে—না ভাই, অত বড় কথা আমার বেরোবে না, ওটা বেজায় খটমট, তার ওপর আমি তোতলা। সোজা কথা তুই বাতলা।

আচ্ছা বেশ, পাইনাপল না হয় ছেড়েদে—বোলবি এ্যাপ্রিকট।

তা হলেই হয়েছে। না ভাই, ওসব কটফট না। ত্থাখ, আমি বরং বলবো জ্যাম, বেশী ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই—কী বলিস?

দেখছি জ্যামটাকে বেজায় আঁকড়ে আছে। রুটি নেই, শুধু জ্যাম চালাবো কি করে। একটু চিন্তা করে বার করলাম সহজ কথা। খেতেও ভাল, বিনা রুটিতেই চলবে।

ওর হাতে হাত ভিড়িয়ে বললাম—আচ্ছা শোন, এবার ঠিক হয়েছে, অত ফ্যাচাংএ কাজ নেই, জ্যাম-ট্যাম ছেড়েদে, ওসব মামুলি কথা—তুই বলবি, পিচ, কীরে, এটা খুব সহজ না?

হরা আর কোনও জবাব না দিয়ে বিড়-বিড় করে কথাগুলো ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকে পড়লো ক্যানটীনে। সে আছে আগে, আমি পিছনে।

পাইন কাঠের প্যাকিং-কেস দিয়ে র‍্যাকের মত সাজানো সমস্ত তাঁবুটা। তারই মধ্যে সার সার বসানো, রংবেরঙের কৌটা। কোন র‍্যাকে-বা কাঁচের বোতল। সবই যেন একই রকম। তফাৎ শুধু ছোট বড় সাইজ—রকমারি নাম। রয়েছে অনেক কিছুই। স্তামন, সার্ডিন তো আছেই, তাছাড়া যেন তাকিয়ে আছে বেক্‌ড-বিন, লবস্‌টার-ক্র্যাব। অভাব নেই পিচ, পিয়ার্স মারমালেড। আনারস প্রচুর। বোতলে ভরা সস্‌, লাইম-জুস, পিকিল, ভিনিগার। তাইতো এতো জিনিস। এত চমৎকার প্যাকিংএর গন্ধ। চোখের পাতা আর নামে না। ফ্যালফেলিয়ে দেখছি একের পর এক।

তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করতে গিয়ে হরার এসে গেল তোতলামি। ভুলে গেল পিচ। কোন রকমে বলে—হা—হা—হাবু গট্‌ জ্যাম?

মজুত ছিল না জ্যাম। জবাব দেয়—নো, সরি।

মক্কেল আমার দমে গেলো। তার হতাশ ভাব দেখে আমিও হই চঞ্চল। ভাবছি,—এইরে, থ্যাঙ্ক ইউ বলে বুঝি বেরিয়ে আসে বাইরে। শিকার বুঝি ফসকে যায়।

তাড়াতাড়ি তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলি—ওরে, ঐ তো রয়েছে—বল না?

সেই সংগে কায়দার ওপর ইশারায় দেখিয়েদি একটা কৌটো। দেখতে একই রকম—অবিকল জ্যাম।

হরা আবার ছাড়ে ইংরেজী। টিনটাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করে—হো—হো—হোয়াটস্—ছাট্ প্লিস্?

গোরা ভায়া কৌটোটা নামায়। এগিয়ে দিয়ে বলে—সসেজ।

গলা চেপে জিগ্যেস করে হরা—সসেজ কী জিনিস রে?

সসেজের সংগে যোগাযোগ আজ পর্যন্ত না হলেও, হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় বিজ্ঞের মত বলি—ওঃ গ্র্যাণ্ড, ফার্ষ্ট ক্লাশ জিনিস—নিয়েনে আর দেরী করিসনি। এবার বলে ফ্যাল—অল্ রাইট্, গিভ্-মি-সসেজ।

সসেজের কৌটো হাতে নিয়ে যথা সময়ে শেষ করলো হরা—হা-হা হাউ মাচের পর্ব। পয়সা কড়ি মিটিয়ে দিয়ে ক্যানটীন থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে—হ্যাঁ ভাই কেমন বললাম রে?

বাহাদুরি দিয়ে বলি—আরে তুই তো এগিয়েছিস অনেক। আর বার কয়েক ক্যানটীনে এলে দেখবি, সত্যি মেরে দিয়েছিস।

কৌটোটা হাতে নিয়ে তো চলেছি হরার সংগে কেবলই মনে হচ্ছে—জিনিসটাতো বাগালাম কিন্তু এই সসেজ ব আবার কী! তবে যে খাবার জিনিস, তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। আগেই পড়ে নিয়েছি, তাজা, সুস্বাদু, বলকারক। যাক তা-ই যথেষ্ট। এখন কোনও প্রকারে লেটার বক্সে চিঠি ফেলার মত জঠরে পুরে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাছে আর কেউ ভাগীদার জোটে, সেজন্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম একটা শেল্‌হোলের (কামানের গোলা ফেটে গর্ত) ভেতর। টিনকাটার দিয়ে খুললাম ঢাকনি। দেখছি, ইঞ্চি তিনেক লম্বা পান্তুয়ার মতো কী এক ধাঁচের খাবার।

অবাক হয়ে জিগ্যেস করে—এগুলো কী রে? খাবার জিনিস তো?

ভরসা দিয়ে বলি—হ্যাঁরে হ্যাঁ, খাবার জিনিস নয়তো কী, এই ভাখ না লেখা—পুষ্টিকর ছাড়া আরও কত ভাল ভাল কথা।

এবার ব্যস্ত হয়ে বলে—ওরে, এটা পান্তুয়া নাকি রে?

আগে খেয়ে দেখি, তবে তো বলবো।

আগ্রহের সংগে একটা মুখে দেওয়া মাত্র তাকালাম হরার দিকে। সেও মুখটা বিকৃত করে তাকায় আমার দিকে।

তাইতো এ আবার কি খাবার ? না স্বাদ, না বিস্বাদ, ঝাল, নুন, টক, তেতো মিষ্টি কোন রসে রসাল নয় !

হরা চিবোয় আর আমার দিকে তাকায়। থেকে থেকে বলে, কি খা-চ্ছি-রে ?

তার কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ খেয়ে চলেছি আমার ভাগের কটা। কি খাচ্ছি ঠিকমত না বুঝলেও, ধরে ফেলেছি, মাংসেরই একটা কিছু। তবে প্রশ্ন জাগছে—কিসের মাংস !

সে খাচ্ছে তার ভাগের কটা, রাগ ছাড়ছে আমার ওপর।

হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—কী-রে চুপ করে আছিস যে—বল না কী খা-চ্ছি।

খুশি করবার জন্যে বলি—মাংসের পান্তুয়া।

চার চারটে মাংসের পান্তুয়া খেয়ে পেটটা ঢাউস হয়ে গেলেও সমস্যা রয়ে গেলো—খেলাম কি।

খালি কৌটো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শেল হোল থেকে। হরা চলেছে আর গজগজ করছে। বলে, না, আমি ছাড়বো না।

তোকে বলতেই হবে—কি খেলাম ! ধ্যাৎ, মুখটা যেন বোদা মেরে গেল, পয়সা খরচ করে এমন খাবার কেউ কেনে।

এ বিষয় সম্পূর্ণ একমত হলেও আছি বোবা হয়ে। মন ফেরাবার জন্যে তারিফ করতে লাগলাম তার ইংরেজী বলার। বললাম— দেখ ভাই, আমিতো কল্পনা করতে পারিনি তুই এতোটা শিখিছিস। কেমন ষ্টাইলের ওপর বললি কিনা—প্লিজ।

এবার একটু যেন নরম হল। বললে—তুই ওটা শুনেছিস ?

শুনেছি বৈকি, শুধু আমি কেন—ওরাও তো শুনলো !

মন পাবার জন্য আরও বলি—ছাখ, এবার টাকা পেলেই আবার তোর সংগে করবো যোগাযোগ। যাবো ক্যানটিনে। আবার তুই ইংরেজী ছাড়বি। তবে এবার কিন্তু আমিই দেবো জ্যামের দাম। কি বলিস, খুশি ?

হরাকে সন্তুষ্ট করে গুড-বাইতো করলাম। কিন্তু মাথায় ঘুরছে খেলাম কি। জ্ঞান সঞ্চয়ের আশায় খালি কৌটো হাতে নিয়ে হাজির হই আমার অফিসারের সামনে।

ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করি—স্যার এটা আজ খেলাম যদিও কিন্তু বুঝলাম না কিসের মাংস।

জ্ঞান চক্ষু খুলে দিলেন। বললেন, জানবার প্রয়োজন নেই সসেজের বংশাবলী। আগেই তো বলেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে চল আছে সব মাংসের। তবে একটু অবাক হলেন, বিনা রন্ধনে উদরস্থ করেছি জেনে। আরও জানালেন মাংসের তৈরী উপাদেয় এই সসেজ, ভেজে খেলে নাকি নির্ঘাত কাবাব।

কাবাব! দিব্যি করলাম মনে মনে, সসেজের সমাধি না করে সামনের মাসে টাকা পেলেই প্রথমেই পরখ করবো সসেজরূপি কাবাব খেয়ে। অবশ্য ভেজে। অতএব, এখন থেকেই অপেক্ষায় রইলাম মাস মাইনের দিন গুনতে।

বেশ কিছুদিন একত্রে কাটাবার পর এবার ছাড়তে হল আমার অফিসারের তদারকি। শুনলাম উপদেশ। আমার নাকি কোম্পানির তাঁবুতে ফিরে যাওয়া একান্ত দরকার। উচিত, সবরকম হুকুম তামিল করে কঠিন পরিশ্রম করা। তাতে নাকি আখেরে ভাল। খুলে যাবে প্রমোশনের পথ। এভাবে দিনের পর দিন কাটালে ওপথে নাকি অনেক বাধা।

অতএব বুঝলাম—এখনই আমাকে তাঁর মায়া ত্যাগ করে আবার সেই আজিজীয়ার মত নরক গুলজার করতে হবে কোম্পানির তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুরুব্বির পাশে দরি-কম্বল পেতে দেখতে হবে তার হিকমত। দিনে রাতে খাটতে হবে ফেটিগ-ডিউটি। যেতে হবে গার্ড-ডিউটি।

আর কিছুমাত্র চিন্তার বোঝা না বাড়িয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সংগে ঘাড়ে তুলে নিলাম বিছানা কিটব্যাগ। রাইফেল, বেয়নেট, হ্যাভারস্যাক, জলের বোতল, কাঁধে ঝুলিয়ে কোম্পানীর তাঁবুতে এসে, মিশে গেলাম সাথীদের সংগে।

দেখছি বেশ সরগরম হয়ে আছে প্লেটুনের তাঁবু। দিব্যি ঠাকুরদার চলছে মাছি মারা। কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আজও আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে এল্‌-এম্‌ (লাল মোহন) তার যাত্রাভিনয়ের পার্টগুলো।

সে নাকি দেশে যাত্রা করতো। এখনও সে ভোলেনি তার যাত্রাপার্টির কথা। যখন তখন ভীম বা দশাননের পার্টগুলো অভিনয়ের

সুরে চীৎকার করে আওড়ায়। কথা বলে যাত্রার ঢঙে। এমন কি ডিউটিতে থেকে চ্যালেঞ্জ করে ঐ একই ছাঁদে। হুঙ্কারের সংগে দমক দিয়ে বলে—হুণ্ট—হু—কামস—দে—য়া—র।

এসে হাজির হলেও চিন্তা অনেক। মোটেই যে অভ্যস্ত নই কড়াভাবে চলায়। ভবিষ্যতে উঁচুতে উঠবার আকাঙ্খা মনকে ঘিরে না ধরলেও কাবু হয়ে পড়েছি শাস্তির চিন্তায়। ভয় হয়, কি জানি কোন ফাঁকে বুঝি কুনজরে পড়ি।

অভয় বাণী শোনালেন পাঁড়েজী। উৎসাহ দিলো সাথীরা। পরামর্শ যোগাচ্ছে যোগীনদা। বুঝলাম মাত্র কয়েক দিনেই, কোম্পানীর তাঁবুতে কত মজা, আমার অফিসারের চোখের আড়ালের কতো আরাম।

আগে সঙ্গীহীন রাতটা কাটতো আমার অফিসারের হিতোপদেশ শুনে। এখন কাটে সাথীদের ফষ্টি-নষ্টি, পাঁড়েজীর উপদেশ, আর যোগীনদার মন্ত্রণা শুনে।

যোগীনদা দেখায় লাইটস-আউট বিউগিল বাজার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপিচাপি সিগারেট খাওয়ার কায়দা। দোষারোপ করে সরকার বাহাদুরের, এই সিগারেট রসদ প্রসঙ্গে। উত্তেজিত হয়ে বলে—কেন কালো সৈনিকদের জন্যে এতো খেলো সিগারেট রেডল্যাম্প? আর গোরাদের বেলায় কিনা ওয়াইল্ড-উড্-বাইন্। এমন কি কাঁচি।

শুনলাম, ক্যাম্প হাসপাতালে গিয়ে সিগারেটের ভাপে ভার টেম্পারেচার তোলার কেরামতি। তারপরেই আসে ঘুমের কথা। বলে, একমাত্র হাসপাতালই নাকি ওটার আসল স্থান। তবে কিনা এই ফিল্ডের হাসপাতাল বেজায় কড়া।

সুখ্যাতি করে করাচির। গদগদ হয়ে বলে, আহা হাসপাতাল বলতে বুঝি করাচির ইণ্ডিয়ান ট্রুপস্ হাসপাতাল, আর ডাক্তার বলতে, ডি সুজা। যেন সাক্ষাৎ জননী। হাজির হলেই হুকুম—বেঙ্গলী ওয়ার্ড। বুক্ড হয়ে যায় বিছানা, কমসে কম সাত দিন। সে এক গুলজারি ব্যাপার। সকাল বিকেল গেলাস ভরতি দুধ, মগ ভরতি চা। মাছ মাংস সবই ছিলো। শুধু কি তাই? আসতো ফেরিওয়ালার দল, একেবারে ওয়ার্ডের ভেতর। দু'পাশের খাটিয়ার মাঝ সড়কে এসে হাঁকতো, চা, কেক্—মাখ্খোন রোটী। বিকেল হলেই দিব্যি পাজামা

বদল, সরে পড়া এদিক ওদিক। চলতো মরা নদীর কাছে উইণ্ড-মিলের ধারে হাওয়া খাওয়া বা জু-গার্ডেনে ঘোরাঘুরি।

কী বলছিস—বায়স্কোপ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ, তাও চলতো রে তাও চলতো।

সব শুনে জিগ্যেস করি—আচ্ছা যোগীনদা, তা-তো শুনলাম, কিন্তু ব্যারামটা কী?

জবাবে বলে—কী বললি, ব্যারাম? আরে, ওটা জানতেন ডি-সুজা। সে তো ডাক্তারের কাজ। তারপর বলে, কম্বল প্যারেডের কথা। কথার আর শেষ নেই। শুনছি কতো নতুন কথা।

উৎসুক হয়ে বলি—আচ্ছা, যোগীনদা অনেক কিছুই তো জানালে, কিন্তু তোমার ঐ কম্বল প্যারেডটা আবার কী? ওটাতো আগে শুনিনি।

জবাব দেয় অবাক হয়ে—সে কীরে, কম্বল প্যারেড জানিস না? কোথায় আছিস এদ্দিন।

হতাশের সুরে আমিও বলি, কেমন করে জানবো বল? তুমি তো আগে কিছুই বলনি।

সেও মুখের ওপর বলে—আরে সবকিছু কি বলা যায়, বিশেষ তুই যে ছিলি তখন অফিসারের।

গলা নামিয়ে বলে, আচ্ছা, আজ বলি তবে শোন। ওটা হচ্ছে বদমেজাজী, ত্যাঁদোড় অফিসারকে টিট করবার একটা মোক্ষম কায়দা। অন্ধকারে বা নির্জনে প্রভুকে সুবিধে মত পেলে—ব্যস, সংগে সংগে কম্বল চাপা দিয়ে জাপটে ধরে বেঁধে ফেলা। তারপর বেশ কিছুটা উত্তম-মধ্যম দিয়ে সরে পড়াকেই বলে—কম্বল প্যারেড।

এবার বুঝলি কম্বল প্যারেড কাকে বলে?

বললাম—তা বুঝলাম, কিন্তু তোমার ঐ কম্বলখানা যে পড়ে রইলো—ওতেই তো বেফাঁস হবে।

হেসে বলে—দুর বোকা,—কম্বল? সেটা তো অপরের।

বেশ কাটছে। এতোদিন বাদে আমি দিব্যচক্ষু পেলাম। ভাবতেও পারতাম না পুর্বে, কোম্পানির তাঁবুতে এত রকমারি কাণ্ড, এত আনন্দ, এতো মজা।

এবার হল আরও ভাল। চলে যাচ্ছি আরো দূরে, আমার অফিসারের সম্পূর্ণ নজরের বাইরে। হুকুম হয়েছে আমাদের প্লেটুনের ওপর, ১৬ নং ছাউনিতে বদলি হবার। তাই চলছে তোড়জোড়। যাবেন হাবিলদার পাঁড়েজী। যাবে নুটু, মণি, হরা ছাড়াও আমার মুরুব্বি যোগীনদা। সেখানেও চলবে দিনের পর দিন খিচুড়ি খাওয়া, রাতের পর রাত জেগে ডিউটী দেওয়া।

এই কুতের উত্তর-পুব কোণে তারের বেড়ার শেষ প্রান্তে ১৬ নম্বর রিডাউট ক্যাম্প। উত্তরে টাইগ্রীস। পশ্চিমে গোরা পল্টনের ছাউনি। দক্ষিণে প্যারেড মাঠ। মাঠের পরেই মাইল দুয়েক ফাঁকা। ওরই ফাঁকে আছে যুদ্ধবন্দিশালা, হাসপাতাল, লেবার-কোর, পোর্টার-কোর। পুবে আগাগোড়া তারের বেড়া। তার ওপারেই, পারস্যের সীমানা পর্যন্ত কেবল ফাঁকা মরুভূমি।

হেড-কোয়ার্টার ছাউনিতে অনেক কিছু ঝামেলা থাকলেও অভাব নেই নতুনত্বের। কুতের বাজারে ঘোরাফেরা করা সম্ভব হয়েছিল ঐ ক্যাম্পে ছিলাম বলেই। এখানে থেকে বাজার যাবার ফেটিগ-ডিউটীর আশা আদবেই নেই। কাজের মধ্যে কাজ, সকাল-বিকেল রাইফেল বেয়নেটের কসরত, মেসিনগান নিয়ে দৌড়ঝাঁপ আর মাস কড়ায়ের ডালের খিচুড়ি খেয়ে সারারাত মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থাকা। যে কোনও মুহূর্তে শত্রুর স্নাইপারের একটি মাত্র বুলেটে মর্তলোক থেকে পার হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও ভয় ভাবনার লেশ মাত্র নেই। চিন্তা শুধু,—গুলি ভরতি বেল্ট-ব্যাণ্ডোলিয়ার, বুট পট্টি এঁটে, রাইফেল আঁকড়ে, এই ১৩৬ ডিগ্রী গরমে ছোট্ট ব্লক-হাউসের মধ্যে আটকে থাকা। সেই সংগে কী প্রকারে দীজাজ বা বিয়াদ (মুরগি-ডিম) যোগাড় করা যায় তা খুঁজে বের করা। অবশ্য ওরই মধ্যে রকমফের হচ্ছে বৈকি।

এখন অবসর সময়ে আমাদের মধ্যে অনেকেরই চলছে রাতের অন্ধকারে মশারি দিয়ে মাছ ধরা। চলছে কাঁটাগাছ নেড়েচেড়ে খরগোস শিকার।

অনিলদা এখন গা ঢাকা দিয়ে প্রায়ই চলে যায় মরুর ভেতর। আরব মেয়ে দাহি-দাহি বলে হেঁকে গেলেই দিব্যি সে দই কিনে খায়। ঘোরাঘুরি করে যাযাবরের ছাউনিতে। আড্ডা জমিয়ে তাদের বাজনা শোনে, খেজুর-খুবুশ খায়।

আমিও খেয়াল মেটাচ্ছি পটলদারই চেলা হয়ে। ঘুরছি এই কুত্তের মাঠে। বয়ে আনি ফৌজীদের কঙ্কাল। কবরের মত গর্ত খুঁড়ে ভরতি করি মৃত সৈনিকদের হাড়, পাঁজরা, মাথা।

মিলিয়েদি হাতে হাত।

সবশেষে মাটি চাপা দিয়ে অভিবাদন জানাই এটেন্‌সন্‌ হয়ে, সোজা হয়ে, বুক চিতিয়ে, কায়দা মতন স্যালিউট ঠুকে।

বাকী সময়টা কাটে ছাউনির মধ্যে হুটোপাটি করে, আর প্রতিবেশী পল্টনের হাবভাব দেখে। কিন্তু হতভম্ব হয়ে পড়ি যখন দেখি এই গোরা সৈনিকের দল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে টাইগ্রাসে নেমে জলক্রীড়া করে।

কোনও ভারতীয় পল্টনকে এভাবে প্রকাশ্যে নগ্ন হয়ে স্নান করতে আজও দেখিনি।

দেখি আরও অনেক কিছু। এরা মাছ্‌ ধরার জাল বোনে। হুবহু আমাদের গাঁয়ের লোকদের মত খালি পায়ে, খালি গায়ে, নদীতে নেমে মাথার ওপর খেপ্‌লা জাল ঘুরিয়ে মাছ্‌ ধরে।

শিক্ষিত সৈনিক যথেষ্ট থাকলেও—খাজাও আছে। ধূমপান করে না এমনও আছে। অভাব নেই লাজুক ছেলের। মাঝে মাঝে আলাপ জমে প্যারেড মাঠে। বলে, বাড়ীর কথা—ভাই-বোনের, মা'র। দেখি জল ভরে যায় চোখে।

সেদিন জিগ্যেস করেছিলো ঐ লাজুক ছেলে—তোমার বাড়ী কোথায়?

বলেছিলাম, বেঙ্গল।

ভেবে বলে—নিয়ার হুইচ সায়ার?

বুঝলাম ভূগোলের জ্ঞান আমারই মত।

ভাল করে বোঝালাম। বললাম—ইউ নো ইণ্ডিয়া?

শুনে হয় খুশি।

হেসে বলে ইয়েস্‌, ইয়েস—আই নো ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া ইন্‌ বম্বে। ইজ ইট ইট?

উদরপরায়ণ যোগীনদা, খিটখিটে বদমেজাজী, ছোট বড় ধূম্রপানে অভ্যস্ত হলেও, লোক খারাপ না। মেজাজ তিরিক্ষি হলেও মনটা নরম, নেহাত অশিক্ষিতও নয়। খানদানী ঘরের ছেলে, কিন্তু বিটকেল তার রুচি।

মাঝে মাঝে বিগড়ে গিয়ে হয়ে পড়ে বড়ই একগুঁয়ে। বিশেষ রঙ্গিন অবস্থায় যখন বেসামাল হয়ে পড়ে।

তার এই একগুঁয়েমির জন্যে মুশকিলেও পড়তে হয়েছে অনেক সময়। করাচি থাকতে তাকে বেএখতিয়ার অবস্থায় এম-পির দিকে আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গিয়ে আস্ফালন করতেও দেখেছি। মিলিটারী পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েদি সেবার ফ্লোরার রেষ্টুরেণ্টে গা ঢাকা দিয়ে। রোল কলেতেও প্রক্সি দেয় বোকেন।

জব্দ হয়েছে এই ফিল্ডে এসে। বছর কাবার হয়ে গেল এই মেসোপোটেমিয়ায় কিন্তু আজও জোটেনি তার এক ফোঁটাও বেসামাল হবার দাওয়াই। এখানকার হাল চাল দেখে শুনে এখন সে নাকি হাসিসের খোঁজে ঘোরে। এমন কি অপর পল্টনের সাদা-কালো ফৌজীদের মধ্যেও আছে তার দোস্ত। এখন তাদের আড্ডা জমে ভাঙা ট্রেঞ্চে বা নদীর ধারে।

এসব ব্যাপারের জন্যে তার সংগে ঝগড়া করি। ডুয়েল লড়ি। নাক মুখও ফাটে। সেদিন মুটু, মণি, সুরথের সংগে জোট বেঁধে চ্যাংদোলা করে ফেলেও দিয়েছি তাকে কাঁটাবনে। সেও পাল্টে আমাদের চোখের মধ্যে ছুড়ে মেরেছে মুঠো ভরতি বালি। তারই ফলে, চোখে অন্ধকার দেখে শরণাপন্ন হয়েছি হাসপাতালের। কিন্তু গোপন করেছি ডাক্তার ক্যাপটেনের কাছে।

বলিনি আসল কথা। জানিয়েছি, মরুর ঘুর্ণি হাওয়ার মধ্যে পড়ে, চোখের মধ্যে উড়ে এসেছে ঘুরপাক খাওয়া তপ্ত বালি।

এত কাণ্ড ঘটে গেলেও মনের মধ্যে জমা করি না দুশমনি। দোস্তি হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই। আদায় করি খেসারত, দু'প্যাকেট

৯—খঃ ছা

প্যাটাকেক। মৌজ করে হাতে হাত ভিড়িয়ে পান করি চা। খুশ মনে আবার চলে আমাদের মধ্যে সাহায্যের আদান প্রদান। যেন আগে কিছুই ঘটেনি। অর্থাৎ আমাদের হাতের কাণ্ডকারখানাটা রয়ে যায় হাতের মধ্যেই, পৌঁছোয় না মনের কোণে। এইটেই তো ফৌজীদের রেওয়াজ।

যোগীনদা হাসিস্ সেবন করে, সে নেশাখোর। তাকে ভালবাসলেও, ওগুলোকে ঘৃণা করি। এসবের জন্যে অনেক সময় তার সঙ্গ এড়িয়ে চলি। কিন্তু কি জানি কেন, কোন ফাঁকে ঘুরে ফিরে এসে পড়ি ওরই পাল্লায়। তখন নতুন নতুন মতলব শোনায়, হুজুকে মাতায়।

আজ আবার গাবু-পিল হলাম। বিকেলে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম পুরোনো ট্রেঞ্চগুলোর ধারে। হঠাৎ মুরুব্বির দিকে নজর পড়তেই আমায় ডাকলো—এই শোন, এদিকে আয়, কথা আছে।

আমিও কাছে এসে বলি, তোমারতো যত সব বেয়াড়া কথা,—কী বলবে বল?

ইশারায় দেখিয়ে বলে—ওখানে অত ভিড় কিসেররে? কি হচ্ছে বলতো—চল না দেখি।

দেখলাম পুরোনো ট্রেঞ্চগুলোর মধ্যে বসে জনকয়েক গোরা ফৌজী গুলতানি করে কী যেন খেলছে।

খবর নিলাম। জানলাম; হচ্ছে ওদের স্মোকিং কম্‌পিটিসন্।

সামরিক, বেসামরিক হরেকরকম প্রতিযোগিতা দেখলেও, দেখিনি ধূমপানের। শুনলামও এই প্রথম। বুঝলাম, সৈনিকদের এও বুঝি এক নতুন খেয়াল। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওদের ধূমপানের খেলা।

একটা সিগারেটের শেষের দিকে প্রায়ঃইঞ্চিখানেক ওপরে চিহ্ন থাকবে একটা কালো দাগের। খেলা সুরু হওয়া মাত্র যে যার সিগারেটের মুখাগ্নি করে সুরু করবে টানতে। যে খেলোয়াড় সিগারেট ফুঁকে ঐ কালো দাগ পর্যন্ত আগে পোড়াতে পারবে, সে হবে প্রথম।

পুরস্কার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট—ভর্তি ফি চার আনা।

আমি এ বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শিখিনি ধূমপান করতে। আগ্রহও নেই মোটেই। বললাম মুরুব্বিকে—শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ

কি ?—যতো বাজে খেলা   তার চেয়ে ওদিকে চল, একটু ঘোরা ফেরা করি।

আমার কথার কোনও জবাব দিলো না। নিজের মনেই দেখতে লাগলো ওদের রকম-সকম।

ওর হাব ভাব দেখে একটু বিরক্ত হয়ে বলি—আমার কথা তো তুমি শুনবে না, তবু বলছি যোগীনদা, যদি ইজ্জত বাঁচাতে চাও তো ওর মধ্যে আর মাথা গলিও না। তুমি হাসিস্ (চরশ) খোর হলেও, ওদের সংগে তফাত অনেক। দেখছ না ওদের ঠোটগুলো কত পুরু—পোড়া পোড়া। ওরা এক এক জন পাকা সিগারেট খোর। সিগারেট সম্রাট বললেও অন্যায় হবে না। দোহাই যোগীনদা—এ আশা ছাড়ো।

আমার কথা শুনে রেগে গেলো। ধমক দিয়ে বললো—তুই চুপ কর, ডেঁপোমি করিসনি। আজ কাল দেখছি খুবই সবজান্তা হয়ে পড়েছিস। শোন, আমি যা করি দাঁড়িয়ে ত্থাখ, ওদের মত মদত দে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখার পর, মুরুব্বি এবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিকি বার করে বলে—আমায় নেবে তোমাদের খেলায় ?

আগ্রহের সংগে ওদের দলে নিলো। একটু টিট্‌কারিও দিলো। বললে—তোমরা কি পারবে ? ভারতীয়রা এ বিষয় যে খুবই কাঁচা।

যোগীনদা আর কোনও কথা কইলো না। তর্কা-তর্কিও করলো না। চুপচাপ যোগ দিলো ওদের দলে। শুধু বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে।

মুরুব্বির ওপর এ বিশ্বাস না থাকলেও, সহানুভুতির সুরে বলি—আচ্ছা বেশ, তাই হবে—লাগাও তো ওস্তাদজী, চালোতো একদান।

গম্ভীর ভাবে অপর প্রতিযোগীর মত সেও হাতে তুলে নিলো ঐরকম দাগ দেওয়া একটা সিগারেট, আর দেশলাই।

পুরোনো ট্রেঞ্চের মধ্যে গোল হয়ে বসে, ওয়ান, টু, থ্রী বলার সংগে সংগে সুরু হল সিগারেটের লড়াই।

খুবই উদ্দীপনার মধ্যে ফস ফস করে টানতে সুরু করেছে যে যার সিগারেট।

দেখলাম, যোগীনদাও তার সিগারেটটা চট করে ধরিয়ে ফেললো। নিমেষের মধ্যে বসিয়ে দিলো সেটাকে তার ডান হাতের পাঁচটা আঙুলের মধ্যে। যেমন করে কলকে ধরে ধুমপান করে ঠিক সেই ভাবে তার

সিগারেটটা ধরে বসলো উবু হয়ে। সংগে সংগে চোখ দুটো আধাবোজা করে বলে উঠলো—জয়, জয় বাবা ভোলানাথ।

এবার সুরু হল টান।

দেখছি তার সিগারেটটা চড় চড় করে পুড়ে চলেছে হাউয়ের মত। চারিদিকে দেখছি কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

সিগারেটের গন্ধে আর ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও, হলাম না পিছপাও। অপর জোয়ানদের মত আমিও উৎসাহ দিচ্ছি আমার খেলোয়াড়কে। ওরাও যেমন চিৎকার করে বলে—চিয়ার-আপ জিমি, জনি, নেলসন। আমিও ওদের গলা ছাপিয়ে বলি—সাবাস যোগীনদা, আরও জোরসে লাগাও টান, দেখবো হিন্দুস্থানের মান বাঁচাতে। জয় বাবা ভোলানাথ।

গোরাদের যখন মাত্র অর্ধেকটা পুড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বেবাক্ দাখিল করলো ওস্তাদজী তার সিগারেটের টিকিটুকু মাত্র তিন টান দিয়েই।

এবার ছাড়তে লাগলো ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে। ওরাও ছাড়ছে সমানে। অন্ধকারে ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যিই ভুলে গেছি আমি কোথায়। মনে হচ্ছে হুবহু যেন ফায়ারিং লাইন। দু'চারটে বোমা ফাটলে যে অবস্থা হয়, ঠিক সে'রকম দেখতে হয়েছে এই পুরোনো ট্রেঞ্চটা সেরেফ সিগারেটের ধোঁয়ায়।

মুখ তার হয়ে উঠেছে লাল। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভয় হয় তার দিকে তাকাতে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন ফায়ারিং লাইনে থেকে শত্রুদের ওপর চড়াও হয়ে কয়েক ঘণ্টা মেসিনগান চালিয়ে—এই মাত্র ফিরে এল ডাগ-আউটে ক্ষত-বিক্ষত দেহে।

খুবই হুল্লোড়ের মধ্যে শেষ হল ধূমপানের লড়াই। গোরাদের দলতো হতভম্ব। সকলেই বাহবা দিলো এই ভারতীয় ফৌজীকে।

আমিও উচ্ছ্বাসের সংগে বলে ফেললাম—সাবাস্ যোগীনদা, সুন্দর তোমার দেশপ্রেম। আজ তুমি ভারতীয় পল্টনের মান বাঁচিয়েছ, ভেঙেছ গোরাদের দম্ভ—জয় ওস্তাদজীর জয়, জয় হিন্দুস্থানের জয়।

আজিজীয়ায় দু'চারবার ব্লক-হাউস ডিউটিতে রাত জাগলেও এই যুদ্ধের ডিউটি পুরোদস্তর সুরু করেছি কোম্পানির তাঁবুতে এসে।

বহুদিন পর আবার যোগাযোগ হয়েছে এই ব্লক হাউসটিতে পাঁড়েজী, যোগীনদার সংগে। তাদের সংগে শেষ ডিউটি সেই আভিজীরায়। আজও ভুলিনি সিডলিজ পাউডারের সরবত পান।

মুরগি ফীষ্টের কথা পাঁড়েজী ভুলে গেলেও, মনে আছে যোগীনদার। আজ নতুন করে কথা পাড়লো। খেয়ালে আনলো পাঁড়েজীর। আমার শপথের কথা।

সকলের উৎসাহের সংগে বেড়ে গেল পাঁড়েজীর আগ্রহ।

খোলাখুলি জিগ্যেস করলেন আমায়—হ্যাঁ ভাইতো। কীহে, কি করবে? কাল ভোরে তবে কি মুরগির খোঁজ হবে?

বুঝছি, কাজটা খুব সহজ না। খুবই শক্ত। মুরগি জোটেতো পকেট ফাঁকা, যখন পকেট ভারী থাকে তখন দর্শন মেলে না মুরগির। আবার যখন খাপ খেয়ে যায় পকেটের সংগে মুরগির, তখন অভাব হয় পাঁড়েজী, যোগীনদার সঙ্গ লাভ। অসাধ্য ব্যাপার এই তিনটির মিলন।

সব ঝক্কি আমার ওপর জেনেও, কিছুমাত্র দমে না গিয়ে জবাব দিলাম—হ্যাঁ, তা হবে বৈকি, কিন্তু মুরগি কোথায়?

পাশ থেকে সাহস দিয়ে বললো যোগীনদা, তা হয়ে যাবে, ঠিক আছে।

গভীর রাত। নিস্তব্ধ মরুর ওপর ব্লক হাউসের ট্রেঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে নজর রাখছি তারের বেড়া—চিন্তা মুরগির। ভাবছি আয়োজনের কথা বললাম যদিও কিন্তু কি করে ব্যাপারটা সম্ভব হবে।

ট্রেঞ্চের ও পাশে মুরুব্বির সাড়া পেয়ে এক ফাঁকে চুপি চুপি কাছে আসি, ফিস্ ফিস্ করে বলি—কি উপায় যোগীনদা? কাল পাঁড়েজীতো ক্ষেপে যাবে, আমার সম্বলতো মাত্র দু'টাকা। বলি, টাকা পয়সা আছে? —ধার ছাড়বে? ধমক দিয়ে বলে—টাকা হাতে নেই তো রাজী হলি কেন?

বারে, তুমিই তো কথা তুললে, আবার বললে কি না—ঠিক আছে। তাতেই তো ভাবলাম, হয়তো হাত ভেড়াবে।

একটু কি যেন ভাবে। ভরসা দিয়ে বলে—যাক, তবে ঠিকই আছে। শোন, কাল ভোরে টাকা দুটো আমায় দিবি, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাত কাবার করে আবার ভোর। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি পান করে শেষ হল রাত ডিউটির পালা।

ব্লক হাউসের ভেতর, এক দিকে যেমন চলছে চায়ের আয়োজন, অপর দিকে আমার মুরুব্বি আছে মুরগির খোঁজে।

বসেছে, বেড়ার ধারে, তার জড়ানো ফটকের পাশে।

দেখছি নিত্যদিনের মত আজও আসছে আরব রফিগ-রফিগনীর দল। আসছে গাঁয়ের থেকে বেসাতি নিয়ে।

চলেছে কুতের বাজারে। কেউবা হেঁটে, কেউবা গাধায়, কেউবা আছে ঘোড়ার পিঠে।

আছে তুম্বা, আছে ভুট্টা, কাঁকড়ি খেজুর, কিন্তু নেই বিয়াদ (ডিম) —নেই দিজাজ (মুরগি)।

একের পর এক চলছে জিগ্যেস—রফিগ, দিজাজ (মুরগি) আকু?

জবাব আসে সেই একই কথা—মাকু রফিগ (নেই বন্ধু)।

একটু একটু করে কাটছে সময়, বাড়ছে রোদের তেজ। এখনও আসছে আরবের দল। আমি হতাশ হলেও, ধৈর্য্য হারায়নি যোগীনদা। একই ভাবে তার চলছে প্রশ্ন।

কানে এলো—আকু রফিগ। (আছে বন্ধু)।

দাম হাঁকে, সিত্তা কুলুশ। (সাত টাকা)।

শুনছি দর কষাকষি।

মুরুব্বি বলে—তেলাত্তা রুপি (তিন টাকা)।

আরব রফিগ দিতে নারাজ। জোরের সংগে আঁকড়ে আছে, সিত্তা কুলুশ।

হঠাৎ উভয়েই হল নীরব। উঁকি দিয়ে দেখি সওদা।

দেখলাম, ওস্তাদজী যেন ধরে দিলো তাকে একটা ছোট্ট পুঁটলি। আরবও সেটা নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয় গ্রামের পথে।

যোগীনদার কাছে আসতেই মুরগিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে—এই নে—যা, পাঁড়েজীকে দেখা।

সোজাসুজি জিগ্যেস করি—তা তো হল, কিন্তু পুঁটলি করে দিলে কী?

জবাব দেয়—কই, কিছুই দিইনি তো।

গলা ছেড়ে আমিও বলি, হ্যাঁ, দিয়েছো, আমি দেখেছি। সত্যি বল, কি দিলে ?

চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখে। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলে—চাল।

আঁতকে উঠে বলি—চাল! সরকারি রসদ দিয়ে মুরগি নিলে? ধরা পড়লে যে কোর্ট. মার্শাল, তা জেনেও তুমি এ কাজ করলে? না যোগীনদা, এটা তুমি ভাল করলে না।

আবার তার সেই চড়া ভাব। সুরু হল ধমকানি। আঃ, অত গলাবাজি করছিস কেন? খুব তো তালেবরের মত কথা শোনাচ্ছিস! তুই এতোটা উজবুক তা আমি জানতাম না, যদি হাজত হয়, তবে তোর জন্যেই হবে। ছাখ, তোর হিতোপদেশ আর সহ্য হয় না, সেই করাচি থেকে সুরু করেছিস, কেবল—ন্যায় আর নীতি। কি মনে করেছিস— ইস্কুল ?

আমিও এখন গড়ে উঠেছি। মুরুব্বির ধমকে কিছু মাত্র দমে না গিয়ে বলি, কেন বলবো না? সে দিন তুমি ঠকালে সেই দেহাতি মাছ ওয়ালাকে। বেচারি ইংলিশ কয়েন চেনে না, সেই সুযোগে তুমি সিকির বদলে দুয়ানি দিয়ে স্বচ্ছন্দে তুলে নিলে কিনা বোয়াল মাছটা! আজ আবার নিলে চালের বদলে মুরগি। ছিঃ।

তা বেশ, আর না হয় নেবো না। কিন্তু এও বলি, আমার বেলায় তুই তো অনেক কিছু অন্যায় দেখলি, আর ও যে বোয়াল বলে বেচে গেলো হাঙরের বাচ্চা—তার বেলায় ?

তা হোক, তুমি ভবিষ্যতে আর ও সব করবে না, এই আমার শেষ কথা।

বেশ, ঠিক আছে। তবে এটা তোকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমাকে তো শুধু চাল নিয়ে মুরগি নিতে দেখলি, কিন্তু পাশের পল্টনের ফৌজীরা কী করে তার খবর রাখিস কী ?

তারা ভেষ্ট-জার্সির বদলে ডিম নেয়, মশারির বদলে মুরগি খায়, আরও কতো কি নেয় দরি-কম্বলের বিনিময়ে তার বেলায় ?

মুরগি হাতে এলেও সমস্যা অনেক। অপর পল্টনের ফেলে যাওয়া পুরোনো টিন ক্যানেস্তারাটা বরাবর উনুনের কাজ করলেও, অভাব জ্বালানীর। তা ছাড়া, ঘী মসলার চিন্তা তো আছেই।

জুটে নিয়ে এলো মরুভূমির আধা শুকনো কাঁটা গাছ। মাইল দুয়েক দূর থেকে হরা আনলো জল। বাকি সব যোগাড় করলাম কাছেরই এক ছাউনি থেকে।

অনেক কিছু গুছিয়ে দিয়েছে ঐ লেবার-কোরের এক গোরা সার্জেণ্ট। সিগারেটের টিনে দিয়েছে ঘী। দুটো মাত্র আলু হলেও, প্রচুর পিঁয়াজ। দিতে ভোলেনি কারি পাউডার।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে মুরগি রন্ধন।

বেয়নেট খুঁচিয়ে বার করছি উনুনের ছাই, আবার সংগে সংগে নতুন করে ভরে দিচ্ছি কাঁটা গাছ।

কিছুক্ষণ উনুনের সংগে খোঁচাখুঁচি করলেই দপ্ করে জ্বলে উঠেই, মিনিট খানেক হয় আগুন, পরক্ষণেই দেখা দেয় ধোঁয়া।

একে এই একশো ছত্রিশ ডিগ্রী রোদের তাপ, তার ওপর ঘর ভরতি ধোঁয়া। এ সবের মধ্যে পড়ে যথেষ্ট নাজেহাল হলেও অভাব নেই উৎসাহের।

ঘণ্টা পাঁচেক ধুনির সংগে কসরত করে ডেকচির ঢাকনা খোলা হলেও, বিরক্তি নেই কারও। তবে কিছুটা চিন্তিত আমার মুরুব্বি।

ভেবেছিলো মুরগি ভোজের নিরিবিলি স্থান এই ব্লক হাউস, কিন্তু সে ভুল ভেঙে দিয়েছে, ভাতের ফেটিগের দল।

নিয়ম মাফিক ছাউনির থেকে আমাদের জন্যে এনেছিলো তারা দিনের ভোজ্য—খিচুড়ি। মুরগির আয়োজন দেখে আটকে গেছে তারা দুজনেই। দোহাই পেড়েছে রোদের।

আর ঐ লেবার কোরের গোরা সার্জেণ্ট ?

অন্যায় হবে, তার সময় জ্ঞানের তারিফ না করলে। এই দুপুর রোদে সেও এসে হাজির—টিপারারী গান গাইতে গাইতে।

টুপিতে আঁটা বিরাট সান্‌সেড, পিঠে স্পাইন-প্রটেক্‌টর, চোখে গগল্‌স্। বগলে তার বিরাট পাঁউরুটি, সংগের সাথী এক কর্পোর‍্যাল।

সত্যিই মজলিসি সার্জেণ্ট। আসামাত্র জমিয়ে দিলো আসর, বিলিয়ে দিলো রুটি। সুরু করলো গান। আর চললো মুরগি ভোজন।

এই ভরা দুপুরে খুবই আনন্দের সংগে শেষ হল এগারো জোয়ানে একটি মাত্র মুরগি ভক্ষণ।

ভাগে সামান্য মাত্র জুটলেও আমোদ করলাম কিন্তু প্রচুর। সামান্য আনন্দ টুকু আছে বলেই তো স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারছি এই শুষ্ক মরুভূমির ওপর। যেখানে দিনে প্রচণ্ড রোদের তাপ, মাছির উপদ্রব। সন্ধ্যা নেমে আসার সংগে সংগেই স্যাণ্ডফ্লাইয়ের কামড়, তবু এসব কষ্ট সহ্য করে রাতের পর রাত ঘুমকে নির্বাসন দিয়ে পাহারা দিতে পারি, শুধু এই নিত্য নতুন হুজুকের মধ্যে কাটিয়ে রস সৃষ্টি হয় বলেই। যেখানে ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুঁজে এলে মাথার ওপর ঝোলে মৃত্যু দণ্ড, সামান্য অসাবধানে বেদুইনের বুলেট, সেখানে তুচ্ছ বিষয়কে উপলক্ষ্য করে মাতামাতি না করে উপায় কী ?

দিনের পর দিন করিও তাই। সে জন্যেই তো আমরা অকপটে অপর সাথীকে খাবারের ভাগদি, ভোজন করি একই পাত্রে, একই বোতলে মুখ লাগিয়ে পান করি জল। চুপি চাপি জাগিয়ে দি সাথীকে, সেন্ট্রিপোষ্টে ঘুমিয়ে আছে দেখলে, এমন কি গোপন করি অন্যায় কিছু তারা করলেও।

এটা আমাদের দোষ বা গুণ তা যাই হোক না কেন, এটাই আমরা করি এবং এটাই আমাদের দস্তুর।

হিড়িক পড়ে গেছে ছাউনি পরিষ্কারের। তক্‌তক্ করছে ছাউনির রাস্তা। ঘোড়া-মিউলের আস্তানা থেকে সুরু করে সবই করা হয়েছে পরিষ্কার। কোথাও নোংরা নেই একটুও।

ডাষ্টবিনের ভিতর বাইরে লাগানো হয়েছে মাছি মারা তেল। চারিদিকে টাঙানো হয়েছে মাছি মারা কাগজ। মাজাঘসা চলছে চামড়ার সাজ সরঞ্জাম—বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়ার, বুট। চক্‌মক্ করছে রাইফেল-বেয়নেট। ল্যাট্রিনে উড়ছে স্বাস্থ্যীয় নিশানা—হলদে ঝাণ্ডা।

শুনলাম খবর। জেনারেল আসবেন আমাদের ছাউনিতে। দেখবেন আমাদের হাল-চাল, শরীর স্বাস্থ্য। পল্টনের কথায়—জেনারেল ইন্‌স্‌পেক্‌সন্। তাই এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধুম। এরকম দেখা এই প্রথম নয়। পূর্বে হয়ে গেছে আরও কয়েকবার। শেষ দেখা—সেই বাগদাদে।

এসেছিলেন এখানকার সর্বেসর্বা, বড় জঙ্গী। একের পর এক দেখেছিলেন প্রতিটি সৈনিককে। সিগনালার, মেসিন গানার, বিউগলার, ট্রান্‌স্‌পোর্ট কোর—বাদ যায়নি কেউ। শুনিয়ে ছিলেন তাঁর বক্তৃতা। প্রশংসা করেছিলেন আমাদের খুবই।

ফিরে যাবার সময় মঞ্জুর করে গেলেন, মাথা পিছু দু'আউন্সের স্থলে ছ'আউন্স দুধ।

বয়েছিলো পল্টনে দুধের বন্যা। চালিয়ে ছিলাম ক্ষীর, পায়েশ, বেশ কয়েক দিন। শুধু টিনের দুধ নয়। পেয়েছিলাম গরুর টাটকা দুধও। তাতেই তো তৈরি হয়েছিলো দুর্গাপুজোয় হাজার সৈনিকের সন্দেশ। করেছিলো আমাদেরই পল্টনীয়ার দল।

এবার আসছেন আর এক জেনারেল। তাই এতো আয়োজন, এতো ছুটোছুটি।

যথা সময়ে সদলবলে ধ্বজা উড়িয়ে (ইউনিয়ন জ্যাক্) এসে হাজির হলেন জেনারেল। ঘুরলেন চারিদিক, দেখলেন ছাউনি। হাসপাতাল, লাংগারখানা ঘুরে এসে হাজির প্যারেড মাঠে।

দেখছেন তিনি একের পর এক। শেষ হল তিন সারি। এবার আমাদের পালা।

আমি আছি এক প্রান্তে। আমার পাশেই গুরুদেব, তাঁর পাশেই পাগলা ঠাকুরদা।

সে যেন কেমন হয়ে গেছে। সে ভাব আর তার নেই। কথা বলে কম। কেবল মাছি মারার বুলি ছাড়ে। সেও এসেছে সেজে গুজে। জামা জুতো পরিষ্কার।

এদিকেও হচ্ছে খবরদারী, চলছে হুঁসিয়ারী আমার অফিসারের। বলছেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়, আপনি-তুমি বাদ দিয়ে।

সাবধান করে বলেন—সকলে দাঁড়ানো বুক চিতিয়ে, সোজা হয়ে—স্থির ভাবে।

ঠাকুরদা কানেও নেয়না তাঁর কথা। আপন মনে নড়াচড়া করে, কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়, কী যেন বিড় বিড় করে বলে।

এবার অফিসারের দল আসেন একেবারে কাছে। হাজির হন লাইনের সামনে। জেনারেল ছাড়াও আছেন কর্ণেল, এ্যাডজুটেন্ট,

আমার অফিসার, আর আছেন ডাক্তার ক্যাপ্‌টেন। তাঁর পিছনে, আছে যোশী।

অফিসারের দল কাছে আসামাত্রই, পাশ থেকে গুরুদেব ঠাকুরদাকে চিমটি কাটেন, ইশারা করে কী যেন বলেন।

ঠাকুরদাও যেন কেমন হয়ে যায়। নিজের মনেই কি সব বলে, জেনারেলের দিকে একদৃষ্টে তাকায়, তেড়ে ফুঁড়ে শুনিয়ে দেয় তার মাছি মারার কথা।

চিৎকার করে বলে—মাছি মারো, মানুষ মারো, মাছি মারতেই হইবে।

হঠাৎ কানের কাছে তোপ দাগলে অস্বাভাবিক নয় মূর্ছা যাওয়া। আমাদের সে অবস্থা হলে ছিলো ভাল। আচমকা ঠাকুরদার মাছি মারার প্রলাপ শুনে আমাদের যে কী অবস্থা তা আমরা ছাড়া অপরের পক্ষে বোঝা কঠিন। কান্নার ব্যাপারে কান্না চেপে রাখা সহজ, কিন্তু হাসির ব্যাপারে হাসি দমন করা যে কি কঠিন তা আমরা যে কয়েকজন তার পাশে আছি, বুঝছি হাড়ে হাড়ে।

একদিকে হাসি, অপরদিকে গারদ। হাসবার উপায় নেই, হাসলেই কারাবাস। ভবিষ্যতের অবস্থা জেনে হাসি চেপে আছি প্রাণপণে। তবু মনে হয়, আর বুঝি রুখতে পারি না, কোঁচ করে বেরিয়ে আসে বুঝি আমার অজ্ঞাতে।

হাসি চাপবার জন্যে বন্ধ করি চোখ। দেখি তাতেও বিপদ, মনে পড়ে ঠাকুরদার চিত্ত বিকার। মনের ভেতর বয়ে যায় আরও হাসির স্রোত।

তাড়াতাড়ি চোখ খুলি। দৃষ্টি যায় আমার অফিসারের ওপর। দেখি তাঁর উগ্রমূর্তি, রাগে মুখ লাল। হয়তো ভাবছেন—মান, ইজ্জত, সুনাম সব নষ্ট হয়ে গেল বুঝি পল্টনের।

চিন্তা করি অফিসারের রূপ। ভাবি ঠাকুরদার পাগলামির কথা। তবে কি হাজত ? তাইতো, এ কী কাণ্ডটা আবার বাধিয়ে বসলো !!

মন যায় দমে। আপনা হতেই হাসি কমে। রক্ষা পাই হাজত বাস থেকে।

চমকে ওঠেন জেনারেল। দরদ দিয়ে জিগ্যেস করেন—হোয়াট্‌স্ রঙ উইথ হিম ?

জবাব দেয় ডাক্তারের সহকারি, জমাদার যোশী। বলে—পাগল।

শুনলাম জেনারেলের উপদেশ।—খুবই বিপদের, পাগল সৈনিক ছাউনিতে থাকা, বিশেষ, সংগে আছে হাতিয়ার। আজই হাসপাতাল, প্রয়োজন চিকিৎসার।

জেনারেল চলে গেলেন, সেই সংগে ছাড়াছাড়ি হলাম ঠাকুরদার সংগেও। সে নাকি পাগল। দেখলাম, তার হাতে পরালো হাতকড়ি। নিয়ে গেলো, নতুন আস্তানায়। হাসপাতাল—মেণ্টাল ওয়ার্ড।

আজ এই প্রথম দেখলাম, তার চোখে জল। দেখলাম, চোখের দুই কোণে যেন দুটো মোতি। আজ আর তার কোনও সাড় নেই। সে আজ উদাস, নির্বিকার। সে আজ আর ললিত নয়, নয় সৈনিক। পল্টনেও আর তার স্থান নেই, সে আজ সব কিছুরই বাইরে। সে নাকি উন্মাদ—ভয়াবহ, ক্ষতিকর।

মনটা হয় অস্থির। তাঁবুর কোলাহল, হট্টগোল সব কিছু বজায় থাকলেও, আমার কাছে আজ দুঃসহ। কেবলই মনে পড়ে তার কথা। সত্যি কি সে পাগল—না গুরুদেবের মন্ত্রণা?

না না সে উন্মাদ নয়। সে যে খুবই আমুদে, অতিরিক্ত সরল, অকপট, সৎ। তার এই মন খোলা ভাবের জন্যেই কি আজ তার এই অবস্থা? পাগলা গারদ।

মন ধাওয়া করে তার কাছে।

বার কয়েক স্যাণ্ডফ্লাই-ফিভার আঁকড়ে ধরলেও, কোন দিনও আশ্রয় নিতে হয়নি হাসপাতালে। প্রতিবারেই কৃপা করেছেন ডাক্তার ক্যাপটেন। বিশ্রাম দিয়েছেন ছাউনিতেই। হাসপাতালের বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও, পরিচয় হল আজ। খুঁজে পেলাম, মেণ্টাল ওয়ার্ড। পাগলদের আস্তানা, ঠাকুরদার তাঁবু।

*

কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা কয়েকটা তাঁবু নিয়ে এই মেণ্টাল ওয়ার্ড। দেখছি পাগল সৈনিকদের। শুনছি চিৎকার। কারও বা হাসি কারও কান্না। কেউবা, মুখে ফাটাচ্ছে বোমা, দাগছে কামান দুম্ দুম্ দুম্। চালাচ্ছে মেসিন গান। তা, বেশ একটানা চালিয়ে যাচ্ছে—ফট ফট ফট। অদ্ভুত, একটুও ফাঁক নেই।

দূর থেকে দেখলাম ঠাকুরদাকে। দেখছি হাতকড়ি মুক্ত। খুশি

হই, পাই আনন্দ। চিৎকার দিয়ে ডাকি, ওরে এই, এই ঠাকুরদা, এই যে আমি—তিনশো তেতাল্লিশ।

আসে বেড়ার ধারে। চোখে তার জল, কাতর তার দৃষ্টি।

অস্থির হয়ে বলে—ওরে, এই ভাবে আমায় পল্টন ছাড়তে হবে? কে বলে আমি উন্মাদ? না না আমি পাগল নই। সম্পূর্ণ সুস্থ—তোদেরই মতন সাধারণ সৈনিক। ওরে, যোগীকে বলে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল, আমি যে চাই তোদের সঙ্গ—নিজেদের ছাউনি।

বেদনা ভরা মন নিয়ে ফিরি ছাউনিতে। দুঃখ কষ্ট মনের মধ্যে জমা করে চালাই প্যারেড। চলে নিত্যকর্ম। মেসিনগানের খটাখট, টার্গেট-সুটিং, মোবাইল কলম, রকমারি ডিউটি—সবই করছি কল কব্জার মত। ফুরসত পেলেই ছুটে যাই হাসপাতাল—মেণ্টাল ওয়ার্ড।

এবার দেখছি ঠাকুরদার মনটা যেন বদলে গেছে। সেরকম নিস্তেজ ভাব এখন তার আর নেই। সে এখন খুবই ব্যস্ত মাছির বংশ লোপে। হাতে তার ফ্লাই-ট্র্যাপ, ঘোরে ফেরে এদিক ওদিক, ব্যস্ত হয়ে যাওয়া আসা করছে তাঁবুর বাইরে ভেতর।

হাঁক দিয়ে ডাকলাম তাকে। এই ললিত, আমি এসেছি, এই ছাখ, তাকা এদিকে?

দূর থেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়। উগ্র ভাবে বলে—আই সে, ডোণ্ট ওয়েষ্ট ইওর টাইম, কিল দি ফ্লাই, মাছি মারো—মাছি মারো।

জবাব শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ি। তাইতো, আমাকে কি তাহলে চিনতে পারলো না!

চিৎকার দিয়ে আবার ডাকি—এ-ই ঠাকুরদা, এদিকে আয়, আমি আবার এসেছি, এই ছাখ, এই যে, এই বেড়ার ধারে।

এবার রেগে বলে,—ফলো আওয়ার রেজিমেণ্টাল অর্ডার, মাছি মারো, মাছি মারিতেই হইবে, মানুষ মারো...

ব্যস্ত ভাবে চলে যায় তাঁবুর ভেতর। নিজের মনেই সুরু করে মাছি মারা। দেখছি, খুঁটি বেয়ে তাঁবুর ওপরে ওঠা, সেখানেও হন্তদন্ত হয়ে চলে মাছি ধ্বংস।

ঠাকুরদার অবস্থা দেখে নিরাশ হয়ে পড়ি। ক্রমে আসে আমার

উৎসাহ, উত্তম। চুপ চাপ ফিরি ছাউনিতে। শুধু মনে আসে ঐ একই কথা, সত্যি কি সে পাগল হয়ে গেলো। না, গুরুদেবের...

হপ্তাখানেক কেটে যায়, আবার দৌড়োই হাসপাতাল, হাজির হই পাগলা ঘরে। সঙ্গে রাখি টিনে ভরা আনারস, প্যাকেটে ভরা বিস্কুট।

আগেরই মত চিৎকার দিয়ে ডাকি, ঠাকুরদা, ঠাকুরদা, এই—ললিত।

হতাশ হই।

কই, কোথায় ঠাকুরদা? কোথায় ললিত? সে তো নেই।

অস্থির হয়ে ঘোরাঘুরি করি তাঁবুর চারিদিক। জিগ্যেস করি ওয়ার্ড সার্জেণ্টকে, বুঝিয়ে বলি ঠাকুরদার কথা, মাছি মারার কথা।

এঁ্যা, সে নেই। চলে গেছে ভারতে!!

তাইতো। সত্যিই সে তো নেই, দেখছি না তো অপর পাগলদের। এ যে এসে গেছে নতুন উন্মাদের দল। এরাও তো নিশ্চিন্ত মনে, মুখে ফাটাচ্ছে বোমা, দাগছে কামান, চালাচ্ছে এরোপ্লেন। শুনছি কান্না, রকমারি বুলি। দেখছি চম্‌কে চম্‌কে ওঠা। শুনছি চিৎকার করে বলা, বাহাদুর সিং খতম হো গিয়া, মাধব সিংকো শির নিকাল গিয়া......

হঠাৎ দৌড়ে তাঁবুর থেকে বেরিয়ে আসে এক উন্মাদ জোয়ান। কাঁদো কাঁদো হয়ে জিগ্যেস করে আমায়—ঠগি সিং কাঁহা? ঠগি সিং,—মেরা সাথী ঠগি সিং? ব'লো, ব'লো সাথী ব'লো, কাঁহা মেরা সাথী ঠগি সিং? কিয়া—উধার গিয়া, উধার? ঠগি সিং—ঠগি সিং—ঠগি...

রিডাউট ক্যাম্পের পালা শেষ করে আবার এসে জুটলাম হেড কোয়ার্টার ছাউনিতে। দেখছি পুরোমাত্রায় চলছে প্যারেড। হচ্ছেও এক এক নতুন কায়দায়।

প্রতিটি সৈনিককে তাড়াতাড়ি গড়ে তোলবার জন্যে সুরু হয়েছে প্লেটুন ট্রেনিং। এখন ইস্কুলেরই মত ক্লাশ বসে, হাজির থাকেন আমার পাগলা ক্যাপটেন। হরেক রকম প্রশ্ন করেন।

বেজায় মুশকিল হয়ে পড়ে এই প্রশ্নোত্তরের বেলায়। এভাবে যে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। তাই বাড়ে আতঙ্ক। ভাবি, এ আবার কেন? আগেই তো শিখেছি বুলেটের বদলে বুলেটই উত্তর। কিন্তু উপায়ই বা কী?

ওসব দেখে শুনে চুপটি মেরে বসে থাকি এক কোণে গা ঢাকা দিয়ে। এড়িয়ে চলি আমার ক্যাপটেন সাহেবকে। ভয় হয়, এই বুঝি তাঁর কুনজরে পড়ি।

কিন্তু এবার বেশ ভাল ভাবেই জানলাম, আমার ক্যাপটেনের কুনজরে পড়ার চেয়ে সুনজরের বিপদ অনেক বেশী। এতোদিন প্রাণপণে ও দুটোকে এড়িয়ে চলেও শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হল না তাল রাখা। সব যেন তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে এই প্লেটুন ট্রেণিং।

সেদিন হঠাৎ আমার ক্যাপটেন সাহেবের নেকনজরে পড়ার পর থেকে কি রকম যে অস্বস্তি বোধ করছি তা বুঝছি আমি মনে প্রাণে। বেজায় বিব্রত করে তুলেছেন আমায় প্যারেড মাঠে।

সে দিনের ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ক্লাশে প্রমাণ তিনি পেয়েছেন, আমি নাকি নেহাত আকাট নই। অতএব, এখন প্যারেড মাঠে আমাকে দেখা মাত্রই সুরু করেন নিত্য নতুন প্রশ্ন। সাথীরা বলে, আমার এই নিদারুণ অবস্থার জন্যে একমাত্র আমি ছাড়া দায়ী নাকি আর কেউ না।

সেদিন ছিল ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ক্লাশ। গাঁতি বেলচা দিয়ে ঠিকঠাক খুঁড়ে ফেললাম তো নীজের সীমাটুকু।

রাখলাম তাতে রাস্তা, দাঁড়াবার প্ল্যাটফরম, জল যাবার নর্দমা, আর তৈরি করলাম, গুলি চালাবার জন্যে বালির বস্তা সাজিয়ে—এল্‌বোরেষ্ট।

ট্রেঞ্চ পরীক্ষা করলেন আমার ক্যাপটেন নিজেই। খুশি হয়ে জানালেন গলদ নেই, কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে।

এবার সুরু করলেন প্রশ্ন।

ট্রেঞ্চের সামনের অংশটাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন—এটাকে কি বলে, নাম কী?

কেতাবে কি লেখা আছে জানি না। দু'চারটে উড়ো-ঝাপটা কথা কানে গেলেও মনে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। যথেষ্ট চেষ্টা করেও ধরা ছোঁয়া না পেয়ে ভাবছি—তাই তো, কী হতে পারে নামটা।

জিগ্যেস চলছে এক এক করে—ইউ ইউ ইউ......

উঠে দাঁড়ায় জব্বর মিঞা। খট্ শব্দে পা দুটোকে জোড়া করে উৎসাহের সংগে বলে—প্যারাপাইট।

অট্টহাসি হাসেন ক্যাপটেন। বলেন—ইউ, ব্লা-ডি ক্যা-ট।

আবার চললো প্রশ্ন—ইউ ইউ নেক্‌স্ট নেক্‌স্ট......

কেউ আর সাহস করে না। সকলে চুপ করেই থাকে।

প্যারাপাইট কথাটা শোনা মাত্র আমার কিন্তু মনে পড়ে গেলো আসল নামটা।

ক্যাপটেন্‌ সাহেবের চোখে চোখ পড়া মাত্র, আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করেন—ইউ ?

চটকদার ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলি—প্যারাপেট।

খোশ মেজাজে শোনালেন ক্যাপটেন—ইয়েস ইয়েস, ব্লাডি-ক্যাট।

এবার ট্রেঞ্চের পিছন ভাগ।

আবার একের পর এক চললো প্রশ্ন—ইউ ইউ...

ভাবছি, সর্বনাশ, আবার বুঝি জিগ্যেস করেন।

হলও তাই।

হাসতে হাসতে জব্বর মিঞার দিকে তাকিয়ে বলেন—ইউ জব্বর, হোয়াই সো সাইলেন্ট ?—সে, প্যারাডাইস।

জব্বর ছেলে ভাল, কিন্তু মুখচোরা। একটু ভীতু গোছের।

হয়তো জানতো সে, এবার আর সাহস পেলো না। চুপ করেই রইলো।

আমার কিন্তু সাহস বাড়লো। এবারেও বুঝে ফেল্লাম, প্যারাডাইস কথাটা শুনে।

জব্বর ছাড়ান পেলো। সংগে সংগে পাকড়াও হলাম আমি।

জিগ্যেস করলেন—ইউ ?

আবার পা দুটো খট করে জোড়া করি। এটেনসন্‌ হয়ে স্যালিউট ঠুকে বলি—প্যারাডস।

জবাব শুনে কাছে আসেন। আপাদ মস্তক ভাল করে দেখেন। ফ্লাইট্র্যাপটা মুখের কাছে নেড়ে মাছি তাড়ান। জিগ্যেস করেন—হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন সো লঙ—ব্লাডি ক্যাট ?

এতোদিন তো কাছেই ছিলাম। বেশী কথা বললেই, কথা বাড়বে। তাই সেরে দিলাম এক কথায়। বলেদিলাম—হসপিট্যাল স্যার।

সকাল দুপুর ছাড়াও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে রাত্রে যুদ্ধ করবার কায়দাগুলো।

যে দিন গার্ড ডিউটি থাকে, সে দিন রেহাই পাই ওটার থেকে। আজ ডিউটি নেই, তাই আসতে হয়েছে রাতের ক্লাশে।

সার দিয়ে দাঁড়িয়েছি, তা প্রায় জন কুড়ি ফৌজী। শেখাবার ভার পড়েছে পটলদার ওপর।

পটলদা এখন জমাদার। যেমনই আমুদে তেমনই চটপটে আমাদের এই পটলদা। ভারতীয় অফিসার হলেও, আমাদের খুবই প্রিয়। বয়সে কিছু বড় হলেও ফষ্টিনাষ্টিটা চলে তার সংগে। কাটিয়েছি কলকাতায়, একই পাড়ায়। শিখেছি অনেক কিছু ডানপিটেমি তার সংস্পর্শে এসে।

চমৎকার ক্লাশ চলছে, হাসি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সব গড়বড় হয়ে গেলো। বন্ধ হয়ে গেল হাসি মস্করা।

আচমকা এসে হাজির আমার ক্যাপটেন।

নিজের মনেই ঢুকে পড়লেন দুই সারির ভেতর। দেখতে লাগলেন, এক এক করে প্রতিটি সৈনিককে। আমার কাছে আসামাত্র, আমিও অপর সাথীদের মত বুট জোড়ায় ঠোকাঠুকি করে শব্দ করলাম। দাঁড়ালাম এ্যাটেনসন হয়ে।

আমার ওপর নজর পড়তেই, হুকুম হল—ইউ ফল আউট, এক্সপ্লেন পিকেট।

হঠাৎ মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়লো। গুর গুর করে উঠলো বুকের ভেতরটা। ঠোঁট গেলো শুকিয়ে। মনে হচ্ছে ভেতরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। বুঝলাম আজ আমি মরেছি।

ভেতরে যা কিছু ঘটুক না কেন, ঠিক রাখলাম বাইরের খোলসটা। কিছুমাত্র ভয়ের ভাব প্রকাশ না করে লাইন ছেড়ে নিয়ম মত এগিয়ে গেলাম পনেরো কদম। গেলাম কায়দার ওপর বুক চিতিয়ে—জমাদার সাহেবের সামনে।

ক্যাপটেন সাহেবও এলেন কাছে।

শুধু ঠোট দুটো নেড়ে বলি—পটলদা, এবার গেছি আমি, খতম হয়ে গেলো বুঝি আজ আমার দফা। তুমি বাঁচাও, দোহাই তোমার—বাঁচাও আমার এবারকার মতন।

আমার কথাগুলো শুনে ক্যাপটেন সাহেব জিগ্যেস করেন—আই সে জমাদার ঘোষ, হোয়াট হি সেস? জমাদার সাহেবও পা জোড়া করেন।

গম্ভীর হয়ে বলেন—বলছে, বাঙলায় বলতে চায়। সব কথা ইংরেজীতে গুছিয়ে বলা ওরপক্ষে সম্ভব নয়।

সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বলেন—ওয়েল ক্যারি অন।

ঘেমে মরছি গল্ গল্ করে, ভাবছি কি ক্যারি করবো।

বাইরে তেজী ভাব থাকলেও ভেতর গেছে শুকিয়ে। কাতর ভাবে তাকালাম জমাদার সাহেবের দিকে।

সে চাউনি ক্যাপটেন না বুঝলেও, বুঝেছেন জমাদার সাহেব।

ধীর ভাবে আস্তে আস্তে বলেন—তুই যা তা বলে যা, যা প্রাণে চায়, আমি সব ঠিক করে নেবোখন—কিছু ঘাবড়াসনি।

এবার এসে গেলো আমার উৎসাহের জোয়ার। খাঁটি বাঙলায় বেরোতে লাগলো মেসিন গানের বুলেটের মত একের পর এক আমার পিকেটের কথা।

বলে চলেছি—ছাখো পটলদা, কী আর বোলব বল, আজ ক'দিন ধরে অস্থির করে তুলেছেন আমায়। যখন তখন মারছেন আমাকে উস্তন খুস্তন করে। আজ এটা, কাল সেটা, চলছে নিত্য নতুন প্রশ্ন। কতো আর সামলাবো বল? এ যেন আর শেষ নেই। ভাগ্যিস তুমি ছিলে আজ, তাই বাঁচছি এ যাত্রা, নইলে যে কি দশা হত,—তা, আমিই জানি। শুনছি আমি নাকি এঁর সুনজরে পড়েছি। না, পটলদা—আর সুনজরে কাজ নেই, এখন কোনরকমে প্রভুর চোখের আড়াল হতে পারলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

মাঝে মাঝে কথাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজীতে ছাড়ি দু'চারটে পিকেটেরই চলতি কথা। যেমন,—পেট্রল, সেন্টরি, পিকেট, গ্রুপ, গার্ড, বিট্, চ্যালেঞ্জ।

যতক্ষণ বলছি, সামনে দাঁড়িয়ে সমঝদারের মত মন দিয়ে শুনছেন ক্যাপটেন।

সায় দিয়ে মাথা নাড়ছেন। উৎসাহ দিয়ে বলছেন—ইয়েস্-ইয়েস্, গুড-গুড।

চুপ করলেই হুকুম করেন—ওয়েল্, ক্যারি অন্।

ভাবি, বলছেন তো ক্যারি অন, কিন্তু আর কতো ক্যারিই বা করবো।

পটলদা তো বলে খালাস—তুই যা তা বলে যা। আমি কিন্তু দেখছি, আসল কথা বলা সহজ—শক্ত, নকল কথা আউড়ানো।

তাইতো, আর কি কথা বলি। কোনও কথা তো মনে পড়ে না ছাই, সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

একটু ভেবে, আবার ঢোক গিলে বলি—এই স্থাখো, দেখছো তো? থামলেই বলেন,—আরও চালাও। কিন্তু কতো আর বলতে পারি বল? আমি বেশ বুঝেছি পটলদা, এঁর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, হয় তোমার সঙ্গে ডিউটী নিয়ে ওপারে সরে পড়া, কিংবা মশারি না খাটিয়ে জ্বর বাধানো। অর্থাৎ এক্ষুনি দরকার, একটা কিছু যাহোক করে হেস্ত-নেস্ত করা। কী বল?

সমানে আরও মিনিট দুয়েক এই ভাবে চালিয়ে আমার পিকেটের ম্যাগাজিন উজাড় করে দিয়ে একেবারে থেমে গেলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম ষ্ট্যাচুর মত।

আমায় থেমে যেতে দেখে, উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করেন ক্যাপটেন—আই সে জমাদার ঘোষ, ইজ্ দ্যাট্ রাইট?

আবার জমাদার সাহেব এটেন্‌সন্ হলেন খট করে। জবাব দিলেন—ইয়েস্ স্যার, কোয়াইট ও কে।

সংগে সংগে আমারও কানে গেলো সাহেবের কথা—আই নো, দিস্ ব্লাডিক্যাট ইজ ভেরি স্মার্ট এণ্ড ইন্‌টেলিজেন্ট।

শুধু কি তাই? এবার আমার কাছে আসেন। নাকের কাছে ফ্লাইট্র্যাপটা ঘুরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপদেশ দেন। ব্লাডিক্যাট বলেন। আর বললেন, কাল আমায় হাজির হতে হবে অফিসে—কর্ণেলের দরবারে।

জানলাম, আমার নাকি প্রমোশন।

এটা খুবই সত্যি কথা, আর্থিক কিছু উন্নতি না হলেও অন্ত কিছুটা সুবিধে অবশ্য হয়েছে সামান্ত এই প্রমোশনটুকু পেয়ে।

এখন আর রাতের পর রাত সেন্ট্রি পোষ্টে দাঁড়িয়ে নানারকম চিন্তা করতে হয় না।

এখন সেন্ট্রি বদল করাই আমার কাজ।

তবে বন্ধ হয়েছে কোটিং ডিউটীর পথ। বেশ বুঝছি, সাধারণ সৈনিক অবস্থায় ফাঁকি দেবার প্রশস্ত পথটা হয়ে গেছে সংকীর্ণ।

দিনে রাতে আট ঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেবার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ভেবেছিলাম এবার আরাম পাবো। কিন্তু তা কই? আরাম কিছুটা থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য তো নেই।

সেন্ট্রি পোষ্টে দাঁড়াতে যেমন কষ্ট, তেমনই সেন্ট্রি বদল করার দায়িত্বও কিছু কম নয়। ঘুমিয়ে পড়লে ঐ একই বিপদ। প্রাণদণ্ড আশ্চর্য নয়।

এসব জেনে শুনে ঘুমকে বিসর্জন দিয়ে সর্বদাই সজাগ থাকি এই সেন্ট্রি বদল করার বেলায়ও।

অবশ্য পাহারা দেবার কষ্ট অনেক।

এখনও ভুলিনি নিস্তব্ধ মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার নিঃসঙ্গতা।

অন্ধকারে নীরবে দাঁড়িয়ে নানারকম চিন্তা করতে করতে ক্ষণেকের জন্যে সেণ্টরির মনটা বিগড়ে যেতেও তো দেখলাম।

এটা অনেক সাথীই স্বীকার করবে, গভীর রাত্রে একদৃষ্টে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে থেকে নজরে আসে যেমন অনেক কিছু, তেমনই মনেও জাগে বহুরকম চিন্তা। এসব চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে মন চায় তখন সঙ্গ।

তখন সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় ছাউনির আস্তাবলের ঘোড়ার চিঁ হিঁ ডাক। গার্ডরুমের ঘণ্টার আওয়াজ, অপর সেণ্টরির বুটের শব্দ বা চিকমিক করা তার বেয়নেটখানা।

নদীর ধারে পাহারা দেবার সময় কিনারায় আছড়ে পড়া ঢেউএর খেলা দেখতে দেখতে আনন্দে বিভোর হয়েও তো কাটিয়ে দিলাম কতো রাত।

পাহারা দিতে গিয়ে নানারকম চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেন্টি তার গলার নলীতে রাইফেলের নলটা রেখে ট্রিগার দাবিয়ে মাথাটাকে ছিন্নভিন্ন করলোও তো কয়েকজন।

আবার কত বিচিত্র ঘটনাও তো ঘটতে দেখলাম, এসব গার্ড ডিউটিতে মোতায়েন থেকে।

এইতো সেদিন। ছাউনির কোয়ার্টার গার্ড ডিউটিতে থেকে দেখলাম এক জোয়ানের কাণ্ড।

রাত একটা। আট নম্বর পোষ্ট থেকে দমাদম্ গুলির আওয়াজ শুনে দৌড়োলাম সেদিকে—হাবিলদার সাহেবের সংগে।

কাছে পৌঁছোতেই চ্যালেঞ্জ করলো—হল্ট ?

জবাব দিলাম সংগে সংগে—ফ্রেণ্ড। সেই সংগে দুরে থেকে ডাকলাম তার নাম ধরে।

মুহূর্তের মধ্যে রাইফেলের নলটা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে মাটি হাতড়াতে হাতড়াতে আবার চিৎকার করে উঠলো—হল্ট।

বুঝলাম, ব্যাপারটা তো ভাল না।

ফ্রেণ্ড বলেই, দৌড়ে গিয়ে চেপে ধরলাম তার রাইফেল।

দেখলাম, তার যেন কী রকম ভাব। হাত তার কাঁপছে। ঠিক বেহুঁস না হলেও, বেশ বুঝলাম, সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলেছে যেন নিজেকে।

নাম ধরে ডেকে, জোরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই হুঁস হল তার।

চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো—স্যার আপনারা। ওঃ, খুব বেঁচে গেছেন। ম্যাগাজিনে গুলি ভরবার সময় চারজার থেকে একটা বুলেট পড়ে গেছে মাটিতে, ভাগ্যিস সেটা খুজে পাইনি—পেলে ঠিক ছাড়তাম ওটাকে আপনাদের ওপর।

হাবিলদার সাহেব জিগ্যেস করলেন—কি হয়েছে তোমার, অত ফায়ার করলে কেন ?

জবাব দিলো কিছুক্ষণ ভেবে।

স্যার, আমি যেন অনেক কিছু যাওয়া আসা করতে দেখলাম আমার সামনে। দেখলাম গড়িয়ে যেতে আগুনের গোলা। পরক্ষণেই দৌড়ে আসতে দেখলাম একদল ঘোড়া, হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেলো কাছে এসেই। হামাগুড়ি দিয়ে সারবন্দি লোককে আমার দিকে আসতে দেখেই, তিন তিনবার চ্যালেঞ্জ করলাম। বললাম—হল্ট। কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে সুরু করি ফায়ারিং।

তারপর ?

আর কিছু মনে নেই স্যার।

তাকে বদল করে মোতায়েন করা হল অপর সেন্টরি।

এরকম ভুত প্রেত দানবের নানারকম খোশ গল্প শুনে কাটছে দিনগুলো। প্রায়ই শুনছি, অনেক সাথীই নাকি দেখেছে অনেক কিছু

এসব পাহারা দেবার সময়। কেবল তারের বেড়ার বাইরে নয়—ভিতরেও।

এসব কথা শুনে সাথীদের সংগে তর্ক বাধে, ঝগড়াও করি। বুঝিয়ে বলি, পাহারা দেবার সময় এরকম বিভীষিকা যে দেখা যায় না, তা নয়। ওগুলো চোখের ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই না। রাতে যেটাকে মানুষ দেখায় দিনে সেটা কাঁটাগাছ, ঝোপ ঝাড়, ঢিপি-ঢাপা।

তবে, সেগুলোকে সব সময় চোখের ধাঁধা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উচিতও মনে করি না।

হালকা ভাবে দেখে উপেক্ষা করলে, তার ফল খুবই মারাত্মক হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়।

সেজন্যে সর্বদাই সজাগ থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে উভয় দিকেই। বুঝতে হবে চোখের ধাঁধা না শত্রু।

নজীর তো রয়েছে সেই রেষ্ট ক্যাম্পের ব্যাপার।

ছোট্ট দলটিকে নিয়ে হাবিলদার দত্ত যখন গিয়েছিলো সেই আমারার ডিউটিতে?

মরুভূমির ওপর রসদের গাদায় আস্তানা নিয়ে পাহারা দেবার সময় গভীর রাত্রে হাবিলদার শরৎ দত্তের যেন মনে হল কতকগুলো থলে গড়িয়ে আসছে তাদেরই দিকে। স্পষ্ট দেখলো থলে গড়ানো।

ভাল করে লক্ষ্য করলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

খস্ খস্ শব্দ শুনেই ছাড়লো একের পর এক গোটা পনেরো গুলি। দাগলো কিছুটা আন্দাজে, বস্তাগুলোর ওপর।

কিন্তু হতাশ করলো তাদের।

ডেকে উঠলো মানুষের বদলে মুরগি। নিশ্চিন্ত হল চোখের ধাঁধা বা ভুত প্রেত নয় জেনে।

সকালে দেখা গেল চারদিকে ছড়ানো রসদ, আর ছড়িয়ে আছে কেবল রক্ত আর রক্ত।

গুলি খেয়ে জখম হয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে বেদুইনের দল, মুরগির ভান করে।

তাদেরও ছিলো মারাত্মক হাতিয়ার।

শুধু কি সেবার? ওরকম ভাবে এসে বহুবার খুন জখম অনেক কিছু করে গেছে বেদুইনের দল, আমারার বেস্-ডিপোর ঐ রসদের ডাম্পে।

এসব কারণে সব সময় চোখের ধাঁধা মনে করে শিথিল হওয়া উচিৎ কি? তবে হ্যাঁ, অনেক সময় খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে আসল নকল বুঝতে।

আমারও একদিন ওরকম অবস্থা হয়েছিলো সাধারণ সৈনিক অবস্থায়, এই কুতের কোয়ার্টার-গার্ড ডিউটীতে পাহারা দিতে গিয়ে।

চোখের সামনে দেখেছিলাম সেদিন অনেক কিছু। ভয়ও পেয়েছিলাম যথেষ্ট।

সেদিন ডিউটী পড়লো প্রথম দফায় সন্ধ্যা ছ'টার থেকে রাত আটটা। আবার দ্বিতীয় দফায় ছিলো রাত বারোটা থেকে দুটো।

ডিউটিতে হাজির হয়েই তো মোতায়েন হলাম ছাউনির এক প্রান্তে—সেই উত্তর পুব কোণে। সম্পূর্ণ নির্জন হলেও, কুত শহরের কিছুটা দেখা যায় এই পোষ্টে দাঁড়িয়ে থেকে।

চুপচাপ নিজের সীমানার মধ্যে আছি খাড়া হয়ে। কখনও বা পেট্রল করি ধীরে ধীরে। রাইফেল কাঁধের ওপর ওঠে-নামে, ঘুরি-ফিরি, সবই করছি কায়দাকানুন ভাবে।

সন্ধের পালাটা কাটছে আনন্দেই।

শুনলাম, কুতের মসজিদ থেকে আজান দেওয়া।

এখনও শুনছি নদীর ওপারের সেই যাযাবরের ছাউনি থেকে ভেসে আসা ঢোলের বাজনার সংগে লোহার টুং টুং শব্দে কোরাস গান।

দেখছি, কুত শহরের গোটা কয়েক তেলের আলো। জ্বলছে মিট্ মিট্ করে।

মাঝে মাঝে শুনছি শেয়াল চলার খুস-খাস শব্দ, কখনও বা সজারুর। থেকে থেকে ঠোক্কর মারে আমায় পঙ্গপালের দল।

দাঁড়িয়ে আছি নিজের মনেই। গুণ গুণ করে গান করি। সাথী আমার অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, চিন্তা।

মনে পড়ে কতো কথা—আত্মীয়স্বজন, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব, গড়ের মাঠ, কলেজ স্কোয়ার, আরও কতো কি!

মন ভার হয়ে ওঠে।

চেষ্টা করি চঞ্চল মনকে শান্ত করতে।

মনের কোণে দেখা দিলো বাগদাদের বাজার। দেখাদিলো নাসরা।

হ্যাঁ, সেই নাসূরা। ওয়াহেদ আনা বকশিশের দলের নাসূরা। গোরস্থানের নাসূরা। আসকার রফিগদের নাসূরা।

নাসরাকে যে শুধু ঘৃণা করতাম তা নয়। ভয়ও করতাম।

তার চাউনি, তার হাসি-মস্করা, চলা-ফেরা সবই ছিলো আমার কাছে আতঙ্কের।

তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মাঝে সাঝে বকশিশও যুগিয়েছি। সেও কিন্তু সরে পড়তো পয়সা পেয়েই। যাবার সময় শুনিয়ে দিতো রফিগ তুম্ জেন্—বহুত বহুত জেন্।

কিন্তু, এই নাসরারই দেখেছিলাম আর এক রূপ। দেখেছিলাম আমাদের ছাউনির পিছন দিকে নদীর ঘাটে।

জল নিতে এসেছিলো কলসি কাঁধে।

সে দিন তাকে চিনেও যেন চিনতে পারিনি। গ্রামের মেয়েদের মত কলসি কাঁধে নিয়ে জল বইবে নাসরা? না, কখ্খনো না—নিশ্চয় অন্য কেউ। তার মুখ চোখ তো অন্য রকম।

সন্দিগ্ধ মনে বার কয়েক তার দিকে তাকাতেই সে কাছে আসে। বলে—রফিগ, হামকো আস্তে নেই মালুম?

উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করলাম—আস্তে বাজারমে ঘুমতা? ফুলুশ মাংতা?

মাথাটা নিচু করে বলে—ই: (হ্যাঁ)।

থতমত খেয়ে গেলাম তার ই: বলা শুনে। তাহলে এই-ই সে।

একটু সামলে নিয়ে বললাম—কাহে বাজারমে ঘুমতা? উ নেই ঠিক, খারাপ—মাত ঘুমো।

সে যেন কীরকম হয়ে যায়। নানান ভাষা জোড়াতালি দিয়ে বলে—তুমি আস্কার, সরকার তোমায় খানা দিচ্ছে, ফুলুশ দিচ্ছে, থাকবার জন্যে তাঁবু দিচ্ছে, জামা-জুতো সব কিছুই দিচ্ছে, তুমি কি বুঝতে পারবে আমাদের অবস্থা?

ছলছল করে ওঠে তার চোখ।

সামলে নিয়ে আবার সুরু করে।

দ্যাখো রফিগ, আমার বাবাও ছিলেন আসকার। কিন্তু তিনি আজ

আর নেই। প্রাণ দিয়েছেন এই যুদ্ধে, তুর্কিদের হয়ে লড়াই করে। এখন সংসারে আছেন মা, আছে ছোট ছোট ভাই বোন।

দারিদ্র্যের চাপে পড়ে মাও একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে। নিজের চোখে দেখছি দিনের পর দিন অনাহারে পড়ে থাকে আমার ভাই-বোন।

গম পিকেটে প্রতি হপ্তায় মাথা পিছু মাত্র আধ সের গম দেয়। গম নেবার কার্ড ছিলো, পয়সা ছিলো না।

এসব দেখে শুনেই তো বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি বাগদাদের বাজার, এখন আমার সহায় আসকার রফিগ, সম্বল গোরস্থান। এই জন্যেই তো বলি—আসকার জেন তামাম আসকার জেন।

কথাগুলো শেষ হতেই হঠাৎ জিগ্যেস করে—আন্তা সিসমেক্ কিয়া?

নামের কথা বলতে গিয়েই পিছিয়ে পড়ি।

ঘুরিয়ে জিগ্যেস করি—তুম্‌রা সিস্‌মেক্ কিয়া।

হেসে বলে—নাস্‌রা।

আমিও হেসে বলি—হামারা নাম, আস্‌কার রফিগ।

সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম নাস্‌রার কথা ভাবতে ভাবতে। কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম জানি না। গার্ড কম্যাণ্ডারের বুটের শব্দে চমক্ ভাঙলো। বুঝলাম আটটা বাজলো—এবার বদল হব।

চার ঘণ্টা বাদে আবার দাঁড়িয়েছি এই তিন নম্বর পোষ্টে। থাকতে হবে রাত বারোটা থেকে দুটো।

উঃ, কি নির্জন।

যেমনই অন্ধকার, তেমনই নিঝুম। তবে, ওরই মধ্যে সতেজ করে দিচ্ছে যখন কানে আসছে ব্লক-হাউসগুলোর থেকে রাইফেল দাগার শব্দ। কিংবা যখন আকাশে রকেট ছেড়ে আতশবাজীর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আলো।

ঘণ্টাখানেক কাটলো, বাকি আর মাত্র এক ঘণ্টা।

সময় আর কাটে না। ঘড়ির তেজ যেন কমে গেছে। গতি হয়েছে মন্থর। ইচ্ছে হয় কাছে পেলে কাঁটাটা ঘুরিয়ে দি বেশ কিছুটা।

যতগুলো পোষ্ট আছে, তার মধ্যে এই পোষ্টটাই সব চেয়ে নিরিবিলি। ছাউনির একেবারে বাইরে।

সত্যি বেজায় থমথমে। যদিও মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে শেয়ালের দল।

এক মনে শুনি তাদের ভাষা। ইচ্ছে হয় তাদের দর্শন লাভের, কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে কুলবধূর মত, কে জানে।

কখনও বা শুনি চার নম্বর সেণ্টরির বুটের শব্দ। সেও পায়চারি করছে আমারই মতন।

মাঝে মাঝে নজরে আসে চিকমিক করা তার বেয়নেটখানা। আনন্দে ভরে ওঠে মন, সাহস বাড়ে খুবই।

চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম আরও কিছুটা সময়। আবার ঘিরে ধরে চিন্তা। সব কিছু ঝেড়ে ফেলে ভাল করে সজাগ হয়ে আবার নজর রাখি চারিদিক।

থেকে থেকে নজর যায় ঐ টিপিটার ওপর। মাত্র কুড়ি গজ।

শিউরে উঠি আমি।

শুনেছিলাম সেদিন গুলির শব্দ। দেখেছিলাম ভোরের আলোয় বগলার দেহখানা। মাথাটা হয়েছে তার খণ্ড খণ্ড, ঝুলে আছে খুলিটা।

মোটেই চেনা যায় না তাকে।

ছুটো বাজতে কি এখনও অনেক দেরী ?

তাইতো, কে যেন নড়ে উঠলো, সেই ঝোপটার ভেতর।

তবে কি হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এসে পিছন থেকে ছুরি মেরে, বন্দুকটা হাতিয়ে নিয়ে এগিয়ে পড়বে ভেতরে ?

তা মোটেই অসম্ভব নয়। এমনও তো হয়ে গেছে অনেক।

এবার পরিষ্কার দেখছি, ঐ দূরে কারা যেন আসছে সারবন্দি হয়ে। লক্ষ্য তবে কি ছাউনির ওপর। দেখছি তাদের শোওয়া, বসা—হামাগুড়ি দিয়ে চলা। স্পষ্ট দেখলাম একজন যেন সোজা খাড়া হয়ে মিলিয়ে গেলো আকাশে।

আচ্ছা, ওটা কী ? বিরাট দৈত্যের মতন কে যেন বসে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে আমারই দিকে ?

গা ছম ছম করে ওঠে।

ছাড়লাম একটা বুলেট।

কড়কড় শব্দ করতে করতে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।

ঘুরে ফিরে আবার আপনা হতেই চোখ ঘুরে যায় ঐ টিপিটার ওপর।

ঐ না, আমাদের সেই সাথী বগলা? নিশ্চিন্তে বসে আছে যেন একমনে।

চমকে উঠি, উদ্বেগ আরও বাড়ে।

মনে মনে ভাবি, এরা কারা? সবই কি মনের ভুল?

বুকের গুলি ভরতি পাউচের ওপর হাত রেখে শক্ত করে ধরি রাইফেল।

বেশ উপলব্ধি করছি, আজ পারাজিত আমি। আমারও অতিক্রম করেছে আজ সাহসের সীমা, চিন্তায় করেছে আমায় কাবু।

পিছন দিকে তাকাই, দেখি ছাউনির আস্তাবল। তা প্রায় পঞ্চাশ গজ। এক এক কদম পিছু হটি। হঠাৎ কিসে ঠেকি।

চেয়ে দেখি আস্তাবলের ঘোড়া। নতুন সাথীদের পেয়ে কাছ ঘেসে দাঁড়াই। ধীরে ধীরে হাতখানা বুলিয়ে দি তাদের অঙ্গে। তারাও কাঁপায় তাদের গা শব্দ ক'রে—ভরর ভরর ভরর......

এখন বেড়েছে আমার সাহস। ভোজবাজীর মত অন্তর্ধান হয়েছে আমার উদ্‌বেগ, এসেছে অফুরন্ত উৎসাহ।

এখন ভয় গেছে সরে। তবে, এক চিন্তা হয় বিলুপ্ত, আর এক চিন্তা জাগে।

সময় কোথা দিয়ে কেটে গেছে জানি না। চমক ভাঙলো, ঢং ঢং করে বেজে ওঠা ছুটোর ঘণ্টা শুনে।

তাইতো কোথায় আমি! পোষ্ট ছেড়ে এখানে। তবে কি হাজত—কোর্ট মার্শাল?

ক্ষিপ্রগতিতে হাজির হই নিজের বিটে। মন হয় অস্থির। আবার জাগে চিন্তা। ভাল করে আঁকড়ে ধরি রাইফেল। নজরে আসে বন্দুকের নল—ভাবি গলার নলী।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যেমন দারুণ পরিশ্রম, তেমনই অভাব নেই আড্ডা-ইয়ারকি বা হাল্‌কা আনন্দের। নিত্যই ছোট-বড় এক একটা দল বেঁধে দিন গুজরান করে এই ফৌজীর দল। চলে গান, চলে গল্প—শ্লীল, অশ্লীল থেকে সুরু করে চলে ঠাকুর দেবতার নাম গান। আছে সবরকম। উঁচু নিচু সবই আছে।

এখনও রয়েছে স্বামিজীর আশ্রম,—আছেন স্বামিজী। নিত্যই বসে বৈঠক। আজও বসেছে সভা,—জমেছে দুপুরের শেষে।

বাগদাদের মত অতটা জাঁকিয়ে না থাকলেও, আজও ধুনির ওপর বসানো আছে ক্যানেসতারা ভরতি চায়ের জল। এখনও বজায় আছে আশ্রমের বাঁধাধরা নিয়ম।

আছে ভক্তরা।

আমিও আছি তাঁবুর এক কোণ ঘেঁষে।

দেখছি, আরজি পেশ করেছে প্রধান ভক্ত। জানিয়েছে স্বামিজীর কাছে। মাত্র তিন মাসের ছুটির আশায়।

শান্ত ধীর ভাবে স্বামিজী বলেন তাকে,—কেন এ বাসনা ভক্ত? আশ্রম যে বন্ধ হবে তোমার অভাবে। কে যোগাবে দিনের পর দিন এই আশ্রমের ভোগ?

সেও নাছোড়বান্দা। চলছে তার প্রার্থনা—অনুরোধ, উপরোধ। বলে, পূর্ণ করুণ স্বামিজী, আমার এ ক্ষুদ্র অভিলাষ। মাত্র কটা মাস বৈত নয়?

অন্য কিছু না বুঝলেও, বুঝছি নিছক পরিহাস, রঙ্গ তামাসার অভিনয়। নইলে এভাবে ছুটির আবেদন স্বামিজীর কাছে করবে কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটির চিন্তা আর বাতুলতা—একই। আজও শুনিনি কারও কাছে ছুটির প্রস্তাব। জানি ছুটির পথ, হাসপাতাল, আর পারেন আর্মি হেড-কোয়ার্টার—বড় জঙ্গী। সে চিন্তা বৃথা।

মঞ্জুর হল প্রধান ভক্তের ছুটি। স্বামিজীরই দেওয়া—মাত্র দু'মাসের।

সংগে সংগে বাঁধাবাঁধি হল তার বিছানা-কিটব্যাগ। দেখলাম নতুন প্রধান ভক্তের অভিষেক। শুনলাম তার ভাষণ। হল কোলাকুলি একের পর এক। সব শেষে স্বামিজীর উপদেশবাণী শুনিয়ে শেষ হল প্রধান ভক্তের ছুটির পর্ব।

তাঁবুর কোণটিতে বসে মগ দুয়েক চা সেবা করে দেখলাম প্রহসন।

ভক্ত নৃপতির খেলার উৎসাহ খুবই। পাশ থেকে স্মরণ করালো ফুটবল মাঠের কথা।—ওরে, আজ যে ডেভন্‌সায়ারের সংগে ফুটবল খেলা—যাবি না?

হুটোপাটি করে দৌড়োলাম খেলার মাঠে।

দেখছি খুব হৈচৈ-এর মধ্যে হচ্ছে ফুটবল খেলা। গুরুদেবেরই চিৎকার ছাপিয়ে উঠছে সবার গলাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার ছাড়ছেন—বাগ্ আপ্ বস্তিবাটী—বাগ্ আপ্ বস্তিবাটী বলে।

বুঝছি না বস্তিবাটী বলার অর্থ। জিগ্যেস করলাম—গুরুদেব, এভাবে বস্তিবাটী বলার মানে?

প্রাণখোলা হেসে বলেন—আরে, তা জান না! ভাখো, জেতার চেয়ে খেলার আনন্দ বড়। বাহাদুরী দেওয়া দরকার উভয় পক্ষের খেলোয়াদের, সেজন্যেই তো চিৎকার দিয়ে বলছি—বাগ্ আপ্ বোথ্ দি পার্টি। তবে কিনা উত্তেজনাতে বেরিয়ে যাচ্ছে—বস্তিবাটী।

বিকেল পার হয়ে গেলো। চলে গেলো দিনের আলো। নেমে এলো অন্ধকার।

ছাউনিতে ফেরা মাত্রই শুনলাম স্বামিজীর তাঁবুতে কিসের যেন শোরগোল। দেখছি, ব্যস্ততার মধ্যে আছে সেরা ভক্তরা। স্বামিজীকেও দেখছি, খুবই চঞ্চল।

জিগ্যেস করলাম—স্বামিজী কী ব্যাপার, অত ব্যস্ত কেন?

জবাব দেন গম্ভীর হয়ে—সারমেয় দংশন।

বাধা দিয়ে বলে, ভক্ত কুন্ডু—না স্বামিজী, কুকুর নয়—শেয়াল।

আমিও ব্যস্ত হয়ে বলি—সে কী, শেয়াল! কাকে কামড়েছে?

আমার প্রধান ভক্ত রঘুকে।

দেখলাম ভক্ত-রঘুর ক্যাম্প হাসপাতালে হাজিরি, চলছে পরীক্ষা পর্ব, ছাউনির ডাক্তারের।

শুনলাম, পল্টনের পক্ষে কুকুড় কামড় কেসটা নাকি বেজায় গুরুতর, তাই ওসব রোগীকে মোটেই রাখা হয় না ছাউনির বা ফিল্ডের বড় হাসপাতালে। ভক্ত রঘু হাসপাতালে হাজির হওয়া মাত্র, কুতের থেকে এই রাত্রেই পাঠানো হল তাকে ভারতে।

স্বামিজীর তাঁবুতে বসে উপভোগ করেছিলাম, ভক্ত রঘুর বাড়ী যাওয়ার অভিনয়। এবার দেখলাম সত্যিই সে চলে গেলো। তবে রেখে গেলো তার বাড়ী যাওয়ার এক অদ্ভুত রহস্য।

অনিলদার সংগে দেখা হল। উৎসুক হয়ে জানালাম ভক্তর বাড়ী যাওয়ার ঘটনা। তাচ্ছিল্যের সংগে বলে ওঠে—অবাক হবার কি আছে রে?—ওটাতো একটা কাঁচির কারসাজি মাত্র।

কী বলছো অনিলদা! সে চলে গেলো কাঁচি দিয়ে পা ফুটো করে?

হ্যাঁ, তাই। পায়ের গুলিটা ধরে একটা কাঁচি দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করলে, হুবহু ফুটো দাঁত বসানোর মত গর্ত হয় বৈকি।

নতুন কথা শুনলাম আজ অনিলদার মুখে। তবু বললাম তাকে—আচ্ছা অনিলদা, তোমার তো এত সাহস, এম-পি (মিলিটারী পুলিশ) হয়েও তো অনেকদিন কাটালে পল্টনে। আচ্ছা তুমি কি পারো ঐভাবে পা ফুটো করতে?

স্থির ভাবে জবাব দেয়—ভাখ, কিছুমাত্র শক্ত না কাঁচি দিয়ে পা ফুটো করা, তবে শক্ত ওভাবে বাড়ী যাওয়া। শক্ত অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। সব সৈনিক কি সমান? ওরা যেটা পারে হয়তো অন্য ফৌজী সেটা পারে না—বরং ঘৃণা করে। তোকে এর আগেও বলেছি, পল্টনে কাটাতে হলে চলতে হবে সৈনিকেরই মতন। সৈনিক হবে তেজী,—হবে না কাপুরুষ। ছল, চাতুরী, নীচতা তার মধ্যে থাকা উচিত কী? যে তার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যার কাছে ত্যাগই বড়, সে কেন অত ছোট কাজ করবে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার সুরু করলো—শোন, আজ তোকে তবে একটা কথা বলি, ভাখ, খবরদার তুই ওদের সঙ্গে আর মিশবি না, চায়ের আসরে আর বসবি না।—কী, চুপ করে আছিস যে? আমার কথা ভালো লাগলো না বুঝি?

আবার শেষ হয়ে যাচ্ছে গরমের পালা। এসে গেলো শীতের হাওয়া। এখানেও আবার তোড়জোড় হচ্ছে দুর্গাপুজোর। এবার ঢাক-ঢোল নেই। কলাগাছ জোটেনি। মেলেনি জোড়া বেল। কাঁচের প্রতিমাও নেই। এবার পুজো হচ্ছে কুতের বাজার থেকে আমদানি করা আরবী-ঘট। ফলেরও খুবই অভাব। আঙুর, নারিঙ্গী, আনার না পেলেও, মজুত আছে কাঁকড়ি-খেজুর।

মোটের ওপর, বাগদাদের মত জাঁকজমক না থাকলেও, আছে আনন্দ। ভজন-ভোজন সবই আছে। তবে অভাব বোধ করছি ঠাকুরদার। সে আজ নেই, কোথায় যে গেলো।

পুজো শেষ হল। সংগে সংগেই খুবই জেঁকে উঠছে টিক্‌রিট যাবার গুজব। প্রতি দিনই অপেক্ষায় আছি হুকুমের। রোজই উড়ছে ল্যাট্রিনের গুজব।

এবারেও হল তাই। হুকুম অবশ্য পেলাম—তাঁবু তোলার, বাঁধা-ছাঁদার। তবে উপরে নয়, নিচে। একেবারে নিচে।

শুনলাম যেতে হবে বসরার ঠিক অপর পারে—জাহাজ নৌকোয় ভরা সেই চওড়া নদী,—সেট্-এল্ আরবের ওপর, ছোট্ট একটা জায়গায়। যাকে গোরারা বলে,—ট্যানুমা,—দেশী কথায়, তনুমা।

খেজুরগাছ, আনার আঙুরের বাগিচা আর চাষ আবাদের জমি নিয়েই এই তনুমা গ্রাম। ইমারত তো দূরের কথা, একখানা ইটও নেই এই তনুমায়। বেশীর ভাগই বাড়ী চাটাই ঘেরা, মাটি লেপা। ওপারের বসরা বা আসার শহরকে নিয়েই এই তনুমার গর্ব।

ছোটখাটো দু'চারটা আরবী দোকান থাকলেও আমাদের তাতে সুবিধে কিছুই নেই। তবে ছাউনির একপাশে একজন ভারতীয় শেঠজী দোকান খুলেছেন আজ ক'দিন। চা-পকৌড়ি নিয়েই তাঁর দোকান। এরকম লাইসেন্স করা দোকান থেকে কিনে খাওয়ার বাধা নেই। অতএব চলছে এখন পকৌড়ির পর্ব।

এখানেও কামাই নেই গার্ড-ডিউটি। এয়ার ক্র্যাফট্, রিমাউন্ট ডিপো, অয়েল ডাম্প ছাড়া বেশ একটা মোটা দলকে যেতে হচ্ছে হাসপাতালের যুদ্ধ বন্দিশালায়—ভুকি ওয়ার্ডে।

মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়েসের সুন্দর-সুশ্রী অনেক তুর্কি আসকার (সৈনিক) দেখলাম হাসপাতালের বন্দি-ওয়ার্ডে ডিউটিতে গিয়ে। দোস্তি করে আলাপ জমালাম ইশারায় হাবভাবে। বোবার মতন হাত মাথা নেড়ে কথা বললাম খিচুড়ি ভাষায়। তারাও বললো তুর্কি ভাষায়। কেউ কারও ভাষা না বুঝলেও, মনের কথা বোঝাবুঝি হল প্রাণভরা হাসি দিয়ে। তারাও হাসে, আমিও হাসি। এখন এই হাসিই হয়েছে আমাদের ভাষা।

দেখলাম, ওরা ইংরেজদের ওপর বেজায় চটা। জানিয়ে দিলো ডান হাতের তর্জনী বাঁ তর্জনীর মাঝখানে ঠেকিয়ে। চোখ পাকিয়ে বলে, ইংরেজ তুর্কি ই নমুনা, (এই রকম) ইংলিশ নো গুড।

পরক্ষণেই আনন্দে মেতে গিয়ে দুতর্জনীর ডগাদুটো একত্রে ঠেকিয়ে বলে—হিন্দি তুর্কি ই নমুনা, বরাবর,—হিন্দি গুড। (এই রকম, সমান ভাল)

আমিও পাল্টে বলি—তুর্কি-হিন্দি বরাবর, তুর্কি গুড।

আনন্দে উপছে পড়ে আমার কথা শুনে। চুপি চাপি দিতে আসে মুঠো ভরতি খোবানি।

আমি শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি বন্দি আসকার-রফিগের দিকে। ভাবি, এরাই আমাদের শত্রু। এদেরই মারতে আসা ॥

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে গরমকালের কুইনাইন্ প্যারেডের মত এখানে সুরু হয়েছে আর এক নতুন প্যারেড।

দেহটাকে ঠিকঠাক চালু রাখবার জন্যে খুব কণকণে ঠাণ্ডার দিন চলে এই নতুন প্যারেড—রাম প্যারেড।

ক্যাম্প হাসপাতালের তরফ থেকে বিলি করা হয় মাথা পিছু এক আউন্স্ রাম (মদ)। তদারক করেন ডাক্তার ক্যাপটেন স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে।

অন্য প্যারেডগুলো যোগীনদার কাছে কিছুটা কষ্টের হলেও, এ প্যারেডটা তার কাছে খুবই মজাদার। উৎসাহের সংগে অপেক্ষা করে রাম ফল-ইন এর।

প্রথম দিন রাম-প্যারেড কথাটা শুনে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও, মগজে এলো মগ হাতে নিয়ে ফাইলে দাঁড়িয়ে। শুনলাম, নিতে

হবে নিজের রসদের মদটুকু, হাতের মগে করে। কুইনাইন প্যারেডের মত ডাক্তারের সমক্ষে পান করার বাধ্যবাধকতা না থাকলেও নিতে বাধ্য আমি, নচেৎ সেই দণ্ডভোগ। অগত্যা লাইনে দাঁড়িয়ে অপর সাথীদের মত আমিও নিলাম আমার ভাগের রামটুকু।

ভাবছি, মদ নিয়ে করবো কি?

ফাইল থেকে বেরিয়ে আসবার মুহূর্তে, আমার কাছে খুবই ব্যস্ত ভাবে এসে হাজির হাবিলদার সাঁইত্রিশ—চক্কোত্তীদা। আচমকা আমার হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই মুরুব্বি অবিভাবকের মত ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—এই তিনশো তেতাল্লিশ, এঁ্যা, এ কী ব্যাপার? তোমার এতোটা অধঃপতন হয়েছে। ছিঃ, লজ্জা করে না এ-ভাবে মদ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতে? আচ্ছা, সবুর কর, এসব গুণের কথা আজই আমি জানিয়ে দিচ্ছি তোমার বাড়ীতে।

থতমত খেয়ে গেলাম হাবিলদার সাহেবের ধমক শুনে।

জোরের সংগে সাফাই গাইলাম,—কই, আমি তো এক ফোঁটাও খাইনি। শুধু মগে করে নিয়েছি মাত্র নিজের রসদের রামটুকু—নইলে ডাক্তার যে পেশ করবে।

দেখলাম, আমার কৈফিয়ত শেষ হবার আগেই চক্কোত্তীদা গম্ভীর ভাবে আমার রামটুকু ঢেলে নিলেন তাঁর নিজের মগে। ভাল করে সমঝে দিলেন। বললেন—যাক খাওনিতো? তা বেশ, ভালই করেছ। খবরদার খেও না যেন, খুব হুসিয়ার।

আমাকে সাবধান করেই, আর একটুও অপেক্ষা করলেন না। দেখলাম, তাড়া হুড়ো করে সরে গিয়ে পাকড়াও করলেন আমারই সমবয়সী আর এক জোয়ানকে। নতুন করে সুরু করলেন তার ওপর খবরদারী।

চক্কোত্তীদা রামটুকু নিয়ে চলে যাবার পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে এসে হাজির আমার প্রধান মুরুব্বি—যোগীনদা। পায়ে কাদামাখা গামবুট, মাথায় ব্যালাক্লাভা ক্যাপ, হাতে দস্তানা, গায়ে ভেষ্ট-জার্সি, কোটের ওপর গ্রেট-কোট, তার ওপর বরসাতি।

কাছে এসেই হুকুম করলো। এই, তোর রামটুকু আর কাউকে দিবিনি, আমার জন্যে রেখে দিবি—বুঝলি?

বললাম—আমার কাছে তো রাম নেই। জানালাম, রাম-রহস্য।

মুশড়ে পড়লো আমার কথাগুলো শুনেই। রাগ ঝাড়লো হাবিলদার সাহেবের ওপর।

ফাঁকি দিয়ে রাম বেদখল হওয়ার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো আমায় ভাল করে।

শুনলাম ওস্তাদজীর কথা। বললাম—তা, নিয়ে গেছে ক্ষতি কি? আমার তো ওতে লাভ-লোকসান কিছুই নেই।

হ্যাঁ আছে বৈকি, ছাখ—ওটা তোর রসদ। ঝুটমুট কেন দিবি? কখ্খনো ভবিষ্যতে কিছু না নিয়ে ওটা হাত ছাড়া করবিনি। বদলে নিবি বিস্কুট, চকোলেট—যা হোক একটা কিছু।

প্রায়ই চলে এরকম রাম প্যারেড। চলছেও অদল বদল। কিন্তু জবর রাম প্যারেড হয়ে গেলো আজ সন্ধেবেলায়। ব্যাপারটা মাত্র মিনিট পাঁচেক চালু থাকলেও, হয়েছিল কিন্তু আতঙ্কের। শিউরে উঠেছিলাম ফৌজীদের কাণ্ড দেখে।

জখম যে কেউ হয়নি, তার একমাত্র কারণ সৈনিকদের অভ্যাসগুণ।

আজ সারা দিন টিপটিপ বৃষ্টির সংগে বইছে কণকণে ঠাণ্ডা হাওয়া। জল জমে হয়ে গেছে বরফ। ফায়ার বাকেটকে নাড়া দিলে শব্দ হয় খড় খড়। খাল নালায় ঢিল ছুঁড়লে কানে আসে শব্দ—খটাস। দুচার কদম চলা দায়, চারিদিকে হাঁটু ভরতি কাদা। গামবুট পরেও চলা কষ্ট। কাদায় আটকে যায় জুতো, বেরিয়ে আসে পা। সবরকম বসন চড়িয়েও কেঁপে মরছি শীতে। কাঁপুনি থামাবার কিছুটা উপায় চা-কফি। তাও খাচ্ছি মগের পর মগ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি দেওয়া হল মাথা পিছু এক আউন্স রাম। নানারকম ফিকির-ফন্দি করে রাম-ভক্তর দল অভক্তদের কাছ থেকে যোগাড় করে, করেছে মগ ভরতি। যে যার তাঁবুর মধ্যে মশগুল হয়ে করছে মৌজ। জমজাটের ওপর হচ্ছে গান। এক তাঁবুতে কাওয়ালি, অপর তাঁবুতে গজল-ঠুংরি। বাজছে হারমোনিয়ম, ঠুকছে তবলা।

হঠাৎ সব হট্টগোল ছাপিয়ে সুরু হল আর এক গোলমাল। কানে আসছে কেবল ভোঁ-ভোঁ শব্দ। শুনছি একটানা বেজে চলেছে জাহাজগুলোর বাঁশী। শুনছি কামানদাগা,—ছাড়ছে যেন একের পর এক। তাইতো—কিছুটা যেন অস্বাভাবিক।

দেখতে দেখতে এলো খবর। ছড়িয়ে পড়ছে ছাউনিতে। চিৎকার ক'রে শুনিয়ে যাচ্ছে—আর্মিষ্টিস্—আর্মিষ্টিস্।

আনন্দে আত্মহারা ইংরেজ অফিসারের দল। নিশ্চিন্ত মনে সুরু হল তাঁদের হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডি। সৈনিকদের জন্যেও হুকুম হল—মুক্ত করে দাও রামের ছিপি।

ব্যস, হুকুম পেয়েই আদেশ পালন। দেখলাম, চোখের পলকে উজাড় হয়ে গেলো রাম ভরতি পিপে।

রাম-ভক্তরা রাম সেবা করলেও করেনি বেয়াদবি। বে-এক্তিয়ার হলেও হয়নি বেহুঁস। শুধু চলেছে গান বাজনা, হাসি-কান্নার কোলাকুলি।

পিছনের তাঁবুতে ইংরেজ গুরুজীদের অবস্থাও তথৈবচ। তারাও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে করেছে রাম সেবা। চিৎকার করে ধরেছে কোরাস—ইট্‌স্ এ লঙ ওয়ে টু টিপারারী—ইট্‌স্ এ লঙ ওয়ে টু গো।

জবরদস্তি করে লড়ায়ে পাঠিয়েছে ওদের সরকার, এবার নাকি বাড়ী ফিরবার সুযোগ মিলবে, তাই আনন্দে মেতে গিয়ে করছে ফাঁকা আওয়াজ। ছাড়ছে ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজ। শব্দ হচ্ছে—দুম-দাম, গুড়ুম-গাড়াম।

আগেই ভাল ভাবে জেনেছি, গুজবের কামাই নেই,—নেই সময় অসময়।

এবারেও জানিয়ে দিলো। রটলো গুজব,—ছড়ালো মুখে মুখে।

চিৎকার করে বলে গেলো, গুলি দেগে আনন্দ কর,—ছাড়ো, ছাড়ো দশ রাউণ্ড বুলেট, সদ্য এসেছে হুকুম—হুকুম এড্‌জুটেণ্টের।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো রামসেবীর দল। তুলে নিলো হাতিয়ার। দশ-দশটা গুলি ভরে আকাশের দিকে নল ঘুরিয়ে করলো সুরু রাম-লীলা।

আমি আজও রাম সেবায় অনভ্যস্ত। শুধু আমি কেন, আমার মত আছে অনেক। তাই ওদের মত হইনি বেচাল, তবে কসুর করিনি গুলি ছাড়তে। বেপরোয়া হয়ে আমিও চালালাম দশ-দশটা তাজা গুলি।

ব্যাপার দেখে শুনে অস্থির হয়ে পড়েন অফিসারের দল। তাঁবু ছেড়ে আসেন বাইরে। হুকুম দেন বিউগলারকে—বাজাও সিজ্ ফায়ার।

বিউগলারের দল বাইরে আসে। বাজায় তারা—সিজ-ফায়ার।

চমৎকার। দেখলাম আজ, আর এক অদ্ভুত কাণ্ড। ফৌজীর দল দেখিয়ে দিলো ম্যাজিক। যারা এইমাত্র ছিলো উন্মত্ত, জ্ঞানহারা, তারা নিমেষের মধ্যে হয়ে গেলো শান্ত। মাত্র বার তিনেক বিউগিলের শব্দে, সবই হল নিস্তব্ধ। থেমে গেল গুলি দাগা॥

শীত চলে গেছে অনেক দিন, থেমেও গেছে টিপটিপ বৃষ্টি। শুকিয়ে গেছে কাদা। যুদ্ধও থেমে গেছে আজ ক'মাস। বন্ধ হয়েছে মানুষ মারা, কিন্তু আজও বন্ধ হয়নি খিচুড়ি রন্ধন—একটুও কমেনি পরিশ্রম।

এখনও রাতের পর রাত কাটাচ্ছি মাঠে-ঘাটে। অপর পল্টনেরও একই ভাব। তারাও বলে ঐ পরিশ্রমের কথা। তবে, কমেছে এক ঘেয়েমি।

এখন স্বচ্ছন্দে পারাপারি করছি ফেরি-ষ্টিমারে। প্রায়ই যাচ্ছি আসার শহরে।

এখন আমার সাথী এ পাড়ার শিশু-রফিগের দল, আর সাথী ঈশাবেল। সামান্য ফুরসত পেলেই ওদের নিয়ে আমোদ করি। বায়স্কোপ দেখি। বাল্লাম চড়ি। ছুটোপাটি করি ডালিম গাছের নিচে। ঘোরাঘুরি করি নদীর ধারে।

এই তন্নুমাতেই আঙুর-আনারের বাগিচা ঘেরা ঈশাবেলদের বাড়ী। ওপারে আসার বাজারে তাদের ষ্টোভ মেরামতের দোকান। বেশ চালু দোকান। ষ্টোভ মেরামত নিয়েই তার বাবার সংগে হয় আলাপ।

এখন প্রায়ই আসি তাদের দোকান ঘরে। আসর জাকিয়ে বিনা দুধ চিনিতে কফি পান করি। খাই লুবিয়া (বরবটির বিচির সুপ্)। সেদিন খাওয়ালো সেরা খেজুর। বিচি তার ধানের মত। শুধু তাই নয়, দেখালো, খেজুর চাষীর কেরামতি। দেখলাম, কৃত্রিম উপায়ে পুরুষ গাছে ফল ধরানো।

একমাত্র মেয়ে ঈশাবেলকে নিয়েই কাটে তাঁদের দিন।

লাজুক হলেও যথেষ্ট আমুদে এই ঈশাবেল। তার গুণও আছে অনেক। সে অনেক ভাষা জানে। আরবী ফারসী ফরাসী ছাড়াও,

জানে ভাঙা ভাঙা ইংরেজী। তবে অবাক হয়েছিলাম তার মুখে হিন্দি-উর্দু মেশানো গান শুনে।

ঈশাবেলই বলেছে আমায়, তার বাবা ভারতীয়, মার বাড়ী দামাস্কাস্। যুদ্ধ বাধবার আগেই তারা এই বসরায় আসে। আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি যুদ্ধের হিড়িকে।

এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মা'র মন ছুটেছে দামাস্কাসের দিকে। বাবার অমন জাঁকালো দোকান, তাই যত সমস্যা ঐখানেই।

আসকারদের ওপর ঈশাবেল বেজায় বিরূপ। তাদের দুর্নাম দিয়ে বলে—হাম্ মালুম,—আসকার নো গুড—মুজেন, (খারাপ) একদম খারাপ। ভেরি ক্রুয়েল।

প্রতিবাদ জানিয়ে আমিও বলি—নো, ঈশাবেল, তামাম আসকার (সৈনিক) নেহি।

আমি আসকার হলেও নাকি ছেলে ভাল, এ সাধুবাদ তার মার মুখে শুনলেও ঈশাবেলের ভাবটা যে কি তা আজও জানি না। তবে সে কিন্তু প্রায়ই বলে, এখন যুদ্ধতো শেষ হয়ে গেছে, নাম কাটিয়ে চল না আমাদের সংগে দামাস্কাসে।

আমিও আমাদের মার্কামারা পাঁচমিশুলি ভাষা নেড়ে চেড়ে বলি—তার চেয়ে চল না তোমরা হিন্দুস্থান।

উধার বিগ-বিগ বেত (বাড়ী) আকু (আছে) প্লেনটি খানা আকু, সব-কুছ আকু। যায়েগা ?

একটু কি ভাবে, বলে—হিন্দুস্থান যে ভাল, তা আমি জানি, তবু দামাস্কাস আমি ভালবাসি, খুব ভালবাসি।

যাবে তুমি, যাবে আমাদের সংগে দামাস্কাসে ?

মজা শুধু বাইরে নয়, ছাউনিও এখন সরগরম। জেঁকে উঠেছে আশপাশেও। পাশেই আছে কন্‌ভেলেসেণ্ট ডিপো। ফৌজীদের কথায় কমজোরী ডিপো।

হাসপাতালে রোগ মুক্ত হবার পর দুর্বল সৈনিকদের একটা আস্তানা এই কমজুরী বা কমজোরী ডিপো।

ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রচুর খানা-পিনার সংগে সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আছে

আরামের মধ্যে নানারকম আমোদ প্রমোদ। দেখছি হরেক-রকম পল্টনের সৈনিকদের মিলনক্ষেত্র এই কমজোরী ডিপো।

এখন নতুন আবহাওয়া পাল্টে দিয়েছে ছাউনির রূপ। নিত্যই বসছে মজলিস, জমছে গানের আসর। ঐদিন আমাদেরই এক জোয়ান দেখালো ভেল্‌কি।

হেঁটে গেলো আগুনের ওপর।

হ্যাঁ, সত্যিকারের আগুন। আটমন কাঠ পুড়িয়ে তৈরি হয়েছিলো জ্বলন্ত চিতা। চলাফেরা করলো তারই ওপর।

না, জুতো পরে নয়। এলো-গেলো খালি পায়ে। তাক লাগিয়ে দিলো শুধু আমাদের নয়—অবাক হলেন অনেক জাঁদরেল ইংরেজ অফিসারের দল।

আবার সেদিন হয়ে গেলো আবৃত্তির পরে নাচ-গান।

পরী সেজে নাচলো এক সাথী। হাজির ছিলো পাশের সাথীরাও—ঐ কন্‌ভেলেসেণ্ট ডিপোর। পেয়েছিলো তারা আনন্দ। উপভোগ করেছিলো খুবই। শুধু কি তাই? আসর দেখে তাদেরও জাগলো উৎসাহ। তারাও করলো নাচের তোড়জোড়।

জানালো আমন্ত্রণ।

আমরাও দল বেঁধে দেখে এলাম ওদের আসর।

দেখলাম মাথায় লম্বা কেশরাশির সংগে বিরাট গুম্প-শশ্রুওয়ালা কমজোরী-জোয়ান সাথীদের চম্পল পায়ে ঘুঙুর জড়িয়ে নাচ।

ওড়না মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাড়ি-গোঁফ ঢেকে রুমাল ঘুরিয়ে নাচলো তারা ঢোলের তালে।

হ্যাঁ সত্যি, দস্তুর মত গোঁফদাড়ি নিয়েই সখি সেজে তারা নাচলো। তাদের পক্ষে সম্ভব নয় দাড়ি বর্জন। তাই এই ব্যবস্থা।

তা হোক। সে নাচে কলা নৈপুণ্য না থাকলেও, ছিলো আনন্দ। তাদের আনন্দের মধ্যে আমরাও আমোদ করলাম প্রচুর। খোশ মেজাজে উদরস্থ করলাম প্লেট ভরতি পকৌড়ি ভাজার সংগে পুরো একমগ গরম মসলা দেওয়া পাঞ্জাবী পল্টনীয়ার চা।

এদেশে কফির ব্যবহার যথেষ্ট থাকলেও আজ পর্যন্ত খেলাম বহুরকম চা। পাঠান সাথীর তাঁবুতে বসে প্রচুর দুধ চিনি মেশানো মালাই চা

যেমন খেয়েছি, তেমনই আরব-ইহুদির কফিখানার রেওয়াজ দুধ চিনি বর্জিত চা। তাও পান করি না এমন নয়, সময়ে তাও চলে।

করাচির পোড়া দুধের ধোঁয়া গন্ধ চায়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সেই মাকিনার জাঠ পল্টনের লাংগারখানায় বসে মাস কড়ায়ের ডালের জলের চায়েও তো সেদিন দিলখোশ কিছু কম করেনি।

আবার বোলতা ভরা ভেলিগুড়ের চাও যে যথেষ্ট মৌজের, তাও জেনেছি বহুদিন আগেই—সেই বাগদাদে।

তবে, দুধের বদলে হরলিক্‌স আর চিনির বদলে গ্লিসারিন মেশানো চা আমাদের বরাতে না জুটলেও, শুনেছি ওটাও চালিয়েছিলো নাকি এম্বুল্যান্স-কোরের দল—সেই কুত-এল-আমারার যুদ্ধে,—বন্দী হবার আগে।

অতএব, এটা আমরা জোরের সংগে স্বীকার করবো,—এই যুদ্ধক্ষেত্রে একাধারে কামান মেসিনগানের যেমন আয়োজন, তেমনই প্রয়োজন চা। তা দুধ চিনি মেশানো হোক বা নাই হোক। শুধু আশা করি মগ ভরতি গরম জলে চায়ের পাতার কষা গন্ধটুকু—ব্যস্, তা হলেই হল।

কমজোরী ডিপোতে নাচের আসরের পর পকৌড়ি ভাজা যেমন উপাদেয়, তেমনই, তাদের পিছনেই গোরা ফৌজীদের ওয়াই এম সি এর তাঁবুতে মজা কিছু কম নয়।

ভারতীয় সৈনিকদের ঐ তাঁবুতে যাবার বাধা আছে কি না জানি না, তবে প্রায়ই যাচ্ছি অনিলদার সংগে। সেখানেও আলাপ জমে। তারাও খাতির করে দেয় চা, সংগে থাকে জিনজার বিস্কুট। দেখিয়ে দেয় বিলিয়ার্ড টেবিল, বাড়িয়ে দেয় কিউ।

এবার আমাদের ছাউনিতেও তিন তিনটে তাঁবু জোড়া দিয়ে খাড়া করা হয়েছে, ওয়াই এম সি এ।

এখন ঐ তাঁবুতে বসে দিব্যি গ্রামোফোনের গান শুনি। মেতে থাকি পিঙ-পঙ ছাড়াও বিলিয়ার্ডের হেরফের ব্যাগাটেলি খেলে। শুধু তা-ই নয়, এসে গেছে বই-কেতাব থেকে সুরু করে আরও কতো রকম খেলার সরঞ্জাম।

এখন দিনগুলো যাচ্ছে ভাল। এক দিকে যেমন গার্ড ডিউটি, অপরদিকে ওয়াই এম সি এর তাঁবুর মধ্যে মাতামাতি।

এ সবের মধ্যে দিয়ে হৈ চৈ করে দিনগুলো কাটালেও যথেষ্ট বিড়ম্বনা গার্ড মাউন্টিং।

এই গরমে পাক্কা দেড় ঘণ্টা গার্ডমাউন্টিং-এ দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে শুধু ঝঞ্ঝাটের নয় আতঙ্কেরও। কিন্তু, এই ভয় ভাবনার বোঝা নিয়ে গার্ড ডিউটিতে মোতায়েন হবার আগে, আজ পর্যন্ত প্রতি বারেই দাঁড়াচ্ছি, গার্ড মাউন্টিংএ।

এমন কি, আজও এই মাত্র হাবিলদার মেজরের হুইসিলের শব্দ শুনেই এক দৌড়ে এসে হাজির হয়েছি পিছনের সারিতে।

দাঁড়িয়েছি ঠিক মতন, যোগীনদাকেই বাঁয়ে রেখে।

হুকুম হল এটেনসন্।

আবার কম্যাণ্ড, ফিক্স—বেয়নেট।

কায়দার ওপর আঁটলাম রাইফেলের সংগে বেয়নেট। এবার পিছনের সারিকে এক কদম পিছু হটিয়ে, তিন অফিসারে জোট বেঁধে চলছে ইন্সপেকসনের পর্ব।

যে সৈনিক সেরা চিকনদার সে পাবে ছুটি। দোষ ত্রুটিওয়ালা ফৌজীর ভাগ্যে জুটবে বোঝা নিয়ে বাড়তি প্যারেড, প্যাকড্রিল।

আমি কিন্তু না ঘরকা না ঘাটকা। পরিষ্কার অপরিষ্কারের মাঝ বরাবর হলেও ভয় করি—প্যাকড্রিলের। কি জানি, কখন কোন সুক্ষ্ম পথ ধরে ওটার যে আগমন হবে তা শুধু আমি কেন, অনেকের পক্ষেই বোঝা কঠিন।

তাইতো, হরার নম্বর টুকলো, চিনষ্ট্র্যাপ নাকি আলগা। নটবরের মাথার পিছনের চুলগুলো নাকি আধ ইঞ্চি বড়। তারও ব্যবস্থা হল প্যাকড্রিলের।

আমার মুরুব্বি এ সবের বিষয় বরাবরই হুঁসিয়ার। কাকাতুয়ার ঝুঁটির মত মাথার সামনে সামান্য এক গোছা চুল রেখে মুড়িয়ে ফেলেছে পাশ-পিছন। মাথার বিষয় সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

হরিবল্লভদা গ্র্যাজুয়েট হলেও, চটকদারীর অভাব। তাঁরও নম্বর লিখলো।

জানলাম বুটের ওপর পট্টি জড়ানো হয়নি কায়দা মতন, একটু ঢিলে।

সামনের সারি শেষ হল, এবার পিছনের পালা।

ঠিক ঠাক দাঁড়ালাম সোজা হয়ে। আড়চোখে তাকালাম অফিসারদের দিকে। দেখছি এগিয়ে আসছেন তাঁরা গদাইলশকরী চালে।

হঠাৎ উরুতের ওপর খোঁচা দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে যোগীনদা বললো, এই হাঁদা, তোর ব্যাণ্ডোলিয়ারটা কোথায় ?

আধমরা হয়ে গেলাম বুকের ওপর নজর পড়তেই। এ আবার কী হল ? নিমেষের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো ক্লান্তি, মনে হচ্ছে একটু একটু করে যেন মাটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি।

যতটা সম্ভব গলা চেপে জবাব দিলাম কাঁদো কাঁদো হয়ে,—ওয়াই এম সি এ-র তাঁবুতে পড়ে আছে যোগীনদা, পিঙপঙ খেলছিলাম খুলে রেখে ; হুইসিল বাজতেই দৌড়ে এসেছি, তাই ভুলে গেছি বুকে আঁটতে।

জবাব দিলো দাঁত খিঁচিয়ে,—সাবাস খেলোয়াড়। বেশ করেছিস, এবার তাহলে এখানকার খেল্‌টা একবার গ্যাখ।

পড়লাম অকূল পাথারে। চিন্তিত মনে আমিও তার উরুতে খোঁচা দিয়ে বলি, কী হবে যোগীনদা ? দোহাই তোমার, একটা মতলব দাও। তোমায় কতো রাম দিয়েছি, ভাবো তো।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, শুধু ঠোঁট দুটো নেড়ে,—এক কাজ কর, ঝপ্ করে পড়ে যা দিকিন্।

ওর কথাগুলো ঠিক বুঝতে না পেরে ভাবছি, কি করবো।

ব্যস্ত হয়ে আবার বলে উঠলো,—কীরে, ভাবছিস কি ? যদি বাঁচতে চাস তো এক্ষুনি পড়ে যা।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে জিগ্যেস করলাম,—কি বলছো, ভাল করে খুলে বল, পড়ে যাবো কেন ?

উত্তর দেয় চাপা গলায়, বলে দাঁত চিপে,—ওরে, বলছি, যেমন করে হিট ষ্ট্রোকে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে পড়ে যা।

এবার বুঝে ফেললাম ওস্তাদজীর কথা। তাই তো এ তো চমৎকার যুক্তি। আনন্দে নেচে উঠলাম মুরুব্বির মন্ত্রণা শুনে। ভয়ের মধ্যে ভরসা পেলাম। মনের মধ্যে জপছি কেবল, হিট-ষ্ট্রোক—সান-ষ্ট্রোক।

আর কিছুমাত্র দোমনা না করে মনে মনে, ওয়ান টু থ্রি বলেই ধপাস্ শব্দে পড়ি পিছনে। পড়েই হই উপুড়, চাপাদি বুকটাকে।

এবার আমি নির্জীব, সংজ্ঞাহীন।

হৈ চৈ উত্তেজনা কিছুই নেই। পড়ে যাওয়াও নতুন নয়। এই রোদের তাপে প্রায়ই ঘটে এরকম হিট-ষ্ট্রোক্।

পিছন থেকে দৌড়ে আসে দুই সাথী। তুলে নিয়ে হাজির করে

আমায় ওয়াই-এম-সি-এর তাঁবুতে। চোখে মুখে দেয় জল, বাতাস করে টুপি দিয়ে।

বুঝছি এবার আমার কাজ ফতে। ধীরে ধীরে সুস্থ হই, ভান করি জ্ঞান ফিরে আসার। নজর দি ব্যাণ্ডোলিয়ারের দিকে। তাড়াতাড়ি বুকে এঁটে আবার খাড়া হই নিজের গ্রুপে, দাঁড়াই মুরুব্বিরই পাশে।

শেষ হয়ে গেলো গার্ড-মাউন্টিং। হল দেখা-দেখির পালা। হুকুম হল—গার্ড-কুইক্-মার্চ।

গার্ড মাউন্টিং খতম হলেও, এবার কিন্তু সুরু হয়েছে যোগীনদার পালা। অফিসারদের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও, কথা শুনছি তার। বকে যাচ্ছে আপন মনেই—হুদেদার (নন্ কমিসণ্ড অফিসার) হয়েছিস যদিও কিন্তু তুই বেজায় বেহুঁস। ছাখ দিকিন্, কি কাণ্ডটা আজ বাধিয়ে-ছিলি? ভাগ্যিস পাশে ছিলুম। তা আমি আর কতো সামলাবো বল্? এদিকে তোর গুমোরও তো আছে খুব। ভাল ভাল মতলব দিলেও তো সব সময় নিসনা। নইলে, সেদিন ঝুট-মুট কথা শুনলি কিনা প্যারেড মাঠে। র‍্যাঙ্কে দাঁড়িয়ে নড়ে উঠলি মুখের মাছি তাড়াতে, ধমকও খেলি সংগে সংগে। কেমন ঠিক হল তো?

তোকেতো কতোবার বলেছি,—নাকের ডগায় মাছি বসলে ওভাবে হাত দিয়ে মাছি তাড়াবি না,—তবু তুই হাত দিয়েই কিনা মাছি তাড়াবি! কেন বাপু একটু মেহনত করতে ক্ষতি কি?

প্রত্যুক্তি করলাম মুরুব্বির কথার। বললাম—তোমার অন্য সব কথা শুনতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মতন ওভাবে কান নেড়ে মাছি তাড়াতে পারবো না। সত্যি বলছি যোগীনদা, তুমি যে কি করে গরুর মত কান নাড়িয়ে মাছি তাড়াও তা তুমিই জান। এইতো সেদিন, তোমার কাছে ও কায়দার তালিম নেবার পর অনেক মেহনত তো করলাম—এক চুলও নাড়াতে পারিনি—পারবোও না কোনদিনও।

আচ্ছা বেশ, তা না হয় পারলিনি, ওটা কিছু শক্ত তা আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু নাকের মাছি? এটাতো খুবই সহজ। মাত্র দু'চারবার চেষ্টা করলেই তো মেরে দিতে পারিস,—এই ছাখ না, এরকম করে নিচের ঠোঁটটা সামনের্ দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জোরে একটা ফুঁ দিবি,—ব্যস্ তাহলেই তো মাছি পালাবে, কিন্তু দেখিস, একটুও নড়িসনি যেন।

তা তোকে বৃথা বলা,—আমার কথা তো শুনবিনি, তুই চলেছিস নিজের চালে !

তেরো

যাক্, এবারেও হয়ে গেলো। কতো উত্তেজনা, কতো গলাবাজি, বাগ্-আপ্, চীয়ার-আপ্ ছাড়া শুনলাম আরও কতো রকমের চিৎকার। যে যার কোম্পানির জয়ঢাক পিটিয়ে শেষ করলো এ বছরের মত পল্টনের স্পোর্টস্।

হল আজই। শুধু দৌড়-ঝাঁপ নয়। হল অনেক কিছুই। রাইফেল-সুটিং থেকে সুরু করে বক্সিং, কুস্তি ছাড়াও হল আরও কতো রকমের খেলা। যাকে বলে, এলাহী ব্যাপার।

পল্টনের রকমই আলাদা। সব কিছুতেই আড়ম্বর না থাকলেও চাকচিক্য আছে। নিখুঁত পরিষ্কার ছাড়াও সবার ওপরে আছে কায়দা কানুন, শৃঙ্খলা। মেনে চলতে হবে সকলকেই—দর্শক, প্রতিযোগী। চলেও সকলে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দরকার হয় না ভলাণ্টিয়ার। সব কাজ হয়ে যায় আপনা হতেই। হয়ও সুষ্ঠুভাবে। তবে হ্যাঁ—লুঙ্গি বা পাজামা পরে খেলার মাঠে হাজির হওয়া চলবে না। সেখানেও যেতে হলে সাফা-সুফির ওপর পরতে হবে সর্ট-সার্ট, আঁটতে হবে বুট-পট্টি, চড়াতে হবে মাথায় হ্যাট।

আবার ওদিকেও তেমনই।

মাঠ পরিষ্কার রাখা, তাঁবু জোড়া দিয়ে প্যাণ্ডেল তৈরি, রকমারি পতাকার মধ্যে ইউনিয়ন-জ্যাকের বাহার খুলিয়ে,—ব্যাণ্ড বাজিয়ে, বড় জঙ্গীকে গার্ড অফ্ অনার দিয়ে,—তবে সুরু হল পল্টনের পোর্টস্।

শুধু তাই নয়, ব্যবস্থা করা হয়েছিলো ভেতর-বাইরের সব জোয়ানদের জন্যে চা বিস্কুট কেক।

এ সব তো আছেই, কিন্তু সব চেয়ে বড় ব্যাপার—টাকা। হ্যাঁ, টাকা! পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হল খামে ভরা কড়-কড়ে নোট। তা কিছু কম নয়, দেওয়া হল প্রথম জোয়ানকে পনেরো টাকা, দ্বিতীয়কে দশ, তার পরেই পাঁচ।

দৌড়-ঝাঁপের ওপর আগ্রহ আমার বরাবরই। উৎসাহের সঙ্গে

পাল্লাও দিয়ে থাকি প্রতিবারেই, তা পারি আর না পারি। তবে, আশা রাখি আখেরে যদি ভাল কিছু ঘটে।

সত্যি, হলও তাই। এবারে আমি উতরে গেছি। অবশ্য তার বড় কারণ, আমার চেয়ে যারা পটু তারা এবারে ছাউনিতে নেই। কেউবা চলে গেছে হিন্দুস্থান, কেউবা আছে হাসপাতাল। অতএব এবারে আমি দু'চারটাতে বাজিমাত করলেও, শেষ পর্যন্ত কুপোকাত হলাম কিন্তু যোগীনদার কাছে।

এ কবছর পল্টনে কাটিয়ে রীতিমত ধারণা হয়েছিলো, আমি গড়ে উঠেছি পুরোমাত্রায়। বুঝলাম, এক্কেবারে ভুল, সব বাজে।

এই যোগীনদাই বোকা বানিয়ে বুঝিয়ে দিলো আমায় আজ সন্ধেয়।

ভোজন করলো কি না আমারই ঘাড়ে চেপে। শুধু সে নয়। চালালো দল বেঁধে,—হরা, পঞ্চু, মুটু মণি মিলে তা প্রায় আধ ডজন তো হবেই। অগত্যা, নিরুপায় হয়ে, আমিও এই সুযোগে জাহির করে দিলাম কোম্পানির ছাউনিতে, আমার উদার মনের দরাজ হাতের কথা।

মাঠের ব্যাপারতো মিটলো, এলো ইনাম নেবার পালা। দেখছি, তাতেও চটকদারী, হরেক রকম কায়দা কানুন।

যেতে হবে বুক চিতিয়ে, সোজা হয়ে—গড্মড করে।

নাম ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক কদম কুইক মার্চ, জেনারেল সাহেবের সামনে হাজির হয়েই বুট জোড়ায় ঠোকাঠুকি করা—খট্ শব্দ করেই হল্ট। তারপরেই এক কদম এগিয়ে গিয়ে—স্যালিউট। বাঁ হাত বাড়িয়ে খাম গ্রহণ, ঠিক সেই মুহূর্তে আবার স্যালিউট। এর পর এক কদম পিছিয়ে এসে এবাউট্ টার্ণ, সঙ্গে সঙ্গে কুইক-মার্চ করে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা।

কিচেন প্যারেড, পাইওরিয়া প্যারেড, সিক্-প্যারেড অর্থাৎ খাওয়া দাঁত মাজা, স্নান, এবং অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে হাজির হওয়ার মত এটাও একটা স্পোর্টস্-প্যারেড।

পুরস্কার নেবার বেলায় ভুল ত্রুটী হলেই মুশকিল। হাজত না হলেও চিন্তার আছে। কাজে কাজেই, ঠিকঠাক খেয়াল রাখা,—দু'বার স্যালিউট ঠোকা এবং তারই ফাঁকে বাঁ হাত বাড়িয়ে খাম নেওয়া।

আড়ালে ওস্তাদজীকে জেনারেল সাজিয়ে, বার কয়েক ইনাম নেবার

কায়দা কানুনের মহড়া দিয়ে নিয়ে এলাম খামে ভরা টাকা। তা নেহাত কিছু কম নয়—তিনবারে মোট জমা হল পঁচিশ।

এতো টাকা! ভরসা হয় না নিজের কাছে রাখা। সৈনিকদের অপর খেয়ালগুলো দখলে না এলেও, মাত্র চার দিনে কপর্দকহীন হয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা আমারও আছে। সবদিক চিন্তা করে, হুঁসিয়ার হয়ে, শেষ পর্যন্ত জমা রাখলাম আমার একমাত্র ওয়েল্-উইশার যোগীনদারই কাছে।

দেখছি, ওস্তাদজীও আজ দিলদরিয়া। উচ্ছ্বসিত হয়ে তার দলবল নিয়ে করলো আমায় আলিঙ্গন-করমর্দন। সাবাস্ বাহবা জানিয়েই আমার পা দুটো ফাঁক করে ধরেই, তলাদিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিলো, সংগে সংগে বেমালুম তুলে নিলো তার কাঁধে। তারপরেই সুরু হল চিৎকার—থ্রি চিয়ার্স ফর-থ্রি ফরটি থ্রি—হিপ্ হিপ্ হিপ্—হুর...রে......

চললো আমাকে নিয়ে মাতামাতি, সেই সংগে ছাউনি প্রদক্ষিণ। বেশ কিছুক্ষণ ছাউনির ভেতর বাইরে ঘোরাঘুরি করার পর, এলো নামবার পালা। বুঝলাম, হাজির হয়েছি ছাউনির শেষ প্রান্তে—মুরাদের রেষ্টুরেণ্টে।

নিমেষের মধ্যে মুরুব্বির হুকুমে এসে গেলো রকমারি খাবার। শুধু কি আমার? এলো তার,—এলো সকলের।

ভোজন পর্ব শেষ করে মুরাদের প্রাপ্যগণ্ডা মিটিয়ে দিলো মুরুব্বি নিজেই। এবার ধীরে সুস্থে আমার কাছে আসে। গম্ভীর চালে বলে,—ওরে, এই নে, তোর পঁচিশ টাকার হিসেব। হাতে তুলে দেয় তেইশ টাকা বারো আনার ক্যাশ মেমো,—দেয় নগদ পাঁচসিকে পয়সা।

মারমুখো হয়ে উঠি আমি। খাপ্পা হয়ে, আস্তিন গুটিয়ে, ঘুষি বাগিয়ে বলি—সে কী, তুমি আমার প্রাইজের টাকাগুলো এভাবে খরচ করলে? না, যোগীনদা, তা হবে না—আমার বাকী টাকাগুলো তোমাদের দিতেই হবে, আমি কিছুতেই ছাড়বো না,—নইলে আমি হুজ্জোত করবো, রাতারাতি তোমার রাইফেলের বোণ্ট উধাও করে দেবো।

আমি ক্ষেপে গেলেও, কিছু মাত্র চঞ্চল হল না মুরুব্বি। মোটেই আমল দিলো না আমার কথাগুলোর ওপর।

ধীর ভাবে কাছে আসে। আমার বুকের ওপর হাতটা চাপড়ে উপদেশ দেয়। চলে যায় তার সাঙ্গো-পাঙ্গ নিয়ে।

গম্ভীর হয়ে শুনিয়ে গেলো—অত হল্লা করছিস্ কেন? ছাখ দৌড়বাজ হওয়া সহজ, শক্ত—মানুষ হওয়া।—ঘোড়াতেও তো দৌড়াতে পারে।

তুই জেনে রাখিস—এসব খেলা-ধুলোর বড় উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন—টাকা রোজগার বা মেজাজ দেখাবার জন্যে নয়। তাই তোকে আজ বলছি,—বি এ স্পোর্টস্‌ম্যান—এ রিয়েল্‌ স্পোর্টস্‌ম্যান।

চোদ্দ

শেষ পর্যন্ত আমাদের দু'জনকেই ম্যালেরীয়ায় আঁকড়ে তাহলে ধরলো। অবশ্য এর জন্যে কিছুটা দায়ী আমি হলেও, বেশীর ভাগই মুরুব্বি।

কুইনাইন প্যারেড বরাবর চালু থাকলেও, কিছুদিন ধরে আর গিলছি না ওটা। নিত্যই সে দিয়েছে মন্তর—এই, কুইনাইন আর খাসনি—কালা হয়ে যাবি।

আমিও নিশ্চিন্তে দিনের পর দিন মুখের মধ্যে ভরে নিয়ে, ফেলে দিয়েছি ডাক্তারের অলক্ষে। অন্য সাথীদের মত তেতো স্বাদ কাটিয়েছি কষা খেজুর চিবিয়ে।

এখন আমাদের দুজনেরই রীতিমত কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। তবে মস্ত ভরসা,—সকালে থার্মমিটারের ডগায় টেমপারেচার ঠেকলেও বিকেলে থাকে না চিহ্নমাত্র।

তবু শয্যা নিতে হয়েছে হাসপাতালে। সকালে দুধ ডায়েট পান করে নিঝুম হয়ে নিজের বিছানায় পড়ে থাকলেও, বিকেলে থাকে দেহ সুস্থ।

ডাক্তারের বাঁধা ব্যবস্থা, রাতের পথ্য গোস্ত-রোটী। এখন বিনা বাধায় রুটি-মাংস ভোজন ক'রে বেশ আসর জমাচ্ছি ওস্তাদজীকে নিয়ে এই হাসপাতালের রিক্রিয়েসন টেণ্টে।

এখানে দিনগুলো কাটছে আমাদের পরম সুখে। সারা দুপুর খড়ের বালিশ মাথায় দিয়ে নিদ্রা, আর বিকেল হলেই ঐ তাঁবুতে বসে আড্ডা ইয়ারকি। তোফা আছি।

এখন ওখানে বসে গ্রামোফোনের গান শুনি। বই পড়ি। ব্যবস্থা আছে পাশা দাবার। তবে সব চেয়ে বড় আনন্দ, যখন আসর জমে অপর পল্টনের সাথীদের নিয়ে।

দেখছি বাঙালীদের সুনাম আছে। খাতিরও করে। এরাও বলে—লিখনে পড়নেওয়ালা এলেমদার পল্টন—সখকো ওয়াস্তে পল্টনমে আয়া, রুপেয়াকো ওয়াস্তে নেহি।

শুনলাম আরও মজার কথা। আমরা নাকি যাদু জানি।

বললো—বাঙালী লোক যাদু জানতা। এখন দেখা হলেই করে অনুরোধ—সাথী একঠো যাদু।

জানিয়েদি কসম খেয়ে—সাচ্ বোলতা সাথী, হামলোক যাদু-টাদু নেহি জানতা।

তারা কিন্তু শোনে না আমার কথা, মানে না আমার যুক্তি, মন হয় তাদের অবিশ্বাসী।

জোরের সংগে নজীর দেখায়। বলে—হামলোক খোদ আঁকসে দেখা আপকো পল্টনমে এক বাঙালী সিপাইকো আগকো উপর চলতে ফিরতে। এখন দেখা হলেই আর কোনও কথা না, শুধু বলে, একঠো যাদু।

দেখছি এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। চিন্তা করি ভোজবাজির।

ধীরে ধরে মুরুব্বি আসতেই, তাকেও বলে তারা যাদুর কথা।

আমি এবার পাশ কাটাই,—ঠেকিয়েদি ওস্তাদজীকে। কানে কানে বলি—ও যোগীনদা পারবে এবার তাল সামলাতে? তোমার তো কেরামতি অনেক, ফন্দিতো জান হরেক-রকম, তাই বলছি, এবার ওদের দেখিয়ে দাওনা আর এক ঝলক।

দেখছি মুরুব্বি কিন্তু পিছপাও নয়। শুনেই বলে—ঠিক আছে।

জবাব দিলো গম্ভীর চালে,—আচ্ছা সাথী, হাম দেখলায়েগা।

হুকুম চালায়—একঠো মগ, থোড়া পানি।

অবাক হয়ে জিগ্যেস করি—সত্যি তুমি ভেল্‌কি দেখাবে?—কী ম্যাজিক যোগীনদা?

উত্তর দিল ছোট্ট করে—বিজ্ঞান পাঠ করেছিস?

এবার মগের মধ্যে জল ঢেলে চাপা দেয় কাগজ। ভড়কি মারে হাত নেড়ে, বিড় বিড় ক'রে ঠোট নাড়ে। আউড়ে গেলো মন্তর, দেখিয়ে দিলো যাদু।

মগটা উপুড় ক'রে বলে—দেখিয়ে সাথী, মগকো পানি নেহি গিরতা হায়।

সরল প্রকৃতির সৈনিকের দল অবাক হয়ে দেখে, মুখ চাওয়াচায়ী করে। বলে উঠে খুশী হয়ে—আরে, আরে, কিয়া তাজ্জব,—কেত্‌না তাকত্ বন্ গিয়া কাগজকো।

হেসে বলে পাঠান সাথী—ইস্‌ওয়াস্তে হাম্‌তো হামেশায় বলতে হ্যায়—বাঙালী লোক যাদু জান্‌তা। কিয়া সাথী, হাম ঠিক বোলা নেই ?

একটু থেমেই আবার গম্ভীর হয়ে বলে—দেখিয়ে সাথী, ফৌজী লড়াই করতা, আদমী মারতা—লেকিন ঝুটা বাত কভি নেহি বোল্‌তা। উস্‌কো আঠারা রূপেয়া তন্খা (মাইনে) মিল সাক্‌তা হ্যায়, বাকি দিল্ উস্‌কো লাখো রূপেয়াকা হ্যায়।

পনেরো

বড় লড়াই আজ দু'মাস থেমে গেলেও ফ্যাঁকড়া যুদ্ধ নাকি সুরু হয়েছে আজ কদিন। যুদ্ধ বেধেছে কুর্দিস্থানে। বাগদাদ থেকে নাকি শ'তিনেক মাইল আরও উত্তরে।

ইংরেজ চায় স্বাধীন কুর্দিদের অধীন করে রাখতে। দুদ্ধর্ষ কুর্দিরা কিন্তু পরাধীন থাকতে নারাজ। ইংরেজও নাছোড়বান্দা, চালাচ্ছে জোর জবরদস্তি। তাদের সায়েস্তা করে আয়ত্তে আনবার জন্যে এরই মধ্যে চলে গেছে ফৌজ। গেছে এরোপ্লেন, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী—আরও কতো রকম মানুষ মারার সরঞ্জাম।

ওদিকে কুর্দিরাও কিছু কম্‌তি নয়। তারাও বেঁকে দাঁড়িয়ে ধরেছে হাতিয়ার। দিন রাত পাহাড়ের ভেতর থেকে চালিয়ে যাচ্ছে চোরা-গোপ্তা গুলি। মরিয়া হয়ে ধরে ফেলছে আরমার্ড কার। সংগে সংগে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ শুদ্ধ গাড়ী। শুনছি, এরই মধ্যে নির্মূল করে দিয়েছে নাকি পুরো একটা পল্টন।

এবার ডাক পড়েছে আমাদের। আজই রাত্রে চড়তে হবে ষ্টিমারে। যেতে হবে অনেক দূরে, মসুলের কাছে, টিকরিট ছাড়িয়ে আরও উত্তরে—বেইজীতে। সেখান থেকে একশো মাইল পথ চলে পৌঁছোতে হবে, কিরকুকে।

ডাক পড়লো পে-হাবিলদারের তাঁবুতে। মিটিয়ে দেবে মাস মাইনে, আর নিতে হবে নাকি গুড-কন্‌ডাক্ট ভাতা।

পুরো সোয়া তিন বছর পল্টনে কাটিয়ে কোনও প্রকার দণ্ডভোগ করিনি। আমাদের চরিত্র ভাল, যাকে বলে নিষ্কলঙ্ক। তাই মাইনে

বাড়লো। বেড়েছে মা পিছু এক টাকা। পাবোও একত্রে অনেক, তা, তিন মাসের বকেয়া তিন টাকা।

উৎসাহ বাড়লো টাকা পাবো জেনে। তাড়াতাড়ি মুরুব্বিকে নিয়ে হাজির হলাম পে-হাবিলদরের দপ্তরে। কিন্তু এখানেও দেখছি আর এক ফ্যাসাদ।

দেখছি লেখা রয়েছে তিন টাকার স্থলে, ছ'টাকা।

চুপি চুপি বললাম মুরুব্বিকে—ও যোগীনদা, পাওনাতো তিন মাসের তিন টাকা,—ছ'টাকা লেখা কেন: শুধু আমার নয়, তোমারও। তবে কি ভুল করলো?

মুরুব্বি চটে গেলো। আবার তার কড়া শাসন। অদ্ভুত মুখ-চোখ করে বলে—তুই বড্ডো ওভার-এ্যাক্টিভ, ছাখ, তোর বেঁড়ে ওস্তাদি আর সহ্য হয় না। শোন বলি, যা দিচ্ছে তা চোখ বুজে নিয়ে নে—বেশী কথা এখানে বলিসনি।

দেখলাম সে তড়িঘড়ি সই করে গুনে নিলো ছ'টাকা। অগত্যা আমিও আর কোনও কথা না বলে, নিয়ে ফিরলাম আমার নিখুঁত স্বভাবের প্রাপ্য গণ্ডা। নিলাম অবশ্য তিন টাকার স্থলে ছ'টাকা।

যোগীনদার ওপর রাগ হল। এভাবে টাকা নেবার লোভ না থাকলেও নিতে বাধ্য হলাম, শুধু তারই জন্যে।

তাঁবুর বাইরে এসেই একচোট নিলাম তাকে। বললাম, শুধু তোমার পাল্লায় পড়েই এ টাকা নিলাম; কিন্তু এটা কি ঠিক হল? নিচ্ছো কিনা গুড-কন্ডাক্ট্ পে—তাও ছড়িয়ে। একবার ভেবেও দেখলে না, ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে?

নির্ভয়ে মুরুব্বি বললো—থাম, বেশী বকিসনি, দেখছি, তুই আজও সেই ছেলেমানুষই আছিস। তোকে একটা পাগল ছাড়া আর কী বলবো? নইলে চলেছিস কিনা কবরের দিকে, এখনও ভাবছিস ওসব বাজে কথা।

অদ্ভুত লোক আমার এই যোগীনদা। ভাবনা চিন্তা কিছুই নেই। মায়াও নেই সব কিছু ফেলে যেতে। বরং উৎসাহের সংগে বলে—আবার দেখবো বাগদাদের বাজার, ঘুরবো কুর্দিস্থান, দেখবো কিরকুক শহর—যাবো সেই তুর্কি মুল্লুকের ধারে।

দেখতে দেখতে রাত হয়ে এলো গভীর। শুনছি ঘন ঘন বিউগিল্ কল। বাজছে, ফল-ইন।

নিঃশব্দে চলছে ছুটোপাটি, দৌড়োদৌড়ি। শেষ হল রোল-কল্—হল ইন্স্‌পেকসন। সবরকম তাল কাটিয়ে সুরু হল হাঁটা।

এবার রইলো পড়ে তাঁবু, রইলো মজুত রসদ, পোষা পায়রার ঝাঁক। ওদিকেও রইলো পড়ে শিশু-রফিগের দল, আর রইলো ঈশাবেল।

বেচারী ঈশাবেল। আর দেখা হবে না নদীর ধারে, আবদার ক'রে চাইবে না তারা হাম্মাদ-হালু (লজেন্স), চাইবে না চিউইং-গাম, চাইবে না......

আবার সেই বুটের শব্দ—খড়াক খড়াক খড়াক, চলছে পায়ে পায়ে তাল মেলানো। শুনছি কেবল দুটো কথা—লেফট্-রাইট—লেফট্-রাইট।

চুপচাপ এগিয়ে চলেছি সব নদীর ধারে। দেখছি জ্যোৎস্না ভরা সাফা আকাশ। নিস্তব্ধ নিঝুম রাত হলেও, মাঝে মাঝে ভেসে আসছে শাম্বো (কাফরি) পাড়ার ঢোলের শব্দ। হয়তো তারা নাচছে। তারাতো ওরকম নাচে। একটানা দু'রাত ধরেও তো নাচে।

পার হয়ে গেলাম হাসপাতাল, নার্সদের ডেরা, তুর্কি বন্দিশালা। চলেছি, দু'পাশের ডালিম বাগিচাকে ফেলে রেখে।

এই—এই তো ঈশাবেলদের বাড়ী। আহা বেচারী এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সে জানলো না আমাদের চলে যাওয়ার কথা।

সকালে উঠেই তো দেখবে ছাউনি ফাঁকা। হয়তো খুঁজে ফিরবে তাঁবু থেকে তাঁবু। ছুটে আসবে নদীর ধারে—ষ্টিমার ঘাটে।

বলবার ফুরসত হল কই?

তাইতো কি ভাববে সে। নিশ্চয় বলবে আসকার মুজেন—খারাপ, বিলকুল খারাপ। ইস, তাকে যে কথা দিয়েছি, কাল আবার যাবো খোরা-ক্রীকের ধারে। বেড়াবো আঙুর মাচার নিচে। তুঁত গাছে উঠে তুঁত ফল খাবো, ঘুরে বেড়াবো বাল্লাম নৌকো চড়ে। তাইতো, সব কিছু ভেস্তে গেলো।

মনটা হয়ে যায় খেপা। ভাবি বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি—ডেজার্ট করি। কিন্তু......

নিরুপায় হয়ে ভাঙামনে চলি, মনে মনে বলি—গুড-বাই তনুমা—গুড-বাই ঈশাবেল—গুড-বাই......

অধৈর্য হয়ে, থেকে থেকে পিছন ফিরে তাকাই—উৎসুক হয়ে বার বার দেখি তাদের আস্তানা।

হঠাৎ শুনি আমার ক্যাপটেনের ধমক। হয়তো তাঁরও মেজাজটা আছে বিগড়ে। চিৎকার দিয়ে শোনাচ্ছেন আমায়—হোয়াই ইউ লুকিং বিহাইণ্ড—ব্লাডি-ক্যাট? ওয়েল চেষ্ট আপ, লুক ফরোয়ার্ড......

ত্রস্ত হয়ে সামনের দিকে তাকাই। বুক চিতিয়ে পা মিলিয়ে চলি। আবার কান খাড়া করে শুনি হাবিলদার মেজরের সেই একঘেয়ে নীরস কাটখোট্টা বুলি—লেফট্-রাইট—লেফট্-রাইট—লেফট্......

সমাপ্ত